প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

কর্ত্তৃক

বিরচিত ও সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃতের আশুতোষ অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

এম, এ, পি-এইচ, ডি,

কর্ত্তৃক

লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থিত
প্রাচ্যবাণী মন্দির-সম্পাদক
ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :-
কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ও
প্রাচ্যবাণী মন্দির
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কলিকাতা ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ
কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পুনঃ প্রকাশন:- বসন্ত পঞ্চমী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (২০১১ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রকাশক – www.shaktivada.net

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি

পরিচ্ছেদ সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথম পরিচ্ছেদ	
ভারতীয় দণ্ডনীতি ও তাহার উপযোগিতা	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
রামায়ণে দণ্ডনীতি ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের অনুশাসন	৩৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মহাভারতে দণ্ডনীতি ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের অনুশাসন	৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে অর্থশাস্ত্রের অনাদরের কারণ	৪৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
পৈতামহতন্ত্র	৬৭
বৈশালাক্ষতন্ত্র	৭২

বার্হস্পত্যতন্ত্র ৭৩

ভারদ্বাজ নীতি ৮২

ঔশনসতন্ত্র ৮৮

শম্বরনীতি ৯১

মাতঙ্গনীতি ৯২

কালকবৃক্ষীয় নীতি ৯২

প্রাচেতস মনুর নীতি ৯৬

কণিক নীতি ৯৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদুলাশাসন ১০০

গান্ধারীর অনুশাসন ১০৭

ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসন ১১০

রামায়ণে রাজনীতি ১১৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভট্টিকাব্যে দণ্ডনীতি ১২২

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে দণ্ডনীতি ১৩৫

নবম পরিচ্ছেদ

শিশুপাল বধকাব্যে দণ্ডনীতি ১৪৯

দশম পরিচ্ছেদ

(ক) প্রাচীন ভারতে আদর্শরাষ্ট্রের স্বরূপ ১৫৯

(খ) দুর্ব্বল রক্ষা ১৬২

(গ) করগ্রহণ নীতি ১৬৩

(ঘ) শস্ত্রগ্রহণ ১৬৪

(ঙ) ধনিক-নির্ধন সমস্যা ১৬৫

মুখবন্ধ

পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অন্তেবাসিরূপে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনিষণ্ন হইয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গূঢ়তম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহের উপদেশ লাভ করিয়া যেমন কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া থাকি তদ্রূপ তাঁহার ভারতীয়-ইতিহাস ও রাজধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া থাকি। আমার প্রার্থনা অনুসারে তিনি ভারতবর্ষের রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে আমি এই দুরূহ ও বিশাল তত্ত্ব-সম্বৃদ্ধ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমার অসমসাহসিকতা ও অবিমৃশ্যকারিতার প্রমাণ হইবে জানিয়াও আচার্য্যদেবের আদেশ লঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায় পরিহার মানসে ভীত ভীত চিত্তে ইহাতে উদ্যত হইতেছি।

যে কোন বিষয়ের আলোচনা হউক না কেন, –তাহা বহুধা পরিশীলিত হইলেও অনুভব করিয়াছি তাঁহার দিব্য প্রতিভা ও অন্তর্দৃষ্টি তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনে নবীন-আলোকপাত করিয়া আমার চিত্তে আনন্দ ও বিস্ময়ের হিল্লোল উদ্রিক্ত করে।

বহুকাল হইতে ভারতীয় বিদ্যাস্থানসমূহের আলোচনা মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতির যাঁহারা ধারক ও বাহক সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায় আজ ক্ষীণপ্রায়। তথাপি তাঁহারা বিদ্যাসমূহের যে ভগ্নাংশ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে অপ্রদত্ত রহিয়া যাইতেছে। আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান যে অচির ভবিষ্যতে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অবোধ্য হইয়া যাইবে এবং ইহার পুনরুদ্ধারও অসম্ভব হইয়া পড়িবে, যদি না বাংলা ভাষায় দুরূহ গ্রন্থরাজির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-দ্বারা ইহাকে সুধী সমাজের বোধগম্য করা যায়।

দার্শনিক তত্ত্বের বিচার ও আলোচনা আজ ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত। শিক্ষিত সমাজ ও ছাত্র সম্প্রদায় আজ কঠিন তত্ত্বের আলোচনায় অসমর্থ হইয়াছে। যে বিপুল পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমন্বয়ে শাস্ত্ররহস্য বুঝিতে পারা যায় তাহা আজ শ্রমবিমুখ ছাত্রসমাজে বিরল। আরও উদ্বেগের বিষয় যে, অধিকারিপুরুষগণের গুণতারতম্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা নাই। মুড়ি ও মিশ্রির আজ দর সমান –তাহাই মাত্র নহে, অনেক স্থলেই মিশ্রি হতমান ও মুড়ির আদর অধিক। দেশের যে সমস্ত অবসাদের লক্ষণ পূর্ব্বে উন্মিষিত হইয়াছিল আজ তাহা অতি প্রকট ও স্থূলভাবে দেখা যাইতেছে। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক গ্লানি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ ছয়শত বৎসর মুসলমান শাসনে ভারতবর্ষ বিদ্যাক্ষেত্রে তাহার উৎকর্ষ হারায় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বহু বিদ্যাস্থানের অভ্যুত্থান এই যুগেই সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার কারণ সে সময়ে হিন্দু সমাজ রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হইতে বিচ্যুত হইলেও জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক গৌরববুদ্ধি হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, দায়ভাগ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিপুষ্টি এই যুগেই সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্মের কিছুমাত্র আলোচনা হয় নাই, অভ্যুদয় ও পরিপুষ্টির কথা দূরে থাকুক।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অন্ততঃ অষ্টম শতক হইতে ভারতবর্ষে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজধর্ম্মের অনুশীলনের অভাবে রাষ্ট্র রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন অপেক্ষিত তাহা উপেক্ষিতই হইয়া ছিল। ফলে তৎকালীন নৃপতিবৃন্দ বৈদেশিক ম্লেচ্ছ দস্যুগণের আক্রমণ নিবারণ বা প্রতিহত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া

পরস্পর বিবাদমান ভারতের নৃপতিবৃন্দ কেবল যে ক্ষীণশক্তি হইয়াছিল তাহাই মাত্র নহে, মধ্য-এশিয়ার ও প্রত্যন্ত দেশবাসী ম্লেচ্ছ দস্যু নায়কদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন নাই। বরং অনেকে ভূম্যনন্তর শত্রু নৃপতির বিনাশ সাধনের আশায় ম্লেচ্ছ রাজগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কান্যকুব্জ ও কাশীরাজ্যের অধিপতি জয়চন্দ্রের আচরণ উল্লেখ করিতে পারা যায়। জয়চন্দ্র তুর্কীরাজ মহম্মদ ঘোরীর অনুকূলতা করিয়া পৃথ্বীরাজের ধ্বংসে সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের ভ্রান্ত আচরণ ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার হেতু হইয়াছিল। রাজনীতি শাস্ত্রের স্থূল পরিজ্ঞান থাকিলেও ইহা সম্ভব হইত না। কামন্দক বলিয়াছেন :-

"যস্মিন্নুচ্ছিদ্যমানে তু রিপুরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
ন তস্যোচ্ছিত্তিমাতিষ্ঠেৎ কুর্ব্বীতৈনং স্বগোচরম্॥"

যে শত্রুর উচ্ছেদে তাহার স্থানে অন্য শত্রু অভিষিক্ত হয় তাহার উচ্ছেদ সাধন –আত্মধ্বংসেরই হেতু হয়। সাম, দান, ভেদ বা দণ্ডদ্বারা ইহাকে স্ববশে ও অনুকূলে আনাই বিধেয়।

কামন্দকের এই উক্তি সুগভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট জার্ম্মেনীকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়া গুরুতর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার ফলে একদিক হইতে জার্ম্মেনীর সামরিক শক্তির যেমন সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করা হইয়াছে সেইরূপ সেইসঙ্গে রাশিয়াকে দ্বিগুণ শক্তিশালী করিয়া ভূম্যনন্তর রাষ্ট্ররূপে পরিণত করা হইয়াছে। একদিন উভয় রাষ্ট্রকেই এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ক্ষাত্রশক্তি ও সম্পদে বৈদেশিকদের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। সমস্ত রাজন্যবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে ম্লেচ্ছগণ এদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ বা প্রজাসমূহের রাজনীতিক বোধ এতটা সংকুচিত ও সংকীর্ণ হইয়াছিল যে তাঁহারা ম্লেচ্ছ আক্রমণ প্রতিহত করিতে সঙ্ঘবদ্ধের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। যখনই ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম নরপতির শাসন বিদ্যমান ছিল তখনই কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয় নাই। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষকালে ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা পর্যুদস্ত হয় নাই। মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে অব্যাহত ছিল। জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই যাহা সমস্ত সঙ্ঘবদ্ধ ভারতবর্ষের আক্রমণ করিতে সাহসী হইতে পারে।

এই সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব তখনই ঘটিয়াছিল যখনই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের অবসানে নানা প্রদেশের শাসকবৃন্দ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া পরস্পর কলহ ও যুদ্ধে ব্যাপৃত হইত। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে ভারতের শাসনযন্ত্র ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইলেও অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস আজ ধূমায়িত হইতেছে। যদি সময়ে ইহার প্রতিকার না হয় তবে এই অসন্তোষ বহ্নি সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষ আবার বিদেশী জাতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। এই বিভেদ প্রবণতা ও পরস্পর অবিশ্বাসের হেতু –রাজপুরুষগণের ও শাসকবৃন্দের রাজধর্ম্মের অল্পজ্ঞান বা অজ্ঞান। দীর্ঘ অষ্টশতাব্দীর পরাধীনতায় ভারতবাসি বিদ্বদ্‌বৃন্দ রাজধর্ম্মের আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই। রাজনীতির আলোচনা বিদেশী শাসকদেরই কর্ত্তব্য ছিল। বৃটিশ রাজত্বকালে য়ুরোপীয় রাজনীতি শাস্ত্র পরীক্ষার বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল বটে। অনেকেই ইহাতে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনও করিয়াছেন। কিন্তু এই

বিদ্যা মূলতঃ বৈদেশিকদের স্বার্থেরই উপযোগী ছিল। এই বিদ্যাতে ভারতীয়গণের অপরোক্ষজ্ঞান এবং প্রয়োগকুশলতার অভাবে ইহা শুভ ফলপ্রসূ হয় নাই। লজ্জার বিষয় যে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রপালন নীতির সহিত অণুমাত্র পরিচয় স্থাপন করিতে আগ্রহ করেন না। ফলে তাঁহারা বিদেশী শাসকবৃন্দ প্রবর্ত্তিত নীতির অনুবর্ত্তন করিতেছেন এবং তাহাদের যেসমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশবাসীর বিরাগ-উৎপাদন করিয়া সাম্রাজ্যপালন দুষ্কর ও বিপদসঙ্কুল করিয়াছিল সেই সমস্ত অবস্থার পূর্ণ অনুবৃত্তি চলিতেছে। প্রাচীন ঋষি ও আচার্যগণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষাকল্পে ও সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের নিমিত্ত সুদীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া বিশাল-গ্রন্থসমূহে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আজ অধিকাংশই বিলুপ্ত, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ রামায়ণ মহাভারত ও মহাকাব্যসমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। বহুদিনের উপেক্ষাই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের দুর্দশার অন্যতম হেতু। বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ব্যাহত হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনও পণ্ডিতগণের আদরের বিষয় ছিল। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রামাণিক টীকা ও ভাষ্যের অভাবে অনেকস্থলেই অবোধ্য ও বহুস্থলেই দুর্ব্বোধ। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন —কেন এই শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা দেখা দিয়াছিল? ইহার উত্তর আলোচ্য গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষে বহু নিবৃত্তি মার্গের আচার্য্য ও শাস্তা আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় জনগণকে সংসার বৈরাগ্যসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐহিক অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধিসাধনে ভারতের জনসঙ্ঘ হতাদর হইয়াছিল। বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছিল যখন ভারতের প্রবল প্রতাপ নরপতিগণ এই বৈরাগ্যসাধনে আগ্রহী হইয়া ধর্ম্মপ্রবক্তার আসন, রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা অধিকতর আদরের বিষয় বলিয়া গণ্য করিলেন। সম্রাট্ অশোকের তিরোধানের পরই মৌর্য্য সাম্রাজ্য ক্ষীয়মাণ হইতে আরম্ভ করিল। যে বিশাল বাহিনীর বলে অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই নৃপতি খারবেল কলিঙ্গে স্বীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পর তাঁহার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ক্ষাত্রশক্তির অবসাদে অধ্যাত্মশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—এই সত্য ভারতবাসী ভাবাবেশে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে মুসলমান আক্রমণে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য বহু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দেশও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না।

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বৈরাগ্য-প্রধান ও একান্ত নিবৃত্তি মার্গীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের আপত্তি ছিল অনেক। তন্মধ্যে প্রধান আপত্তি এই যে, বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবক্তৃগণ অনধিকারী জনসমূহকে বৈরাগ্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ক্ষাত্র ও ব্রহ্ম শক্তির সমন্বয়ই ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের হেতু। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :-

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং বর্দ্ধতে তপঃ।"

ক্ষাত্র শক্তির অবসাদনের প্রযোজক হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নিজের বিনাশের হেতু হইয়াছিল। জৈনধর্ম্ম রাজস্থানে ক্ষত্রিয় নৃপতিদের ছত্রচ্ছায়ায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ ম্লেচ্ছ প্রভাব এ সমস্ত রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই বলিয়া।

হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রাণ —ধর্ম্মের বিরোধ বা উপমর্দ্দন করিয়া অভ্যুদয় লাভ করা হিন্দুর আদর্শ বহির্ভূত। কিন্তু বেদমার্গানুযায়ী আচার্য্যগণ যে ধর্ম্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা একদেশিতা দোষ দুষ্ট নহে। ধর্ম্ম, অর্থ,

কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সাধনে উপযোগী সমাজসংস্থান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুবর্তন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মা ঋষি ও আচার্য্যগণ ভারতবর্ষকে চতুরস্র সম্পদের অধিকারী করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্ম ব্যবস্থায় বীতাদর হইয়া এবং অল্পমূল্যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় ভারতবাসী উভয় সম্পদ হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহার ঐহিক অভ্যুদয় ধূলিতে লুণ্ঠিত ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ কণ্টক গুল্ম পরিবৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ঋষিগণ বলিয়াছেন – আধ্যাত্মিক মুক্তি ঐহিক সম্পদের অতিরেক মাত্র। ক্ষত্র ও ব্রহ্মের সমন্বয় বিধ্বস্ত হইলে সমস্ত পুরুষার্থ বিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। প্রবন্ধের ২৭ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ভীষ্মের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল পারত্রিক অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া মনে করেন এবং রাষ্ট্র রক্ষায় এবং সমাজ রক্ষায় উদাসীনতাই যাঁহাদের মতে ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট সোপান তাঁহারাই দণ্ডনীতি শাস্ত্রে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ফলে বৈদেশিক দস্যুধর্ম্মা পররাজ্যলোভী পরকীর্ত্তিমৎসরী জাতিসমূহের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া দেশবাসীদের অপরিসীম দুর্দ্দশার হেতু হইয়াছেন। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে ঈদৃশ একদেশী ধর্ম্মের সমাদর দেখা যায় না।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রবক্তা বুদ্ধ ও মহাবীর, রাজধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বা রাজধর্ম্ম পালন নিরত নৃপতিগণের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারেও সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ভারতীয় জনতার চিত্তে অকালবৈরাগ্য উদিত হইয়া ঐহিক সম্পদ রক্ষায় দেশবাসীকে মন্দোৎসাহ করিয়াছিল। যাহা হউক প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গের সমন্বয়ই বেদোক্ত ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্ম্মপরায়ণতাই ভারতবাসীর ঐহিক অবসাদের কারণ – ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অতত্ত্বদর্শী; ইহা আলোচ্যগ্রন্থ পাঠ করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞান হইবে। সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই। আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দকীয় নীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব সূত্রাকারে আখ্যান আখ্যায়িকা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্জ্জন করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা সমগ্রভাবে বোধগম্য করিতে এই গ্রন্থ অনুকূল হইবে। রাষ্ট্রনীতির বিষয় নীরসভাবে এই সমস্ত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ – রামায়ণ, মহাভারত, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কাব্যাদিতে রাজধর্ম্মের সরস সজীব ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা অবলম্বন করিয়া সাধারণ পাঠকের বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বীয় মনীষার দ্বারা দণ্ডনীতি শাস্ত্রে উদাসীনতা ও অজ্ঞতা কতদূর অকল্যাণের কারণ হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কেবল যৌক্তিক বুদ্ধির সাহায্যে রাজধর্ম্ম বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন তাহা নহে হার্দিক অনুভবের দ্বারা এই শাস্ত্রের প্রমেয়সমূহ রসান্বিত করিয়াছেন। আশাকরি বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ব্যক্তিগত কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে রামায়ণ ও মহাভারত রচনার যুগে দেশবাসী মুনি ঋষি মনীষী ও সাধারণ প্রজাবৃন্দ রাজ্যপরিচালনে, রাজ্যরক্ষণে ও তাহার অভ্যুদয় সাধনে অত্যন্ত জাগরূক ছিলেন। রাজা ও রাজ্যপরিচালক অধিকারিবৃন্দও রাজ্য রক্ষা বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। রাজ্য-রক্ষার প্রধান অংশ চারগণ দ্বারা অভ্যন্তর ও বাহ্য রাষ্ট্রসমূহের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। গ্রন্থকার দুঃখের সহিত বর্তমান ডিটেক্টিভ বিভাগের কার্য্য প্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রজারক্ষণ অপেক্ষা প্রজা-পীড়নই এই বিভাগের অধিকারি পুরুষগণ অধিক কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। এখন যাহাকে international politics বলা হয় তাহার যথার্থ স্বরূপ দ্বাদশ রাজমণ্ডল ব্যবস্থার অনুরূপ। রাজকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা সকলেই অনলস স্বভাব, তীক্ষ্ণধী ও বিশুদ্ধ চরিত্র সম্পন্ন হইতেন। এই বিদ্যায় যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন তাহা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ও সরল ভাষায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় যদি আমরা ইদৃশ বুদ্ধি ও

চরিত্র সম্পদের আবশ্যকতা অনুভব করি তবে দেশের এই দুর্নীতি ও দস্যুতার অবাধগতি প্রতিরুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার কোন রাজপুরুষের পদপ্রার্থী নহেন। পুরাকালে ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমূর্ত্তি মুনি ঋষিগণ, রাজা ও প্রধান পুরুষগণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। যাঁহারা রাষ্ট্রে উন্নত পদে অধ্যাসীন, যাঁহারা সমস্ত সম্পদ ও সৈন্য বলের অধিকারী, ক্ষুদ্রচেতাব্যক্তিগণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে চাটুবাক্য দ্বারা তাহাদের চিত্ত রঞ্জন করেন। যাহারা সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারাই ঈদৃশ শক্তিশালী পুরুষদিগের ভ্রম ও ত্রুটি প্রদর্শন করিতে পারেন। স্তাবক ও স্বার্থান্বেষী জনসমূহ রাষ্ট্রপরিপালকদিগের অধঃপতনের হেতু হইয়া থাকে। সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্যের প্রধান পুরুষগণ হিতবাক্য শুনিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষের বৈদেশিক শাসনের অবসানে যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই এই বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অতি অল্প। তাহার উপর নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর ইঁহাদের আস্থা ও বিশ্বাস এত উগ্র হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণ জনগণের ইষ্টানিষ্ট বা সুখদুঃখ তাঁহারা চিন্তার মধ্যেও স্থান দেন না। যাঁহারা ইংরেজ রাজ্যের বিরোধিতা করিয়া নিগ্রহভাজন হইয়াছিলেন তাঁহারাই আজ সমস্ত রাজপদের অধিকারী হইয়াছেন। যাঁহারা পদাধিকার লাভে বঞ্চিত তাঁহারাও নানাবিধ অপকৌশল যথা –মূল্যনিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যাধিকারানুমতি পত্র প্রভৃতির সাহায্যে স্বোদর পূরণে ও অযোগ্য আত্মীয় স্বজনের পরিপোষণে ব্যাপৃত। দেশপ্রেম আজ ভেক্ মাত্র হইয়াছে!—ইহা ব্যাজ মাত্রে পরিণত হইয়াছে। দুঃশাসনের পীড়নে জনগণ আজ আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই অনাচার ও দুর্নীতির হেতু কি? তাহা আজ বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের সমর্থনের সাহায্যে প্রধান পদলাভ করিয়া দেশকে প্রবঞ্চিত করাই আজ রীতি হইয়াছে। ইহার প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ জনতা রাজনীতির মূল সূত্রের পরিজ্ঞান লাভ করিবে। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের এই পরিজ্ঞান লাভ হইবে আশা করি।

এজাতীয় গ্রন্থ পূর্বে হয় নাই। শিক্ষিত সমাজের ধারণা যে প্রাচীন ভারত কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিবেক বৈরাগ্যের আলোচনায় নিরত ছিল। এই ধারণার হেতু যথেষ্টই আছে। যাঁহারা প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় রাজধর্ম্মের আলোচনায় ও রাজধর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রসমুহের আলোচনায় বিমুখ। সংস্কৃত এসোসিয়েশান সমূহেও কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষণীয় বিষয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু অর্থশাস্ত্র বলিয়া যে কোন আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা অধিকারিবৃন্দ বিস্মৃত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষিত। সংস্কৃত ভাষার আলোচনাকারী ব্যক্তিগণ ঐহিক অভ্যুদয়ের কোন প্রকার আনুকূল্য করিতে পারেন, তাহা আজ বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়াছে—তাহার কারণ তাঁহারা সমস্ত বিদ্যা ও ধর্ম্মের উপজীব্য দণ্ডনীতির প্রতি উপেক্ষা করিয়াছেন। আশা করি বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে দণ্ডনীতি পূর্ব্বের গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে এবং ইহার অনুশীলন করিয়া প্রাচীন ও নবীন পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষিত সমাজ উদ্বুদ্ধ ও অগ্রণী হইবেন। আলোচ্য গ্রন্থের "অর্থশাস্ত্রের অনাদরের কারণ" নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় চেতনার অবসাদ কত প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় চেতনার অবসাদের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ বৈদেশিক দস্যুভাবাপন্ন নৃপতিগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ হইয়াছিল যখন মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর রাজধর্ম্ম সমুহকে অর্থশাস্ত্রের কোটিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে অর্থশাস্ত্রকে দুর্ব্বল ও হীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয় –এই দুরূহ প্রশ্নের সম্যক্ বিচার করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মিতাক্ষরাকারের এই সিদ্ধান্তের শাস্ত্রবিরোধ ও যুক্তিবিরোধ করিয়া ইহার অসারতা ও অসত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজকে বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন তাঁহাদিগকে

এই পরিচ্ছেদটি নির্মৎসর ও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে অধ্যয়ন করিতে আবেদন জানাইতেছি। অস্বাভাবিক বৈরাগ্য চর্চ্চার ফলে ঈদৃশ চিত্তবিকার ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমানে শাস্ত্র সমূহে মীমাংসা সম্মত ন্যায় ও বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত নিরূপণ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা বিশেষ অপেক্ষিত। আশা করি এবিষয়ে তীক্ষ্ণধী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও দেশহিতৈষী বিদ্বদ্‌বৃন্দ নতুন প্রেরণা দান করিবেন। এই ভাবি পণ্ডিতবৃন্দের পুরোভাগে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার অগ্রণী হইয়াছেন। দার্শনিক জ্ঞান ধারায় সুপরিষ্কৃত ও সুনির্ম্মল বুদ্ধির আলোকে তিনি তিমিরসঙ্কুল পথে আলোক মালা বিচ্ছুরিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া অমরা সর্ব্ববিধ পুরুষার্থসাধনে যেন প্রবৃত্ত হইতে পারি তাহাই আজ ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

যাঁহারা য়ূরোপীয় রাজনীতি আলোচনা করেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। দণ্ডনীতি শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য যাহা একমাত্র অপরোক্ষ জ্ঞান ও প্রয়োগের সাহায্যে অধিগত হইতে পারে তাহা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ঋষি ও আচার্যগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। কেবল কল্পনা বা থিওরী জ্ঞানে আমাদের কোন কল্যাণ হইবে না। যেমন জড়বিজ্ঞানের থিওরীমাত্র পরিজ্ঞান হইয়া আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হইয়াছি তদ্রূপ রাজনীতির থিওরীমাত্রে কেবল চিত্ত বিনোদন মাত্রই ফল হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি তত্ত্বের উল্লেখ করিতেছি। অর্থশাস্ত্রে "শত্রুমিত্র বিবেক" একটি প্রধান বিচার্য্য বিষয়। শত্রু প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :- কৃত্রিম, সহজ ও প্রাকৃত। অপকার দ্বারা বিকৃত ব্যক্তি কৃত্রিম শত্রু। স্বার্থের প্রতিঘাতই এই শত্রুর সৃষ্টি করে। ইংরাজ ভারতবাসীর কৃত্রিম শত্রু ছিল। স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। আজ হয়ত আবার ইংরাজ আমাদের মিত্রও হইতে পারে। যদি ইংরাজ ও ভারতবাসী স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে পরস্পর হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয় তবে ইংরাজ আমাদের মিত্র হইবে। উপকার অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ব্যাপারই মিত্রের লক্ষণ। অপকার সাধনই শত্রুর লক্ষণ। ঈদৃশ শত্রু বা মিত্র, কৃত্রিম শত্রু ও কৃত্রিম মিত্র। অন্তরঙ্গ বা জন্মাবধি স্বার্থবিরোধসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ সহজ শত্রু। যে ব্যক্তি বা যে ব্যক্তিসমূহ বা জাতি বা সঙ্ঘ, স্বীয় জাতি বা সঙ্ঘের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত এবং কোন উপকার বা হিতসাধনের দ্বারা যাহার চিত্ত জয় করা যাইবে না, সে সহজশত্রু। জ্ঞাতিশত্রু ইহার উদাহরণ স্থল। নর্ম্মানগণ ইংলণ্ড জয় করিয়া ঐ দেশে বাস করিয়া প্রাচীন স্যাক্সন জাতির সহজ শত্রুরূপে পরিগণনীয় ছিল। বিদেশী মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করিয়া ভারতবাসী হিন্দুর সহজ শত্রুরূপে পরিগণনীয় ছিল। কালপ্রভাবে নর্ম্মান ও স্যাক্সনগণ একজাতিতে পরিণত হইয়া তাদৃশ শত্রুতা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ নর্ম্মান ও স্যাক্সন বলিয়া কোন পৃথক্ জাতি আজ ইংলণ্ডে বিদ্যমান নাই।

তৃতীয় শত্রু—প্রাকৃত বা স্বাভাবিক। ভূম্যনন্তর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবাসী প্রাকৃতশত্রু। প্রতিবেশী রাজ্য চিরকালই অমিত্র থাকিতে বাধ্য। যদি বিপৎকালে সাধারণশত্রুর ভয়ে তাহারা মৈত্রীবদ্ধ হয় সে মৈত্রী সাময়িক স্বার্থসিদ্ধিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী ভূম্যনন্তর রাষ্ট্র, ইহাদের অমিত্রভাব স্বভাবসিদ্ধ। জার্ম্মানীর আক্রমণ ভয়ে ইংরেজ ও ফরাসী জাতি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শত্রুর প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে তাহাদের শত্রুতা প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্যভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ভূম্যনন্তর রাষ্ট্রকে যাঁহারা উপকারের দ্বারা মিত্ররূপে পরিণত করিতে প্রয়াস করেন তাঁহাদের সেই প্রয়াস তুষকণ্ডনে পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ রাজনীতি পরিজ্ঞানের অভাবে এবং ইংরাজের কুহকে প্রবঞ্চিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে একটি স্বভাবশত্রু রাজ্য ও জাতির সৃষ্টি হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। নানাবিধ বন্ধুত্বের নিদর্শন দ্বারা এবং অর্থ ও সমর সম্ভার দ্বারা তাঁহারা পাকিস্থানের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত। ফল বিপরীত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে স্বল্পজ্ঞান থাকিলেও এই বিস্ময় বোধের কারণ থাকিত না। তাঁহারা বলেন যুদ্ধ পরিহার মানসে তাঁহারা এই ব্যবস্থাতে

সম্মতিদান করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের যাহা অতি অশুভ ফল তাহার নিবারণ হইল না। বহু লক্ষ হিন্দু ও শিখ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল, তাহাদের সমস্ত সম্পদ ও ধন অপহৃত হইল এবং লক্ষাধিক নারী স্বধর্ম্মচ্যুত ও সতীত্ব ভ্রষ্ট হইল। ম্যাকিয়াভেলি বলিয়াছেন—"যুদ্ধ পরিহার করা যায় না তাহার কালবিলম্ব ঘটাইতে পারা যায়—কিন্তু এই কালবিলম্বের ফলেই শত্রুপক্ষ পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ পায়"। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভুলের ফল অতিভীষণ ও সুদূর প্রসারী হইয়া থাকে। পৃথ্বীরাজ চৌহান যদি বন্দীকৃত মহম্মদ ঘোরীর শিরচ্ছেদ করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। এই ভুলের ফলেই ভারতবর্ষ দীর্ঘ অষ্ট শতাব্দী যাবৎ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকিল এবং ভারতবর্ষ আজ দ্বিধা বিভক্ত হইল। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়ক হিটলার যদি রাশিয়া আক্রমণ না করিতেন তাহা হইলে আজ জার্ম্মাণ জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইত না। রাজনীতিশাস্ত্রে যাহারা অতি অবহিত ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং অতি ধীর ও মন্ত্রগুপ্তিকুশল তাঁহাদেরই প্রধান পদে অধিষ্টিত থাকা উচিত।

বহুদিন হইতে ভারতবাসী, সমষ্টি স্বার্থ—সমগ্র জাতির কল্যাণ বিষয়ে অপ্রণিহিতমনাঃ হইয়াছে। বহুজনের হিত দ্বারাই ব্যক্তির হিত সাধিত হইতে পারে এই তত্ত্ব নীতিশাস্ত্রে বহুধা বিঘোষিত হইয়াছে। মিল, বেন্থাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের Utilitarian বা হিতবাদী নীতিজ্ঞগণ—"The greatest good of the greatest number" বহুজন হিতসাধনই ব্যষ্টির হিতের কারণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির অস্থি মজ্জায় এই তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নীতিশাস্ত্রকারগণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এই তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণতা ভারতের রাষ্ট্রীয় অবনতির কারণ ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অতত্ত্বদর্শী কিংবা দেশবাসীকে মিথ্যা প্রচারের দ্বারা ব্যামোহিত করিয়া দলগত উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর।

ভারতবাসী সুপ্রাচীনকাল হইতে অহিংসাধর্ম্মের গৌরব ও শ্রেয়স্করতা প্রচার করিয়া আসিতেছে। বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ইতিহাস কাব্য সাহিত্যের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি ধর্ম্মের মহিমা অকুণ্ঠ কণ্ঠে ভারতবর্ষের ভূমিখণ্ডে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও সত্যের ভিত্তিতে ভারতের স্বাতন্ত্র্য নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে অহিংসা ও সত্যের স্বরূপ সহজ বুদ্ধিতে নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সাধারণ জনতার নিকট উন্নততম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারের বিপদও বহু। এই সমস্ত তত্ত্বের বিকৃত ধারণা বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাতে সৈন্য, রক্ষিপুরুষ ও বাহুবল প্রয়োগের অবকাশ নাই। মহাভারতে বলা হইয়াছে যে অতি প্রাচীন যুগে কোন শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না—সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, ক্রোধ লোভ বর্জ্জিত এবং যথালব্ধ অন্নবস্ত্রদিতে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে "মাৎস্যন্যায়" আবির্ভূত হইলে রাজনির্ব্বাচন ও রাজধর্ম্মপ্রণয়ন আবশ্যক হইল। যাহা হউক ঈদৃশ অবস্থার পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। মানবের চিত্ত যতদিন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত মানব নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরকে বঞ্চিত করিবে, হিংসা ও দস্যুতার, প্রবঞ্চনা ও কুহকের অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, ততদিন দুর্ব্বল মানবের হিত সাধন উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য দণ্ড ব্যবস্থার আবশ্যকতা থাকিবে। বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসন সংস্থাও দেশ শাসন নিমিত্ত বাহুবলের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কোনও হেতু নাই। অহিংসার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে পরিজ্ঞান না থাকায় এইরূপ সংশয় উত্থিত হইতেছে। যদি আধ্যাত্মিক বা আতিমানুষিক শক্তির প্রভাবে আততায়ীর চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রেমরস সৃষ্টি করা সম্ভব হইত কিংবা তাহার শক্তিকে শারীর দণ্ড ব্যতিরেকে প্রতিরুদ্ধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে বাহুবলের প্রয়োগ অনাবশ্যক হইত—কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর ও যীশু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যোগ প্রভাবে পাশব শক্তির প্রতিরোধ করেন নাই বা আততায়ীর চিত্ত প্রীতিরসে আপ্লুত করিতে পারেন নাই, ইহা ইতিহাস প্রমাণিত করিতেছে। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে বাহ্য ও অন্তর অহিংসার সর্ব্বতোমুখী প্রতিষ্ঠার জন্য

আমরণান্তিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরও যখন ভূমিকম্প, বজ্রপতন প্রভৃতি আধিদৈবিক উপায়ের দ্বারা দৈহিক দণ্ডবিধান করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং হয়ত এইরূপ দণ্ডবিধানই জীবের শ্রেয়স্কর মনে করেন, তখন ভাববিলাসে ও আহোপুরুষিকার মোহে ঈদৃশ অনৈসর্গিক কার্য্যে কেহ ব্যাপৃত হউক ইহা তাঁহার ইচ্ছাবহির্ভূত বলিয়া মনে হয়।

হিংসার বাহ্য ও অভ্যন্তর দুটি প্রকাশ। রাগ দ্বেষ লোভ প্রভৃতি রিপুবর্গদ্বারা প্রণোদিত হইয়া জীবহিংসা সাধন সত্যহিংসা। ইহা ঘোরতর পাপ; বাহ্যবধ দেহচ্ছেদাদি তাহার বহিঃ প্রকাশ। জৈন দার্শনিকগণ অহিংসা ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারাও দ্রব্য অহিংসা ও ভাব অহিংসা ভেদে অহিংসার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যাহা ক্রোধ, লোভ, মান ও মোহদ্বারা প্রণোদিত হয় না এরূপ হিংসা দ্রব্য হিংসা—ইহা যথার্থ হিংসা নহে। এজন্য দৈবাগত কীটপতঙ্গের বধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে এবং সংযত সাধুর চেষ্টা সত্ত্বে যদি ইহা পরিহার করা সম্ভব না হয় তবে তাহা দ্রব্য অহিংসা—ইহা বাহ্য অহিংসা ইহা প্রত্যবায়ের কারণ হয় না। ভাব অহিংসা অর্থাৎ যাহা কলুষিতচিত্তের পরিণতি তাহাই পাপের হেতু। এজন্য বৈদিক যাগাদিতে পশু হিংসা রাগদ্বেষাদিদ্বারা প্রণোদিত হয়না বলিয়া তাহা অধর্ম্মের হেতু হয় না, ইহা মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। ধর্ম্ম যুদ্ধে হিংসা জৈনদের পরিভাষায় দ্রব্য অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি পররাজ্য হরণ, পরস্বাদান ও জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত না হয় তবে যুদ্ধে বধচ্ছেদাদি হিংসা বলিয়া গণিত হইবে না। ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ কালিদাস ঋষির মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি"। হে মহারাজ! আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রধারণ বিহিত হইয়াছে। নিরপরাধ জীবের পীড়নের জন্য অস্ত্র ধারণ ধর্ম্ম-বিগর্হিত। আর্য্য শাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রীয় বীরের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিরতিও অধর্ম্মের হেতু। যে স্থলে যুদ্ধ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, অসংখ্য নরনারী, শিশু, গোব্রাহ্মণ দেবমন্দির রক্ষাদির জন্য অবলম্বিত হয়, যাহা ব্যক্তিগত সুখদুঃখাদি ভোগাকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রেরিত না হয়, সেই যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্ম যুদ্ধে শত্রুর বধসাধন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। আততায়িবধ কোন দোষের কারণ নহে ইহা শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। মিতাক্ষরাকার ধর্ম্মযুদ্ধকে অর্থশাস্ত্রের বিষয় বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের যে সুদৃঢ় বিচার করা হইয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। আমার মনে হয় এই বিচার বিশেষভাবে আলোচনা করিলে হিংসা ও অহিংসার বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হইবে।

এই গ্রন্থ পাঠ করিলে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কেবল নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইবে তাহা নহে কিন্তু বহুকাল হইতে সঞ্চিত কুসংস্কার ও ভ্রমরাশি বিদূরিত হইয়া দেশরক্ষা বিষয়ে দেশবাসীর চেতনাকে স্বস্থ ও সমাহিত করিবে। ভারতবর্ষের নবীন পরিস্থিতিতে ভারতরক্ষা প্রজাপালনের ভার দেশবাসীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কি নবীন কি প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত সুধীসমাজ কাব্য নাটক দর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও অনেকেরই অর্থশাস্ত্রে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আকর গ্রন্থের অনুশীলনে সুধীসমাজ প্রণোদিত হইলে দেশের কল্যাণমার্গ উন্মুক্ত হইবে। ইতি—

সন ১৩৫৬ ৭ই আষাঢ়। শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে দণ্ডনীতি শব্দদ্বারা কাহার নির্দ্দেশ করা হইত, দণ্ডনীতি শব্দের অর্থ কি? তাহার সুস্পষ্ট ধারণা আজ আমাদের নাই। এজন্য প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি বলিতে কি বুঝিব ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা সঙ্গত মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে বিচারালয়ে বিচারকগণ বাদীর ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সাক্ষী প্রমাণাদির সাহায্যে বাদীর বা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে যে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন তাহাকেই আমরা দণ্ডবিধান বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। এজন্য দণ্ডনীতি বলিলে সাধারণতঃ প্রচলিত বিচারালয়ের বিচার ব্যবস্থাই লোকে মনে করে। কিন্তু দণ্ডনীতি বলিলে বিচারালয়ের বিচার ব্যবস্থামাত্রই বুঝায় না; বিচারক যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

শিশু পুত্রকন্যাকেও তাহার পিতামাতা যে লালনপালন ও পোষণ করেন, তাহাতেও দণ্ডনীতি অপ্রতিহতভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত শিশুকে মিষ্টকথার দ্বারা যখন তাহার পিতামাতা নিবৃত্ত করিতে পারেন না—তখন তিরস্কারের সাহায্যে নিবৃত্ত করিতে হয়। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে—কোন শিশুকে তাহার পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি যখন অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হন তখন শিশুকে মিষ্ট বাক্যদ্বারা, –অতি কোমল সুকুমার ব্যবহারের দ্বারা শিশুচিত্তকে অধ্যয়নে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস করেন। ইহাকেই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের সাম উপায়ের প্রয়োগ বলা হইয়া থাকে। শিশু যখন মিষ্ট কথায় প্রবৃত্ত হইতে অসম্মত হয় তখন তাহার পিতা প্রভৃতি, নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া শিশুর চিত্তকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাইতে প্রয়াস করেন যেমন—'তোমাকে ভাল ক্রীড়ার সামগ্রী প্রদান করিব', 'নানারূপ সুখাদ্য বস্তু তোমাকে দিব' –"চিত্তাকর্ষক চিত্রযুক্ত পুস্তক তোমাকে দিব'—এই সমস্ত কথা বলিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হন না, বালকের চিত্তাকর্ষক সামগ্রীও তাঁহারা দিয়া থাকেন, আর ইহাকে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের দান উপায়ের প্রয়োগ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। শিশুর চিত্ত তাহাতেও অধ্যয়নে আকৃষ্ট না হইলে তখন শিশুর পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শিশুকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শিশুর চিত্তাকর্ষক যে সমস্ত বস্তু শিশুর সম্মুখে আনিয়াছিলেন তাহা শিশুকে না দিয়া শিশুরই ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় অন্য কোন শিশুকে দিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া শিশুকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করেন। ক্রীড়ার সামগ্রীগুলি অন্যে পাইবে ইহাতে অনেক সময় শিশু অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; ইহাকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ভেদ উপায়ের প্রয়োগ বলা হইয়া থাকে। ইহাতেও শিশু অধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হইলে শিশুকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করা হইয়া থাকে ইহাকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে দণ্ড উপায়ের প্রয়োগ বলা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশুর পিতা প্রভৃতিও শিশুর প্রতি ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করেন। এ সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রকারগণের উক্তিটী এই—

"অধীষ্ব পুত্রকাধীষ্ব তুভ্যং দাস্যামি মোদকান্।
যদ্‌বান্যস্মৈ প্রদাস্যামি কর্ণমুৎপাটয়ামি তে॥"
মিতাক্ষরা-যাজ্ঞবল্ক্য-আচারাধ্যায় ৩৪৬ শ্লোক।

এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং দণ্ডনীতির প্রয়োগ–ব্যবহার মাত্রেই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন বিচারালয়ে সাক্ষিপ্রমানাদি গ্রহণ করিয়া বিচারক যে প্রতিকূল সম্মতি প্রদান করেন তাহাই দণ্ড নামে আখ্যাত হওয়া উচিত। বিচারক কোন স্থলে অর্থদণ্ড, কোন স্থলে দেহদণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আর এই দণ্ডের ব্যবস্থাপ্রতিপাদক শাস্ত্রই দণ্ডনীতি শাস্ত্র নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে বিচারক যে ব্যক্তির প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি বিচারকের

নিরূপিত দণ্ডগ্রহণে অসম্মত হয়,—দণ্ডার্হ ব্যক্তি যদি উপেক্ষা করে তবে বিচারক তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন? সেই দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ডগ্রহণে বাধ্য করাইবে কে? ইহার একটীমাত্র উত্তর যে বিচারক যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন দণ্ডার্হ ব্যক্তি সেই দণ্ডগ্রহণে অসম্মত হইলে রাজা বল প্রয়োগ করিয়া সেই দণ্ডগ্রহণে বাধ্য করাইবেন। রাজার বলও যদি তাহা না পারে তবে দণ্ডার্হ ব্যক্তির কোনই দণ্ড হইবে না। দণ্ডার্হব্যক্তি রাজার বলকে লঙ্ঘন করিতে পারে না বলিয়াই বিচারকের দণ্ডের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। যদি রাজার বল না থাকিত তবে বিচারকের বিচারব্যবস্থা নিস্ফল উক্তিতেই পর্য্যবসিত হইত। সুতরাং বিচারালয়ের বিচার ব্যবস্থাও—বিচারকের ব্যবস্থিত দণ্ডও যে দণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাকে দণ্ড না বলিয়া মাত্র বিচারালয়ের বিচারকের ব্যবস্থাকে দণ্ডনামে ও তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রকে দণ্ডনীতি শাস্ত্র নামে অভিহিত করিলে অতি অসম্পূর্ণ একদেশ মাত্রে দণ্ডনীতি শব্দের প্রয়োগ হইবে। এজন্য ভারতীয় শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে দণ্ডনীতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এককথায় সর্ব্ববিধ ব্যবহার যাহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে তাহাকেই দণ্ড বলা হয়। দণ্ড ব্যতীত কোন ব্যবস্থাই সম্ভাবিত হইতে পারে না। যে স্থলেই দণ্ড শিথিল সেই স্থলেই দুর্নীতি প্রবেশলাভ করিয়া থাকে।

যদিও দণ্ডের প্রকার বহুবিধ তথাপি এই দণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, আন্তরদণ্ড ও বাহ্যদণ্ড। দণ্ডনীতি শাস্ত্রকারগণ বৃদ্ধসংযোগ ও ইন্দ্রিয় জয়ের দ্বারা অন্তরদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃদ্ধসংযোগ ও ঈন্দ্রিয়জয়ের দ্বারা নিজেই নিজেকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে তাহা পারে না তাহার জন্য বাহ্যদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের দণ্ডনীতি শাস্ত্রও যে অধ্যাত্মবিদ্যার বিরোধী নহে, অধ্যাত্মসম্পদ না থাকিলে দণ্ডনীতিও যথার্থ ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না, একথা মাত্র ভারতের আর্যজাতিই বুঝিয়া ছিলেন। এজন্যই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রয়োগকর্তার বৃদ্ধসংযোগ ও ইন্দ্রিয়জয়ের ব্যবস্থা ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রে করা হইয়াছে। অধ্যাত্মবিদ্যারও আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি এই ইন্দ্রিয়জয়ে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন অধ্যাত্মবিদ্যার অধিকারী হয় না এই রূপ দণ্ডনীতির প্রয়োগেও অধিকারী হইতে পারে না। এই কথা আমরা পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা মনে করি অধ্যাত্মবিদ্যা মাত্র বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হয়। অধ্যাত্মবিদ্যার স্থান, বিশেষ বিশেষ সভাসমিতিতে ও প্রবন্ধ পুস্তকাদিতে। ইহা ভিন্ন অধ্যাত্মবিৎ পুরুষের করণীয় আর কিছুই নাই। যিনি অধ্যাত্মবিৎ তাঁহার চরিত্র যাহাই হউক না কেন সভায় বা প্রবন্ধে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করিতে পারিলেই হইল। দণ্ডনীতির প্রয়োগকর্ত্তার সম্বন্ধেও আমাদের ইহাই ধারণা।

বাহ্যদণ্ডও—বাগ্দণ্ড, ধনদণ্ডাদিভেদে বহুবিধ। বস্তুতঃ কথা এই যে অন্তরদণ্ডের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বাহ্য দণ্ড প্রণয়নের ব্যবস্থা কখনো শিথিল করা উচিত নহে, আর এই কথাই ভগবান্ মনু সপ্তম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

‘সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥’

এই কথাই শান্তিপর্ব্বের ১৫ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। স্বর্গীয় ভরত শিরোমণি মহাশয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন – সমুদায় লোকই কেবল দণ্ডভয়ে সুপথগামী হয়, নতুবা স্বাভাবিক বিশুদ্ধস্বভাব মনুষ্য জগতে অতি বিরল, কেবল দণ্ডভয়েই সমুদায় জগৎ আবশ্যক ভোজনাদি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে। শান্তিপর্ব্বের ১৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত দণ্ডনীতি শাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন—শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ দণ্ড উদ্যত হইয়া যে রাষ্ট্র বিচরণ করে সে রাষ্ট্রের প্রজা কখনো বিষাদগ্রস্ত হয় না যদি রাষ্ট্রের নেতা সম্যগ্দর্শী হন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যই

দণ্ডভয়ে স্বীয় পথে অবস্থিত আছে। কেবল ইহলোকের ব্যবহার নহে পারলৌকিক ব্যবহারও দণ্ড ভয়েই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্জ্জুন বলিয়াছেন দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কেহ যজ্ঞ করিত না, দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কেহ দান করিত না, দণ্ডভয়ে ভীত না হইলে কোন পুরুষই মর্য্যাদায় স্থিত থাকিত না। আবার এই অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—যাহারা অনার্য্য, নাস্তিক, বেদনিন্দুক তাহারাও দণ্ডদ্বারা নিপীড়িত হইয়াই মর্য্যাদা পালন করিয়া থাকে। পশুপক্ষী পর্য্যন্তও দণ্ডভয়ে ভীত হইয়াই স্ব স্ব মর্য্যাদাতে অবস্থিত আছে। কাক, কুকুর প্রভৃতি মাংসাহারী প্রাণী যদি দণ্ডভয়ে ভীত না থাকিত তবে পশু মনুষ্য প্রভৃতিকে ইহারাই গ্রাস করিত। যজ্ঞের চরু পুরোডাশ প্রভৃতি কাক, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীই আহার করিত, যদি তাহারা দণ্ডভয়ে ভীত না থাকিত। ব্রহ্মচারী অধ্যয়ন করিত না, ধেনুকে দোহন করা যাইত না, কোন কন্যাই বিবাহিত হইত না যদি দণ্ড ইহাদিগকে পালন না করিত। বিশ্বপালক দণ্ড না থাকিলে সমস্ত মর্য্যাদার বিলোপ হইয়া যাইত—সমস্ত ব্যবস্থাই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, কাহারও কোন বিষয়ে স্বত্ব থাকিতে পারিত না। মহাভারতের এই কথাগুলি মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক হইতে ২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও, দণ্ডকে শ্যামবর্ণ এবং লোহিতাক্ষ বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—মনু রূপকভঙ্গীতে দণ্ডের স্তুতি করিতেছেন—দণ্ড দুই প্রকার দুঃখদ ও ভয়প্রদ। দণ্ড ভয়হেতু বলিয়া দণ্ডকে শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে এবং দুঃখহেতু বলিয়া দণ্ডকে লোহিতাক্ষ বলা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে রলা হইয়াছে—

"দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকান্ অভিবর্ত্ততে॥" ৭৮ শ্লোক

যাহার প্রভাবে এই জগৎ পুরুষার্থলাভে সমর্থ হইয়া থাকে তাহাকেই দণ্ড বলে। দণ্ডদ্বারা জগৎ পুরুষার্থে নীয়মান হয় বলিয়া ইহাকে দণ্ডনীতি বলে। অথবা যে নীতির দ্বারা দণ্ড প্রণীত হইয়া থাকে তাহাকে দণ্ডনীতি বলে। শান্তিপর্ব্বের ১২১ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—"কো দণ্ড কীদৃশো দণ্ডঃ কিংরূপঃ কিংপরায়ণঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দণ্ডসম্বন্ধে একাদশটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং এই একাদশটী প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে ভীষ্ম প্রদান করিয়াছেন। এই অধ্যায়টী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। পূর্ব্বে দণ্ডকে যে শ্যামবর্ণ, লোহিতাক্ষ বলা হইয়াছে এই অধ্যায়ের ১৫, ১৬ শ্লোকে বিস্তৃত ভাবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—

"দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্দণ্ডো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শশ্বদ্রূপং মহদ্বিভ্রন্মহান্ পুরুষ উচ্যতে॥"

এই দণ্ডই বিষ্ণু, এই দণ্ডই নারায়ণ, এই দণ্ডই মহাপুরুষ। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—এই দণ্ডই রাজা, এই দণ্ডই নেতা, এই দণ্ডই ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চতুরাশ্রমের ও ধর্ম্মের প্রতিভূ। এই দণ্ডকে মহাভারত মহান্ পুরুষ বলিয়াছেন, মনুসংহিতাতে এই দণ্ডকে পুরুষ বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিধি বলিয়াছেন—এই জগতে দণ্ডই একমাত্র পুরুষ আর কেহই পুরুষ নহে। অন্য সমস্তই স্ত্রী, কারণ যে দণ্ডের প্রভাবে বলবান্ পুরুষদিগকেও স্ত্রীলোকের মত অনায়াসে বশীভূত করিতে পারা যায়। ভারতীয় কোন সম্প্রদায় বলেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, অন্য সমস্তই স্ত্রী। ভগবান মনু বলিয়াছেন—দণ্ডই একমাত্র পুরুষ, আর সমস্তই স্ত্রী।

দণ্ডনীতি ও অর্থশাস্ত্র শব্দ দুইটি একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ কৌটিল্য দণ্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্র নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থশাস্ত্রাণি পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রস্থাপিতানি" ইত্যাদি। ইহার অর্থ পৃথিবীর লাভের জন্য এবং পালনের জন্য যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র পূর্বাচার্য্যগণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, প্রায়শঃ সেই সমস্ত শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া এই একটী অর্থশাস্ত্র প্রণীত হইল। আবার বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চারিটী বিদ্যা বলিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় কৌটিল্য দণ্ডনীতিকেই অর্থশাস্ত্র নামে ব্যবহার করিয়াছেন। দণ্ডনীতিকে অর্থশাস্ত্র বলা হয় কেন? কি অভিপ্রায়ে অর্থশাস্ত্র শব্দের প্রয়োগ হয় ইহার অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়—বৃত্তি স্থিতি প্রভৃতিই মনুষ্যের মুখ্য অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। মনুষ্যের স্থিতির দ্বারা মনুষ্যের আধারভূত পৃথিবীকেই অর্থ শব্দের লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদক করা হইয়াছে। এজন্য এস্থলে মনুষ্যবতী পৃথিবী—অর্থ শব্দের অর্থ; আর অর্থশাস্ত্র বলিতে মনুষ্যবতী পৃথিবীতে স্থিত মনুষ্যগণের বৃত্তির বা স্থিতির প্রতিপাদকশাস্ত্রই বুঝায়। মনুষ্যগণের নিরুদ্বেগে পৃথিবীতে অবস্থিতি ও বিবৃদ্ধির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা যে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাকে অর্থশাস্ত্র বলে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তির কারণ

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম কেন? ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ যে শাস্ত্রের আলোচনা হইতে বহুদিন বিরত হইয়াছেন, আজ অকস্মাৎ সেই শাস্ত্রের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি হইল কেন? আমি অর্থশাস্ত্রের কোন অগাধ পণ্ডিত নই। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া কোন দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিলে আমার পক্ষে শোভন হইত। ভারতের জনসাধারণও অর্থশাস্ত্রের কথা শুনিতে অভ্যস্ত নহে, যাহাতে আমারও পূর্ণযোগ্যতা নাই, জনসাধারণেরও রুচি নাই এমন বিষয়ের আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হইলাম এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমার মনে উদিত হয়। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে — নানাদিক্ হইতে যে দুঃখদুর্দ্দশা ভারত ভূমিকে গ্রাস করিয়াছে; অসংখ্যপথে দুর্নীতির প্রবাহ বেগে ধাবিত হইতেছে; ভারতীয় হিন্দু জনতার মধ্যে সমস্তকার্য্যেই ঘোর অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছে — এই সমস্ত দুঃখের মূলীভূত কারণ রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাব বলিয়া আমার দৃঢ়নিশ্চয় জন্মিয়াছে। রাষ্ট্রীয়চেতনার অভাবে মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সমষ্টিগত স্বার্থে তিলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে স্বভাবতঃই মানব প্রকৃতিতে নীচতা, ভীরুতা, ক্লীবতা, কাপুরুষতা প্রভৃতি প্রকাশমান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেরও তাহাই হইয়াছে। এই অবসাদ নিবারণের একমাত্র উপায় রাষ্ট্রনীতির প্রচার। রাষ্ট্রীয় চেতনা না থাকায় সমষ্টির স্বার্থ ধ্বংস করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন আমারা ধাবিত হই, তখন আমরা ইহা বুঝিতেই পারি না যে আমরা নিজেরা নিজেদের সর্ব্বনাশ কেমন করিয়া ডাকিয়া আনিতেছি। বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি আমাদের দেশে বহু আছেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেতনা না থাকায় তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারেন না যে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষিত না হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থও রক্ষিত হইতে পারে না। সমষ্টির স্বার্থরক্ষায় যিনি উদ্‌যুক্ত, ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে যিনি কোন অবস্থায়ই সমষ্ঠির স্বার্থকে বিনষ্ট করেন না, তিনিই রাষ্ট্রীয় চেতনাসম্পন্ন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ২১৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—

যো গ্রাম-দেশ-সঙ্ঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্।
বিসংবদেন্নরো লোভাত্তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ॥

ইহার অভিপ্রায় এই—যে ব্যক্তি কোন গ্রামের কোন দেশের বা কোন সঙ্ঘের স্বার্থরক্ষার জন্য শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেন—'আমি এই গ্রাম দেশাদির স্বার্থরক্ষার জন্য ইহা করিব'। পরে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের

লোভে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গ্রামের দেশের বা সঙ্ঘের অহিতাচরনে প্রবৃত্ত হন তবে তাদৃশ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিকূল আচরণকারী ব্যক্তির সেই রাষ্ট্রে বাস করিবার অধিকারই থাকে না। আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা স্বার্থপরায়ণ লোকের প্ররোচনায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিকূল যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি তাহাতে আমাদের বিবেক আহত হয় না। এমন নিঃসার শিক্ষা গ্রহণে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি যাহার প্রভাবে সমষ্টির স্বার্থের বিনাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দুঃখ বোধ করি না। ভগবান্ মনুর উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা সকলেই মনে মনে বুঝিতে পারিব যে আমিও এই অপরাধে অপরাধী কি না। সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি ভারতীয় জনতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, সুদীর্ঘকালের অভ্যস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সমষ্টির স্বার্থের বিনাশে আমাদের প্রবৃত্তির নিরোধ হউক, এই অভিপ্রায়ে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারতীয় জনতার স্বার্থান্ধ ব্যবহারে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিজের যোগ্যতার বিচারের অবসর পাই নাই। এই শাস্ত্রের আলোচনায় ভারতীয় জনতার—উল্লিখিত হীনতার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইবে, এইরূপ আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে। যদিও আমার প্রবন্ধ দ্বারা লোক উদ্বুদ্ধ হইবে না—ইহা জানি, তথাপি ভারতের মনীষিবর্গের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইলে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থরাশির দ্বারা ভারতীয় জনতার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিবে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই দুঃখ দুর্দ্দশার কোন প্রতিকারই সম্ভাবিত নহে। ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্তির হৃদয়ে অভিনব কর্ম্ম প্রেরণা অবশ্যই আসিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র যেমন অবশ্য অধ্যেতব্য বলিয়া সুধীসমাজ মনে করেন এইরূপ প্রত্যেক বালকবালিকার হৃদয়ে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধের জন্য ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। কৃষিজীবী, শিল্পজীবী, চিকিৎসাজীবী, বাণিজ্যজীবী—ভারতের যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন তিনি যে ভারতবাসী, ভারতবর্ষ যে তাঁহার একথা সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া আমি ভারতবাসী এইরূপ বলিলে তাহা কেবল ধার করা কথাই হইবে, নিজস্ব হইবে না।

কেবলমাত্র বিদেশীর অনুকরণ দ্বারা কোন রাষ্ট্রই স্বীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমরা যে কেবল অন্যের অনুকরণই করি তাহা নহে, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতিও আমাদের নাই। আমরা অন্যের চক্ষুতে দেখি, অন্যের কানে শুনি, অন্যের হৃদয়ে বিচার করি। এমন অন্ধতা ও বধিরতা আমাদের আসিয়াছে যে অন্যে দেখাইয়া না দিলে আমরা নিজের চক্ষুর সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পাই না, শুনিতেও পাই না। কেবল যে দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না—তাহা নহে, অন্যে দেখাইয়া না দিলে দেখা অপরাধ বলিয়া মনে করি। অন্যে শুনাইয়া না দিলে শোনাও গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করি। এককথায় ভারতবাসীর চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি আর ভারতবর্ষে নাই তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশে রহিয়াছে। এমন দুরবস্থা কোন জাতির বা কোন দেশের কোনদিন ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না।

অনেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে আর লাভ কি? সে তো বহু পুরাতন কথা। মানব সমাজের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখন আর প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি আলোচনা করিয়া কোন কল্যাণ হইতে পারে না। এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের নিকটে আমাদের বিনম্র নিবেদন এই যে, যাহা সত্য বস্তু তাহার কোন কালেই অন্যথা হইতে পারে না। সত্যবস্তু সর্ব্বদা সত্যই বটে। পরিবর্ত্তনশীল সিদ্ধান্তকে সত্য সিদ্ধান্ত বলা যায় না। আমাদের বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে – অতি প্রাচীন পরিকল্পনা অনুসারে রচিত এই মানব শরীরের অস্থি সংখ্যা বেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে, এমন কি সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়েও তাহাই আছে, এইরূপ পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতির সংখ্যা তাহাই আছে, অঙ্গুলির সংখ্যাও তাহাই আছে।

দেহের অভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির সংখ্যাও তাহাই আছে। চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচই বটে। এই সমস্তই অতি সুপ্রাচীন পরিকল্পনা। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষিত হইলেও ইন্দ্রিয়ের প্রাচীন সংখ্যার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অনেক নূতন আবিষ্কারের ফলেও সেই অতি পুরাতন পাঁচটি ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাত, আট বা দশটি হয় নাই। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যরূপ অতি পূর্ব্বেও ছিল এখনও তাহাই আছে বোধ হয় ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে। এই সুপ্রাচীন-পরিকল্পনানুসারী মানবদেহে নানাবিধ চিকিৎসাই প্রযুক্ত হইয়াছে; যখন যে জাতীয় চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে তখন সেই জাতীয় চিকিৎসার দ্বারাই এই প্রাচীন পরিকল্পনানুসারী মানবদেহ চিকিৎসিত হইয়াছে। দেহ প্রাচীন পরিকল্পনানুসারী বলিয়া নবীন রীতিতে চিকিৎসিত হইতে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। নবীন রীতির চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য নূতন প্রকারের মনবদেহের আবশ্যকতা ঘটে নাই। এইরূপ কত সুপ্রাচীনবস্তু, বর্ত্তমান নবীন সভ্যতার অবলম্বনরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু সমস্তই তো প্রাচীন পরিকল্পনানুসারী। নবীন রীতির জন্য এ সমস্ত কিছুই নূতন করিয়া গড়িতে হয় নাই। যত কিছু নূতন—সমস্তই প্রাচীনকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশমান হয়। পূর্ব্বতন কোন বস্তুরই স্পর্শ করিব না অথচ নূতনের সৃষ্টি করিব, এইরূপ উদ্ভট কল্পনা তো স্বস্থচেতা পুরুষ কখনই করিতে পারে না। নূতন সভ্যতায় পুরাতন কিছু চলিবে না—এইরূপ যে সমস্ত ভারতবাসী বর্ত্তমান সময়েও বলেন তাঁহাদের বিশেষ অভিপ্রায় এই যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে যাহা এদেশে আনীত হয় নাই তাহার ব্যবহার আমরা করিব না। একদিন এই নীতি বিশেষ কার্য্যকরী ছিল; নিজের আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হইত। আজও এই নীতি কতিপয় ব্যক্তির হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। ভারতবাসী অন্ধ ও বধির হইয়া পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুকরণ করিয়াছে। ভারতের দুই একটি লোক বুঝিতে পারিয়াছেন যে—এই অন্ধ অনুকরণের ফলে ভারতের কোন কল্যাণ হইবে না। এজন্য যদি কাহারও ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা স্মরণাতীত কালের সভ্য ভারতের এমন অসাধারণ আদর্শ সমস্ত দেখিতে পাইবেন যাহা পৃথিবীতে কোথাও সম্ভাবিত নহে। আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দ্বারা যদি কাহারও হৃদয়ে ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হয়, তবেই আমার এই প্রয়াস সার্থক্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ সম্পদ—আধ্যাত্মিকতা। এই সম্পদের আর তুলনা নাই। এই আধ্যাত্মিকতার মূলে নির্ম্মল ও নির্ব্যাজ ত্যাগ বিদ্যমান। আমরা দণ্ডনীতি শাস্ত্রে ভারতের যে বহিরাবরণ দেখাইলাম, ইহার অভ্যন্তরভাগে নির্ম্মল ত্যাগ দ্বারা সুমার্জ্জিত অখণ্ড অধ্যাত্ম সম্পদ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাষ্ট্রনায়কগণ বিপুল প্রয়াসে রাষ্ট্রকে সুসমৃদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই পরিণত বয়সে রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। গৃহে মৃত্যুর মত হীন মৃত্যু তাঁহারা আর কাহাকেও মনে করেন নাই। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া জীবনের অবসান করিয়াছেন। অখণ্ড ত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্র নায়কগণ এই সুমহৎ ঐশ্বর্য্যকে ধারণ করিতেন। এই দৃষ্টি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতাতেই স্বপ্নেরও অতীত। ভারতের এই অধ্যাত্ম সম্পদ রক্ষা করিবার জন্যই দণ্ডনীতি রূপ বহিরাবরণের আবশ্যকতা হইয়াছিল। রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে কোন সম্পদই রক্ষিত হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই বীতরাগ মুনি অক্ষপাদ আন্বীক্ষিকীরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার পরিপুষ্টির জন্য ন্যায় শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঋষি বীতরাগ হইয়াও এই অধ্যাত্মবিদ্যার রক্ষার জন্যই জল্প বিতণ্ডারূপ পরপক্ষ নির্জ্জয়কারিণী কথারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই জল্প, বিতণ্ডা কথার জন্যই ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি কথাঙ্গ পদার্থ সমূহের নিরূপণ করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে বীতরাগ পূরুষের এই সমস্ত—ছল, জাতি প্রভৃতির নিরূপণ অসঙ্গত বলিষা মনে হইলেও, যাঁহারা পরিণত বুদ্ধি তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে অধ্যাত্মবিদ্যা-সংরক্ষণের জন্যই ঋষি এই আয়োজন করিয়াছিলেন।

অক্ষপাদ নিজেই বলিয়াছেন—'তত্ত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ'। অক্ষপাদ সূত্র ৪, ২, ৫০।

এই দৃষ্টি লইয়াই ভারতীয় তীর্থসমূহে সুবিপুল দেবমন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল—যেমন জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, রামেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি। দেববিগ্রহসমূহ বৃক্ষতলে স্থাপিত হইলে তাহা কোন্ কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। অর্জ্জিত বস্তুর রক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল অর্জ্জন করিলে তাহা নিতান্তই নিস্ফল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডনীতির আলোচনায় ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইবে না প্রত্যুত অধ্যাত্ম সম্পদের রক্ষার জন্যই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুশীলন ও তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্তি একান্ত আবশ্যক।

ভারতের সর্ব্ববিধ সভ্যতার আদি উৎপত্তিস্থান বেদ—কেবল ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার আদি উৎপত্তিস্থান বেদ। এজন্য প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিরও উৎপত্তি স্থান বেদ। বেদে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে বেদের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সমূহে তাহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋক্ সংহিতার অষ্টম অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে ৩১ ও ৩২ বর্গে দুইটি সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। প্রথম সূক্তটি আঙ্গিরস ধ্রুব কর্ত্তৃক দৃষ্ট। দ্বিতীয়টি আঙ্গিরস অভীবর্ত্ত কর্ত্তৃক দৃষ্ট। প্রথমসূক্তে ছয়টি ঋক্ মন্ত্র আছে এবং দ্বিতীয় সূক্তে পাঁচটি ঋক্ মন্ত্র আছে। এই দুইটি সূক্তই অভিষিক্ত রাজার স্তুতির প্রতিপাদক। স্তুতিচ্ছলে রাজার কর্ত্তব্য, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজার প্রতি প্রজাগণের প্রীতির কারণ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে এই দুইটি সূক্ত পাঠ করিলে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা উল্লিখিত প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিব—

"আ ত্বা হার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্ব্বাবাঞ্ছন্তু মাত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশত্॥" ঋক্সং ৮|৮|৩১

এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "হে রাজন্, আমাদের রাষ্ট্রের স্বামী—অধিপতি হইবার জন্য তোমাকে আহরণ করিয়াছি। তুমি আমাদের মধ্যে স্বামী হও এবং তুমি স্থির হইয়া চলন রহিত হইয়া রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়া থাক। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজা তোমাকে বাঞ্ছা করুক—'ইনিই আমাদের রাজা হউন' এইরূপ কামনা সমস্ত প্রজারা করুক। তোমা হইতে এই রাষ্ট্র যেন ভ্রষ্ট—বিযুক্ত না হয়।" সমস্ত প্রজারাই একজন রাজাকে রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে কামনা করিবে—ইহাই ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের একটি প্রবল দল রাজার অনুকূল থাকিবে, রাষ্ট্রের অপর বিরোধীদলগুলিকে রাজা রাজশক্তির দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন সাধারণতঃ ইহাই লোকে বুঝিয়া থাকে। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজাই রাজাকে হৃদয়ের সহিত কামনা করিবে এইরূপ কোন নীতি সাধারণলোকে কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু ঋক্ মন্ত্র বলিতেছেন—রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজাই যেন তোমাকে কামনা করে। যাদৃশ নীতি অবলম্বন করিলে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজা, রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাদৃশ নীতির প্রদর্শন ও তাহার বিশ্লেষণই ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রদর্শিত মন্ত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—স্বর্গত রাজার পুত্র বা পুত্রের অভাবে পুত্রস্থানাপন্ন কোন রাজবংশীয় পুরুষ, রাষ্ট্রের প্রজাগণের সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ লোকে ইহাই মনে করে, কিন্তু ঋক্ মন্ত্র বলিতেছেন—তোমাকে আহরণ করিয়াছি, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই লোকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য আহরণ করে। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোনয়নকেই আহরণ বলা যায়। প্রজাগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি রাজপদ অধিকার করে তাহাকে রাজপদ গ্রহণের জন্য আহরণ করিয়াছি এইরূপ বলা যায় না।

সূর্য্যবংশের সম্রাট্ মহারাজ সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জা প্রজাপীড়ক ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজপদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এইরূপ চন্দ্রবংশীয় সম্রাট্ মহারাজ প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি প্রজাগণের অভিলষিত ছিলেন বলিয়া রাজপদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। রাজার যাদৃশ যোগ্যতা থাকিলে রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণ রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য যাহার আহরণ করে এবং যে যোগ্যতা থাকিলে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজাগণ যাহার রাজ্য কামনা করে বলিয়াই তাহার রাজ্যের কখনও ভ্রংশ ঘটে না, সেই যোগ্যতার পরিচায়ক গুণরাশি ও কর্ম্মরাশিকে বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্র বা দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। যদৃচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রজাপীড়ক, ধর্ম্মদ্রোহী, রাজনীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, দুর্জ্জন, কাপুরুষকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য কোন রাষ্ট্রেরই সমস্ত প্রজা তাহার আহরণ করে না এবং তাহার সুস্থির রাজত্বও কামনা করে না।

শান্তি পর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ের ৪৪|৪৫ শ্লোকে অতি সংক্ষেপে রাজবৃত্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই প্রদর্শিত মন্ত্রের আশয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ভীষ্ম সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—গর্ভিণী স্ত্রী যেমন স্বীয় অভিলষিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর গর্ভেরই হিতচিন্তা করিয়া থাকেন, রাজাও এইরূপ স্বকীয় ভোগবিলাসে নিমগ্ন না হইয়া রাজার গর্ভস্থানাপন্ন রাষ্ট্রের নিরন্তর হিতচিন্তা করিবেন। যে রাজা স্বীয় ভোগবিলাসে নিমগ্ন না হইয়া রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বদা হিতচিন্তা করেন তিনি রাজপদের জন্য রাষ্ট্রবাসীর আহরণের যোগ্যও বটেন এবং সমস্ত প্রজাগণের বাঞ্ছনীয়ও বটেন। আবার শান্তিপর্ব্বের ৯২ অধ্যায়ে বামদেব গীতাতে বলা হইয়াছে—যে রাজা অধর্ম্মদর্শী ও প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে রাজার সচিববৃন্দ অসজ্জন ও পাপীষ্ঠ সেই ধর্ম্মঘাতী রাজা সকল জনের বধ্য হইয়া থাকেন। যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠাতা, কামচারী, বহুভাষী, আত্মশ্লাঘাকারী তাদৃশ রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইলেও অতিসত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার বলা হইয়াছে "রাজা ধর্ম্ম, অর্থ, বুদ্ধি ও মিত্র ইহাদের বর্দ্ধনে ও পরিপালনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেন। রাজা কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, বুদ্ধি ও মিত্রের সঞ্চয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন না।" ৮–১২ শ্লোক

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র, দণ্ডনীতির স্বরূপ ও তাহার আবশ্যকতা অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা প্রদর্শন করা একান্ত অসম্ভব। যে দৃষ্টি লইয়া আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি ভারতের মনীষীবর্গের মধ্যে অন্য কেহ এইরূপ দৃষ্টি লইয়া প্রবৃত্ত হন এবং যে ভাবে দণ্ডনীতি গ্রন্থের সঙ্কলন করিলে ভারতীয় জনতার চিত্ত অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে—সেইভাবে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের বহুতর গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস করেন, তবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রযত্ন সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া মনে করি। আরও বিশেষ কথা এই যে যাঁহারা ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের আলোচনায় অভিলাষী যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দক নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় যাঁহারা অভিলাষী তাঁহারা আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় বিশেষ সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির প্রকৃত রসাস্বাদে সমর্থ হইবেন। এই সমস্ত দুরূহ অর্থশাস্ত্র তখন আর বিরস বলিয়া বোধ হইবে না। এজন্য এই প্রবন্ধকেই ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধেও তাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে আরও বিশেষ লাভ এই হইবে যে ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অসাধারণ গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যাহা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে, এই অসাধারণ গ্রন্থের সমাদরে অসহিষ্ণু হইয়া, দুইএকজন পাশ্চাত্ত্য দেশীয় পণ্ডিত, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র যে কিছুই নহে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবিলাসমাত্র, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাবিধ অসম্বদ্ধ উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে

করিয়াছেন ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রে কেবলমাত্র কৌটিল্যই কতগুলি কথা বলিয়াছিলেন বস্তুতঃ ভারতবর্ষে দণ্ডনীতি শাস্ত্র বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতের মিত্র এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অসম্বদ্ধ ভাষণেরও সমুচিত উত্তর এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যাইবে।

আর্য্য সভ্যতা ও ম্লেচ্ছ সভ্যতার ইহাই অসাধারণ বৈলক্ষণ্য যে—ম্লেচ্ছ নরপতিগণ কোন দেশ জয় করিলে, সেই জিত দেশের সভ্যতা যে কিছুই নহে, সেই দেশে যে কোন মনস্বী ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না ইহাই প্রতিপাদনের জন্য—সেই জিত দেশের জনতাকে ইহাই বিশেষভাবে বুঝিয়া দিবার জন্য, নিতান্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না, কিন্তু আর্য্য সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর্য্য নরপতিগণ কোন দেশ জয় করিলে সেই জিত দেশের নরপতির যে সমস্ত সদ্‌গুণরাশি ছিল তদপেক্ষা অধিক-সদ্‌গুণ অবলম্বন করিতে উৎসাহী হইতেন। জেতৃদেশের সদ্‌গুণ বর্দ্ধনে অতিমাত্র প্রযত্নশীল হইতেন। নিজের সদ্‌গুণ বর্দ্ধনে উদাসীন হইয়া কেবলমাত্র জিত দেশের কুখ্যাতি প্রচারের জন্য কখনও যত্নশীল হইতেন না। আমাদের এই প্রবন্ধে কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে দণ্ডনীতি পরিচ্ছেদটী পাঠ করিলে পাঠক ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে—দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া যুধিষ্ঠিরের কুকীর্ত্তি প্রখ্যাপনের জন্য যত্নশীল হন নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সদ্‌গুণরাশি অপেক্ষা অধিকতর সদ্‌গুণমণ্ডিত হইবার জন্যই মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মহাভারত আলোচনা করিলেও এই কথা আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

বহুদিন পূর্বে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৮ সালে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিদ্যোৎসাহী স্নেহভাজন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এবং প্রযত্নে গবর্নিং বডির সদস্যমণ্ডলী এই গ্রন্থমুদ্রণের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের নিকটে আবেদন প্রেরণ করেন। গবর্ণিং বডির সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বাঙ্গলা সরকার এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যয়স্বরূপ এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাতে বাস করেন, সেই বিদ্বদ্বরেণ্য ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ও এই গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পঞ্চ শত মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। আমি ভদবচ্চরণে ইঁহাদের সকলের কল্যাণ কামনা করি।

স্নেহভাজন শ্রীমান্ অম্বিকা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী বহু কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া অতি উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির লেখন কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের ছাত্র শ্রীমান্ সোমনাথ ভট্টাচার্য্য ছাত্রী শ্রীমতী বাসনা সেন ও শ্রীমতী উমা সান্ন্যাল এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন। আমি ভগবানের নিকটে ইঁহাদের কল্যাণ কামনা করি। পরিশেষে আমার বিশেষ নিবেদন এই যে—আমার শরীর অসুস্থ থাকায় এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন সম্যক্‌ভাবে করিতে পারি নাই, এজন্য বহু স্থলে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগছি

২৯, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে দণ্ডনীতি, রাজধর্ম্ম, অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শাস্ত্র কি ভাবে ভারতভূমিতে আবির্ভূত ও প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের এই অধ্যায় সূত্রাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। যদিও রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ সুবিশদ বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তথপি রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাবে ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতে সুদীর্ঘ দিন হইতেই শিথিলাদর হইয়াছেন। কি ভাবে রাষ্ট্রীয় চেতনার অবসাদ ভারতবর্ষে ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে পরে আলোচনা করিব। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যে দেশে দণ্ডনীতি উপেক্ষিত হইবে, সেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতি অবশ্যম্ভাবী। রাজধর্ম্মানুশাসনের ৫৬ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, "সমস্ত জীবলোক রাজধর্ম্মেই আশ্রিত। ধর্ম্ম-অর্থ প্রভৃতি চতুবর্গ রাজধর্ম্মেই সমাহিত। অশ্বের যেমন রশ্মি (লাগাম), হস্তীর যেমন অঙ্কুশ, এইরূপ রাজধর্ম্ম সমস্ত লোকের সৎপথে পরিচালক। এই রাজধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলে কোনরূপ লোকসংস্থাই থাকিতে পারে না, সমস্তই ব্যাকুলীকৃত হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অশুভ অন্ধকারের নিবারণ করিয়া থাকে, এইরূপ রাজধর্ম্ম সমস্ত জীবলোকের অশুভ গতির নিবারণ করিয়া থাকে।" মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসনের ৬৩ অধ্যায়ে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, "যেমন হস্তীর পদচিহ্নদ্বারা সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন গ্রস্ত হইয়া থাকে, এইরূপ রাজধর্ম্মদ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মই গ্রস্ত হইয়া আছে। দণ্ডনীতির উপেক্ষাতে বেদের উচ্ছেদ, সমস্ত বিবৃদ্ধ ধর্ম্মের বিনাশ এবং সমস্ত আশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়া থাকে।" বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের যে কোনও গ্রন্থেই এই দণ্ডনীতির আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অর্বাচীন গ্রন্থে দণ্ডনীতি সর্ব্বথাই উপেক্ষিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সংঘটন, পরিপালন প্রভৃতি এই শাস্ত্রে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হইয়াছে। অথচ এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ হইতে দীর্ঘদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, কাব্য দর্শন প্রভৃতির নাম অনেকেই জানেন, আংশিক আলোচনা এখনও অনেকে করেন, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি আছে, ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং এই শাস্ত্রের আলোচনা তো দূরের কথা।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতির শেষকর্ণধার ভগবান্ কৌটিল্য যে অর্থশাস্ত্র সংঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের আলোচনা করিলে মনুষ্যমাত্রেরই রাষ্ট্রীয় চেতনার পুনরুজ্জীবন অবশ্যম্ভাবী, উদাসীনভাবে এই গ্রন্থের আলোচনা করিলেও মনুষ্যমাত্রেরই চিত্ত, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইবে। বড়ই দুঃখের কথা এই যে, সেই গ্রন্থের আলোচনা কেহ করেন না বলিলেও চলে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবহার-প্রকরণে যে বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান সময়ে দেওয়ানী, ফৌজদারী বিচার বলিয়া সুপরিচিত, তাহা এই কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্মস্থীয় অধিকরণে অতি অসাধারণ নিপুণতার সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন নারদ-স্মৃতি, মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবহারপ্রকরণের সুবিশদ আলোচনাতে পরিপূর্ণ। এই শাস্ত্র হইতে আংশিক উদ্ধরণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা মিতাক্ষরা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন আচার্য্য অসহায়, এই নারদ-স্মৃতির

ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত ছিল, সেই সময়ে এই জাতীয় গ্রন্থ, বহু প্রণীত হইয়াছে এবং তাহার সমাদরও অত্যধিক ছিল। অষ্টম শতকে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকা বালক্রীড়া, নবম শতকে রচিত মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ, এই রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনাও বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের সূত্রাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, "অতি প্রাচীন কালে রাজ্য, রাজা, দণ্ড, দণ্ডী কিছুই ছিল না। প্রজাসমূহই ধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিত। সুদীর্ঘ দিন এইরূপে রক্ষিত হইবার পরে প্রজাসমূহের মধ্যে বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে প্রজাপুঞ্জ খিন্ন ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তখন মুগ্ধ জনগণ লোভগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত রাগ-দ্বেষযুক্ত হইয়াছিল এবং নানারূপ অকার্য্যে তাহাদের রুচি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রজাপুঞ্জের এইরূপ বিপ্লবে বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে দেবগণের প্রার্থনানুসারে পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একখানি মহাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।" এই গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও বিপুলা—দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পিতামহ-প্রণীত এই মহাগ্রন্থ "পৈতামহতন্ত্র" নামে পরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্র সংঘটন ও তাহার রক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা অতি বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলির অতিবৃহৎ সূচীপত্র মহাভারতের সূত্রাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। মাত্র এই সূচীপত্রখানিই প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইতে পারে।

এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রও বহুদিন হইতেই অনালোচিত বলিয়া মহাভারতের টীকাকারগণও ইহার সম্পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পাঠকবর্গের নিকটে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে—তাঁহারা যেন এই রাজধর্ম্মের সূত্রাধ্যায়টি পাঠ করিয়া দেখেন।

এই পৈতামহতন্ত্র যে অতি বিশাল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে গ্রন্থের এক লক্ষ অধ্যায়, তাহার প্রতি অধ্যায়ে ২০টী শ্লোক থাকিলেও সেই গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা ২০ লক্ষ হয়। এইরূপ বিশাল গ্রন্থ যে সাধারণ মানুষের অধ্যয়নযোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এজন্য ভগবান্ বিশালাক্ষ মহাদেব এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া দশ হাজার অধ্যায়যুক্ত একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম বৈশালাক্ষ তন্ত্র। এই বৈশালাক্ষ তন্ত্র হইতে বহু সিদ্ধান্ত কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রে ভগবান্ উমাপতি শঙ্করই বিশালাক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই কথা না জানার জন্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সম্পাদকগণ বিশালাক্ষের পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা বালক্রীড়াতেও এই বিশালাক্ষ তন্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভগবান্ ইন্দ্র এই বিশালাক্ষ তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া পাঁচ হাজার অধ্যায়ে আর একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম বাহুদন্তক তন্ত্র। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে এই তন্ত্র হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলে ইন্দ্রকে বাহুদন্তীর পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই বাহুদন্তক তন্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক তিন হাজার অধ্যায়ে ভগবান্ বৃহস্পতি আর একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম বার্হস্পত্য তন্ত্র। এই বার্হস্পত্য তন্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক ভগবান্ শুক্র (উশনা) এক হাজার অধ্যায়ে আর এক খানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এই তন্ত্রের নাম ঔশনস তন্ত্র। এই সমস্ত তন্ত্র হইতেই সিদ্ধান্তসমূহ, কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে কৌটিল্য বলিয়াছেন—"পৃথিবীর লাভ ও পালনাদির জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, প্রায়শঃ সেই সমস্ত গ্রন্থ একত্র সঙ্কলিত করিয়া এই অর্থশাস্ত্র (দণ্ডনীতি) সঙ্কলিত হইল।"

বিশালাক্ষ, উশনা প্রভৃতি যেমন পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ এবং গৌরশিরা মুনি প্রভৃতি আচার্য্যগণও দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রণেতৃ আচার্য্যগণ সকলেই ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। (রাজধর্ম্মপর্ব্ব ৫৮ অধ্যায় ২|৩ শ্লোক) প্রাচীনসময়ে—ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণেতা ও পরিচালক ছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা ম্লান হইত না। বর্ত্তমান সময়ে আমরা মনে করি রাষ্ট্রতন্ত্রের আলোচনা দুর্জ্জনের কার্য্য, তাহা সজ্জন ধার্মিকের কার্য্যই নহে। রাষ্ট্রীয়চেতনার অভাবে আমাদের দারুণ অধঃপতনের জন্যই আমরা এইরূপ মনে করি। দুর্জ্জন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণেতা ও পরিচালক হইলে সেই রাষ্ট্রের কোন রূপেই কল্যাণ হইতে পারে না।

ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা, এইরূপ ভগবান্ প্রাচেতস মনু দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের প্রণেতা। ভারতাচার্য্য দ্রোণ কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইয়া যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—'আমি যেমন ষড়ঙ্গবেদ অবগত আছি, এইরূপ আমি মানবীয় অর্থশাস্ত্রও অবগত আছি' (দ্রোণপর্ব্ব ৭ অধ্যায় ১ম শ্লোক)। এই মানব অর্থশাস্ত্র প্রাচেতস মনুবিরচিত। অনেকে স্বায়ম্ভুব মনু ও প্রাচেতস মনুর ভেদ বুঝিতে না পারিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকেই অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা মনে করি দক্ষ প্রজাপতিই মহাভারতে প্রাচেতস মনু নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজধর্ম্মপর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে প্রাচেতস মনুপ্রণীত রাজধর্ম্মের উল্লেখ আছে, এবং সেই গ্রন্থ হইতে দুইটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভারতের অন্য স্থলেও প্রাচেতস মনুর গ্রন্থ হইতে সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে—দণ্ডনীতির প্রণেতা ভীষ্ম কৌণপদন্ত নামে এবং যদুবংশীয়দের প্রধান মন্ত্রী উদ্ধব বাতব্যাধী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে—কামন্দকনীতিসার, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থেরই সঙ্কলন মাত্র। কামন্দকনীতি কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা কামন্দকনীতিতেই বলা হইয়াছে। মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে অসুররাজ শম্বরকেও রাষ্ট্রনীতির প্রণেতা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়—শুক্রাচার্য্য হইতেই অসুরগণের মধ্যে এই দণ্ডনীতি শাস্ত্র প্রসারলাভ করিয়াছিল। উদ্যোগপর্ব্বের ৭২ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে শাম্বর সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব প্রভৃতিকে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ঋষিরাই সম্রাট্ দশরথের রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন। রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডের শততম অধ্যায়ে রামচন্দ্র ভরতের নিকট রাষ্ট্রনীতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি আলোচনা করিলে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বহু নূতন কথা জানা যাইবে। রামায়ণের এই অধ্যায়ের অনুরূপ একটি অধ্যায় মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে। সভাপর্ব্বের পঞ্চমাধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট রাষ্ট্রতন্ত্রের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণের প্রদর্শিত অধ্যায়ের অনুরূপ এই অধ্যায়টি হইলেও রামায়ণের আলোচনা অপেক্ষা মহাভারতের আলোচনা বিস্তৃত ও গম্ভীর। মহাভারতের এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে দেবর্ষি নারদসম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিঞ্চিৎ সুমার্জ্জিত হইবে। আমরা বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুসারে দেবর্ষিকে কেবলমাত্র ভক্তিবাদের পরমাচার্য্য বলিয়াই জানি। কিন্তু মহাভারতের উক্তস্থল অধ্যয়ন করিলে তাঁহাকে বিপরীত বলিয়া বোধ হইবে। ছান্দোগ্যউপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদকে যাদৃশ বিজ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, মহাভারতের উক্ত অধ্যায়ে দেবর্ষির স্বরূপ সেই উপনিষদ বর্ণনার অনুরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রেও নারদপ্রণীত রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে বহু সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। কৌটিল্যঅর্থশাস্ত্রে নারদকে পিশুন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রপ্রণেতৃ আচার্য্যগণের নাম নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। যেমন ভগবান্ বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য নামে অভিহিত হইয়াছেন, এইরূপ নারদ পিশুন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পিতামহ ভীষ্ম কৌণদন্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের আচার্য্যগণের এইরূপ নামবিপর্যাসের কারণ অনুসন্ধান করিলে আরও কিছু গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। যাহাহউক, অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাহার ভূমিকারূপে আমরা আচার্য্যগণের পরিচয়সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটি কথা বলিলাম।

রাষ্ট্রীয়চেতনার অভাব বশতঃ আমাদের নিকটে বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকটে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনা অত্যন্ত বিরস ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু বাংলার তথা ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ের একমাত্র অবলম্বন এই রাষ্ট্রতন্ত্র। রাষ্ট্রের জনসাধারণকে ইহাতে উদ্বুদ্ধ করাই একমাত্র বর্ত্তমান দুঃসময়ের প্রতিকার। শিশুকাল হইতেই এই রাষ্ট্রতন্ত্রশিক্ষার প্রচলন অত্যাবশ্যক। গণিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের মত এই রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুশীলনও বাল্যকাল হইতেই হওয়া আবশ্যক। ইহাতে জনসাধারণের উৎসাহ, কর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য, দক্ষতা, চাতুর্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। মাত্র এই শাস্ত্র পড়িলেই কার্য্য সমাপ্ত হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে কার্য্যসম্পাদনচাতুর্য্য আয়ত্ত করিতে হইবে। এজন্য শিক্ষার ও শিক্ষকের বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যে রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ এই রাষ্ট্রনীতিতে কুশল নহে, সেই রাষ্ট্রের উন্নতি অসম্ভব। আমরা এই প্রবন্ধের পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি যে—অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এই তন্ত্রের আস্বাদ-গ্রহণে ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করা শিক্ষিত সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে—ভারতের স্বরূপ অবগত হইয়া রাষ্ট্রতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে হইলে অতিনিপুণতার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রীতিতে সাধারণতঃ রামায়ণ ও মহাভারত আলোচিত হইয়া থাকে, তাহাতে যথার্থ কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত গ্রন্থগুলির আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতির স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার কতদূর উপযোগিতা আছে, তাহাও স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারা যাইবে। যাঁহারা মনে করেন প্রাচীন ভারতে আবার রাষ্ট্রনীতি কি ছিল, তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে—রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যেন তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। ভারতবর্ষের স্বরূপ অবগত না হইয়া কোন নীতি ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইলে তাহা কল্যাণজনক না হইয়া অকল্যাণেরই হেতু হইবে; আজ আমাদের সর্ব্ববিষয়েই অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছে বিশেষতভাবে অধ্যয়নে। আজ এমন কেহ কি ভারতের বান্ধব নাই, যাঁহারা এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ভারতের যথার্থ স্বরূপ ও তাহার নীতি প্রকাশ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন? আমাদের এই প্রবন্ধ তাদৃশ ভারতবান্ধবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য উপস্থিত করিলাম।

আমরা বাল্মীকি রামায়ণে দেখিতে পাই, মধ্য রাত্রিতে মহারাজ দশরথের মৃত্যু হইলে পরদিন প্রভাত সময়ে সমস্ত রাজ্যপরিচালক ব্রাহ্মণবর্গ রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য রাজসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। মহারাজ দশরথের স্বর্গারোহণে ও রাজকুমারগণের রাজধানীতে অনুপস্থিতিতে এই সাম্রাজ্য অরাজক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অরাজক রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য মনে করিয়া রাজ্যপরিচালক ব্রাহ্মণবর্গ রাজ্যকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রাজসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এই রাজ্যপরিচালক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, জাবালি ও বশিষ্ঠের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অপর রাজামাত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ বশিষ্ঠকে প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিয়োজনপূর্ব্বক অযোধ্যার রাজসভাতে রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ—সজ্জন ধার্ম্মিকগণই রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচালক ছিলেন। দুর্জ্জনগণের রাষ্ট্রতন্ত্রে অধিকার ছিল না (রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ৬৭ অধ্যায়)। এই অধ্যায় আলোচনা করিলে আরও জানা

যায় যে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ রাষ্ট্রকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন। রাষ্ট্রের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কি ছিল, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি তাঁহাদের হৃদয়কে কিভাবে আলোড়িত করিত। এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আমাদের এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য রাজার অভাবে যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।

রামায়ণের এই অধ্যায়ে রাজ সভায় মিলিত মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন যে——"সম্রাট দশরথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন মহারাজের চার পুত্রের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ বনবাসী হইয়াছেন, অপর দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন সুদূরবর্ত্তী কেকয় রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন আজ রাজপদ শূন্য হইয়াছে। আমাদের এই সমৃদ্ধ রাজ্য, মাত্র রাজার অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত না হউক এজন্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন একজন যোগ্যব্যক্তিকে অদ্যই রাজপদে অভিষিক্ত করা হউক"।

এইস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে একজন ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষকে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা দশরথের চারিটি পুত্র জীবিত রহিয়াছেন তাঁহারা দূরদেশে রহিয়াছেন বলিয়া ঋষিগণ স্বেচ্ছায় রাজপদে অন্যপুরুষকে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। রাজ্যে মন্ত্রিমণ্ডলের কতখানি অধিকার থাকিলে এইরূপ প্রস্তাব সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। আরও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য এই যে—ইক্ষ্বাকু বংশীয় অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজা করিবার পক্ষে ঋষিগণ এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে আমাদের এই সমৃদ্ধ রাজ্য কেবলমাত্র রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতে দিব না। আমরা জানি রাজ্য রাজা দশরথের ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রগণের। ঋষিরা বলিতেছেন রাজ্য আমাদের, এবং যে কোন ব্যক্তিকে রাজা করিয়া আমরা রাজ্যকে রক্ষা করিব। ইহাই প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রশাসনের একটি স্বরূপ—ইহা তথাকথিত গণতন্ত্র নহে। গণতন্ত্রেও রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ রাজ্যকে নিজের বলিয়া ভাবিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। গণতন্ত্রের রচনাই এমন চমৎকার যাহাতে কোনমতেই রাজ্যের প্রজা রাজ্যকে নিজের ভাবিতেই পারে না। কিন্তু প্রাচীন ভারতের রাজ-তন্ত্রের রচনা এমনই ছিল যে তাহাতে প্রজাবৃন্দ রাষ্ট্রকে নিজের তো ভাবিবেই, প্রত্যুত রাষ্ট্রের জন্য রাজা নিরূপণও তাহাদের হাতে। যদি তাহা না হইত তবে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেন না। এই অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রক্ষক রাজা না থাকিলে রাষ্ট্রই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়——রক্ষক শূন্য রাষ্ট্রের দুর্গতি সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ দুর্গতি এই যে বহুধন সমন্বিত কৃষিজীবিগণ ও ধনবান্ পশুপালকগণ রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া বাড়ীর সমস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। রাজশূন্য রাজ্যের এইরূপ দুর্গতি হয়। আমরা কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির রক্ষণাধীনে থাকিয়াও বিবৃত দ্বার গৃহে নিদ্রা যাইতে পারি না——দরিদ্রই পারেনা ধনীর তো কথাই নাই। কৃষিজীবিগণ ধনবান্, ইহাতো আমাদের স্বপ্নেরও অতীত হইয়াছে। রাজশূন্য রাজ্যের যে অসুবিধা বলা হইয়াছে আমরা রাজ-রক্ষিত রাজ্যেও তাহার শতগুণ অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। কতকগুলি মূঢ়লোক ভারতের কোন সংবাদই না রাখিয়া ভারতীয় রাজ-তন্ত্রের বহু গ্লানি প্রচার করিয়াছেন।

রামায়ণের এই অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অরাজক রাজ্যে কুমারীগণ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য সায়ংকালে উদ্যান-সমূহে গমন করিতে পারে না। আমরা প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির দ্বারা রক্ষিত রাজ্যে দেখিয়াছি যে নিরাভরণ কুমারীগণও গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াও রুদ্ধ গৃহে বাস করিয়াও দিবাভাগেও তাহাদের সম্মান ও জীবন রক্ষা করিয়া বাস করিতে পারে না। কতকগুলি কূপ মণ্ডুক সমালোচক অতি মূঢ়ের মত প্রাচীন ভারতের সভ্যতার বিরুদ্ধে কটুরটন করিয়া জনসাধারণের কেবলমাত্র কর্ণজ্বর উৎপাদন করিয়া থাকেন। রামায়ণের এই অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অরাজক রাজ্যে বিলাসী

জনগণ শীঘ্রগামী যানে আরোহণ করিয়া রমণীগণের সহিত বনভূমি সমূহে বিহার করিবার জন্য গমন করিতে পারে না। রামায়ণের এই অধ্যায়ে এইরূপ আরও বহু কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতের রাজার রাজ্য রক্ষার স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। এইস্থলে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য এই যে আমাদের উদ্ধৃত কথাগুলির বক্তা মার্কণ্ডেয় মৌদ্‌গল্য প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যখন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য উপপ্লব্য নগরী হইতে হস্তিনা নগরীতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মশ্রীতে দীপ্যমান ঋষিগণকে নিজের গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সন্মিলিত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা কোন্ প্রয়োজনে কোথায় যাইতেছেন? এবং আমিই বা আপনাদের জন্য কি করিতে পারি? এতদুত্তরে ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, হস্তিনাতে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সন্ধির আলোচনার জন্য মহতী সভার অধিবেশন হইবে। যে সভাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, মহামতি বিদুর প্রভৃতি উপস্থিত হইবেন, যে সভাতে হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইবে, সেই সভাতে তোমার ও অপর পক্ষের বিচিত্র আলোচনা শ্রবণ করিবার জন্য আমরা হস্তিনা নগরীতে যাইতেছি। এই সভাতে যথার্থ সত্য ও রাষ্ট্রের হিতকারক বহু সমস্যার আলোচনা হইবে। এই সভাতে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণ দেবর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ সম্মিলিত হইবেন। (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৮৩ অধ্যায়)

এই অধ্যায় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, রাষ্ট্রের শুভাশুভ উপেক্ষা করিয়া ঋষিসমাজ ভারতবর্ষে বাস করিতেন না। আজ আমরা কি ইহা কল্পনা করিতে পারি যে, কোনও রাষ্ট্রীয় আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আমাদের দেশের অধ্যাত্মবাদিগণ সম্মিলিত হইবেন? সম্মিলিত হইবার কোনও প্রয়োজনীয়তাও কি তাঁহারা বোধ করেন? রাষ্ট্রীয় আলোচনায় সম্মিলিত হইবার যোগ্যতাও কি তাঁহারা রাখেন? সম্মিলিত হইলে কি তাঁহাদের সুনাম বজায় থাকিবে?

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আলোচনার আদর্শ আজ যেন আমাদের স্বপ্নেরও অতীত হইয়া গিয়াছে। বহুদিন হইতে ভারতের সজ্জন ধার্ম্মিকগণ রাষ্ট্রতন্ত্রের আলোচনা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। কেবল যে মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে, পরবর্ত্তী হিন্দু রাজগণের শাসনকলেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী হিন্দু রাজগণের সভাতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণও আংশিকভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। মন্ত্রী হেমাদ্রি প্রণীত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। তাঁহাদের গ্রন্থ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত ধর্ম্মস্থীয় অধিকরণ অর্থাৎ ব্যবহার (দেওয়ানী ফৌজদারী) কণ্টকশোধন, সংক্ষিপ্ত রাজবৃত্ত প্রভৃতি কথঞ্চিৎ আলোচিত হইলেও সম্পূর্ণ দণ্ডনীতি শাস্ত্র আলোচিত হয় নাই এবং তাহার কোনও নিদর্শনও বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। দণ্ডনীতি শাস্ত্রের যে কিয়দংশ আলোচিত হইত, তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেই হইত। দণ্ডনীতির যে অংশটুকু ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত একান্ত সম্বদ্ধ, তাহারই আলোচনা পরবর্ত্তী হিন্দু নরপতিগণের শাসনকালে কোন কোন মনীষী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই আলোচনাও নবম-দশম শতকে যেরূপ বিস্তৃত ভাবে হইয়াছে চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতকে তাহা আরও সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়াছে। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনায় পরবর্ত্তী ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের রুচিবৈমুখ্যই ইহার একমাত্র কারণ। মহাভারত শান্তি পর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "মজ্জেত্ত্রয়ী দণ্ডনীতৌহহতায়াং সর্ব্বেধর্ম্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্ব্বিবৃদ্ধাঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্ম্মে পুরাণে"। ইহার অর্থ;- শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ! এই অনাদিসিদ্ধ

রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে—দণ্ডনীতির উচ্ছেদ ঘটিলে সমস্ত বেদ বিলুপ্ত হইবে সমস্ত বিবৃদ্ধ ধর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইবে এবং সমস্ত আশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদ ঘটিবে। শান্তি পর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, আমরা বেদ হইতে ইহাই অবগত হইয়া থাকি—সমস্ত ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম রাজধর্ম্ম দ্বারাই রক্ষিত হয়। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মের অন্তর্গত; যেমন সমস্ত জীবের পদচিহ্ন হস্তির পদচিহ্ন দ্বারা গ্রস্ত হয়। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে সূক্ষ্মভাবে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মপ্রধান; যেহেতু সমস্ত জীবই রাজধর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে; সমস্ত ত্যাগই রাজধর্ম্মে বিদ্যমান; আর ত্যাগই পুরাতন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সমস্ত বিদ্যাই রাজধর্ম্মের সহিত যুক্ত এবং সমস্ত লোক রাজধর্ম্মেই প্রবিষ্ট। রাজধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইয়া কোনও ধর্ম্মই অবস্থান করিতে পারে না। যদিও মহাভারতে ও রামায়ণে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বহু প্রশংসা বলা হইয়াছে, যে শাস্ত্রের উপযোগিতা সকলেই সর্ব্বদা অনুভব করে, তথাপি সেই শাস্ত্রে আমাদের বিমুখতা আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যেরই ফল। আজ ভারতবর্ষে বহুবিধ বিদ্যায় প্রবীণ ও যশস্বী বহু লোক থাকিলেও রাজনীতিশাস্ত্রে প্রবীণ একটি-দুইটি লোকও পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় জনতার অখণ্ড দুর্ভাগ্যের উদয়েই আজ আমাদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, যাহা মনু সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আংশিক আলোচনা থাকিলেও তাহা দণ্ডনীতি শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র নহে। নারদস্মৃতির প্রারম্ভে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলোচনাকে নারদস্মৃতির ভূমিকাস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ মনু সমস্ত ভূতের অনুগ্রহের জন্য আচারস্থিতির হেতু-ভূত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে ২৪টি প্রকরণ আছে;—(১) লোক-সৃষ্টি, (২) ভূতপ্রবিভাগ, (৩) সদ্দেশপ্রমাণ, (৪) পর্ষৎ লক্ষণ, (৫) বেদ নিরূপণ, (৬) বেদাঙ্গ নিরূপণ, (৭) যজ্ঞ বিধান, (৮) আচার, (৯) ব্যবহার, (১০) কণ্টক শোধন, (১১) রাজবৃত্ত, (১২) বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ, (১৩) বিবাহ ন্যায়, (১৪) স্ত্রীপুংসবিকল্প, (১৫) দায়ানুক্রম, (১৬) শ্রাদ্ধবিধান, (১৭) শৌচাচারবিকল্প, (১৮) ভক্ষ্যাভক্ষ্যলক্ষণ, (১৯) বিক্রেয়াবিক্রেয়মীমাংসা, (২০) পাতকভেদ, (২১) স্বর্গনরকানুদর্শন, (২২) প্রায়শ্চিত্ত, (২৩) উপনিষৎ, (২৪) রহস্যস্থান। প্রদর্শিত এই ২৪টি প্রকরণের মধ্যে নবম প্রকরণ ব্যবহার বলা হইয়াছে। মনুপ্রোক্ত নবম প্রকরণ ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়াই দেবর্ষি নারদ ব্যবহার মাতৃকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যবহার মাতৃকাই নারদস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকেই ব্যবহার বলা হয়। নারদ স্মৃতিতে ব্যবহার যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, অপর কোনও স্মৃতি গ্রন্থে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ের টীকা মিতাক্ষরা, নারদস্মৃতি অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নারদ স্মৃতির প্রারম্ভে যে ভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দেবর্ষি নারদ প্রণীত কিনা, এ বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয়। আমাদের মনে হয়—নারদ স্মৃতির ভাষ্যকার অসহায় এই ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে মনুসংহিতা দেখিতে পাই, তাহা ২৪টি প্রকরণে বিভক্ত না হইয়া ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। মনু সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে ১১১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যে অনুক্রমণিকা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ ২৪টী প্রকরণে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার অনেক ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। মনুসংহিতার অনুক্রমণিকাতেও মনুসংহিতাকে ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয় নাই। কেবল প্রকরণগুলিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। নারদ স্মৃতির ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে—মনুসংহিতার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ এবং এক হাজার আশি অধ্যায়। ভগবান্ মনু এই সুবৃহৎ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রদান করিয়া ছিলেন। নারদ আবার ইহাকে বার হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও এই গ্রন্থকে আবার আট হাজার শ্লোকে সঙ্কলিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহা সুমতি ভার্গবকে প্রদান করিয়াছিলেন। সুমতি ভার্গবও চারি হাজার শ্লোকে এই শাস্ত্রের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সুমতি ভার্গবসঙ্কলিত চারি হাজার শ্লোকযুক্ত মনু সংহিতাই মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। এই মনু সংহিতার আদ্য শ্লোক—

আসীদিদং তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রাদুরাসীচ্চতুর্মুখঃ॥

এই শ্লোকটীকেই মনু সংহিতার ১ম শ্লোক বলিয়া নারদ স্মৃতির ভূমিকাতে বলা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে মনুসংহিতা দেখিতে পাই তাহাতে এই শ্লোকটি ৫ম শ্লোক এবং এই শ্লোকটিরও ১ম পাদই একরূপ, অপর পাদগুলি অন্যরূপ। বর্ত্তমান মনুসংহিতাতে উপলব্ধ ৫ম শ্লোকটি এইরূপঃ—

আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তাচিব সর্ব্বতঃ॥

বর্ত্তমান মনুসংহিতার শ্লোকসংখ্যাও দুই হাজার ছয় শত চুরাশি। নারদস্মৃতির ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, সুমতি ভার্গব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মনুসংহিতায় শ্লোক সংখ্যা চার হাজার। সুমতি ভার্গব চার হাজার শ্লোকে যে মনু সংহিতার সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহারও বহু শ্লোক বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি, নারদ স্মৃতির উল্লেখ করিয়াও মনুসংহিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নারদ স্মৃতির ভূমিকার সহিত বিরুদ্ধ। মেধাতিথির ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মানবধর্ম্মশাস্ত্র একলক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং ইহা প্রজাপতি রচনা করিয়াছিলেন। প্রজাপতিনির্ম্মিত এই ধর্ম্মশাস্ত্র মনু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন (মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক)। মেধাতিথি নারদস্মৃতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু নারদস্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা মেধাতিথিপ্রদর্শিত নারদস্মৃতি হইতে ভিন্নরূপ। নবমশতকে বিদ্যমান মেধাতিথি, মনুসংহিতার ভাষ্যে মনুসংহিতার চারহাজার শ্লোকের উল্লেখ করেন নাই। ২৪টি প্রকরণের কথাও বলেন নাই, মনুসংহিতা ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত হইল কিরূপে তাহাও বলেন নাই—কেবলমাত্র মনুসংহিতার বিষয়ানুক্রমণীতে যে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছিল সেই সেই বিষয়গুলির কয়টি কোন অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে তাহাই কেবল বলিয়াছেন। মনুসংহিতার নবমপ্রকরণ "ব্যবহার" আর এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়াই নারদ 'ব্যবহার-মাতৃকা' লিখিয়াছেন ইহাই নারদস্মৃতির ভূমিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে উপলব্ধ মনুসংহিতার অনুক্রমণিকাতে "ব্যবহার" নবম প্রকরণ নহে।

যাহা হউক, মনুসংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিলে ইহাকে আচারস্থিতিহেতুভূত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা দণ্ডনীতি বা অর্থশাস্ত্র হইতে পারে না। মহাভারতে যে মানব-অর্থশাস্ত্রের কথা আছে, তাহা স্বায়ম্ভুব মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকাতেই আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্র বলিয়া থাকি। অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এক হইলে—"অর্থশাস্ত্রাত্ত বলবদ্ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহারাধ্যায় ২১ শ্লোক) ইহা বলা যাইত না।

এই শ্লোকের টীকা মিতাক্ষরাতে অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থ এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অসঙ্গত। টীকাকার "অর্থ" শব্দের অর্থই বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। টীকাকার যাহাকে অর্থ বুঝিয়াছেন সেই অর্থ বার্ত্তাশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৃষি পাশুপাল্য ও বাণিজ্য প্রভৃতিকে বার্ত্তা বলে। এই বার্ত্তার অনুষ্ঠানেই সুবর্ণ, রজত, ধান্য, পশু, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি অর্থ লব্ধ হইয়া থাকে।

ধনকেই অর্থ বলিলে অর্থশাস্ত্র বা ধনশাস্ত্র বার্ত্তাশাস্ত্র হইবে, কিন্তু দণ্ডনীতি হইবে না। ধনলাভের উপায় প্রদর্শক শাস্ত্রকে যাঁহারা অর্থশাস্ত্র মনে করেন তাঁহারা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের সহিত পরিচিত নহেন। ধনলাভের উপায়প্রদর্শক শাস্ত্রকে বিলাতী মতে অর্থশাস্ত্র বলিলেও ভারতীয় রীতি অনুসারে তাহা বার্ত্তাশাস্ত্র। ভূমির লাভ

পালনাদির অর্থাৎ অলব্ধ ভূমির লাভ, লব্ধের পরিপালন, পরিপালিতের বিবর্দ্ধন ও বিবর্দ্ধিত বস্তুর যোগ্যপাত্রে প্রতিপাদনই ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। পৃথিবীর লাভ, পালন প্রভৃতি উপায়ে উপদেশক শাস্ত্রকেই অর্থশাস্ত্র বলা হয়। আর এই অর্থশাস্ত্রের নামই দণ্ডনীতি। এজন্য মিতক্ষরা টীকাতে অর্থ লাভের উপায়ের উপদেশক শাস্ত্রকে যে অর্থশাস্ত্র মনে করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় নাই। আজকাল আমাদের দেশের অনেকেই কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, কল-কারখানা প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা ধনোপার্জ্জনকেই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন—কিন্তু তাহা বিলাতী মতে সঙ্গত হইলেও ভারতীয় মতে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর লাভের ও পালনের জন্য যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রণয়ন করিয়াছেন ইত্যাদি। এই অর্থশাস্ত্রকেই দণ্ডনীতিশাস্ত্র বলা হয়, আর ইহাই আমাদের দেশে রাজনীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে অর্থশাস্ত্র বলা হয় তাহা বার্ত্তাশাস্ত্র। দণ্ডনীতিশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র সমস্ত বিদ্যার রক্ষকশাস্ত্র। ইহা আমরা মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ত্রয়ী বিদ্যার প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এজন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত—এবং অর্থ ও অনর্থ বার্ত্তাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ধান্য, পশু, হিরণ্য প্রভৃতি এস্থলে অর্থ শব্দের অর্থ এবং নয় ও অপনয় দণ্ডনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়। উপযুক্ত স্থলে সন্ধি-বিগ্রহাদি নয়-শব্দ-প্রতিপাদ্য। এবং অন উপযুক্ত স্থলে সন্ধি বিগ্রহাদি অপনয়-শব্দ-প্রতিপাদ্য, যেমন প্রবলের সহিত সন্ধি নয় এবং প্রবলের সহিত বিগ্রহ অপনয়। সুতরাং বার্ত্তাশাস্ত্রের ও দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় ও অপনয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৫৭ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যে রাজার রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণ, নয় ও অপনয় বিশেষভাবে অবগত আছে সেই রাজাকেই শ্রেষ্ঠ রাজা বলা যায়। ভারতবর্ষের এমন সুদিন ছিল, যে সময়ে রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণ, নয় ও অপনয়ে বিশেষজ্ঞ ছিল, প্রজাগণকে নয়বিৎ ও অপনয়বিৎ করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। প্রজা অপনয়বিৎ হইলে তাহারা দুর্নীতির সমাধান অনায়াসে করিতে পারে এবং নয়বিৎ হইলে প্রজারাই রাষ্ট্রের অশেষ কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। মহাভারতের আদর্শ বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হইয়াছে। একদিন ভারতের সমস্ত প্রজা নয়াপনয়বিৎ ছিল—আর এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা নীতিশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহাই জানি না। আমরাই যে জানি না তাহা নহে, যাঁহাদিগকে আমরা বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া মনে করি তাঁহারাও জানেন না। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অপরিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটিলে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স কিছুই হইবে না এবং কোন শাস্ত্রের আলোচনাই থাকিবে না।

যদিও মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রে আংশিকরূপে অর্থশাস্ত্রোচ্য কথা আছে এবং সেই সমস্ত অর্থশাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রবল এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত এক দেশকে অর্থশাস্ত্র শব্দ দ্বারা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। বিদ্যোদ্দেশপ্রকরণে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি (অর্থশাস্ত্র) এই চারিটি বিদ্যাই বলা হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রয়ী-বিদ্যারই অন্তর্গত, কিন্তু তাহা দণ্ডনীতির অন্তর্গত নহে। এইরূপ দণ্ডনীতিশাস্ত্রও ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে, প্রদর্শিত চারিটি বিদ্যাই পৃথক্ প্রস্থান। প্রত্যেক শাস্ত্রেরই ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন। একটি বিদ্যা অপর বিদ্যার অন্তর্গত হইলে বিদ্যার চতুর্বিধত্বই থাকে না। এ স্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রে মনুনামে খ্যাত তাঁহারা সকলেই রাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা এজন্য বৈবস্বত মনু প্রভৃতিও রাজধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা বটেন—কিন্তু প্রণেতা নহেন। যাঁহারা মনু নামে খ্যাত তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রাচেতস মনুই রাজধর্ম্মের প্রণেতা এবং একমাত্র স্বায়ম্ভুব মনুই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা। সুতরাং অর্থশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ বলিলে পৃথক দুইটি শাস্ত্রের বিরোধই গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু স্বগত বিরোধ গ্রহণ করা উচিত নয়। আরও বিশেষ কথা এই যে, মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১ম শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে—রাজধর্ম্মপ্রতিপাদক এই ৭ম অধ্যায়ে যে সমস্ত রাজধর্ম্ম বলা হইয়াছে সেই সমস্ত ধর্ম্মই বেদমূলক নহে—কিন্তু প্রমাণান্তরমূলক ধর্ম্মও এই রাজধর্ম্মপ্রতিপাদক ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। প্রমাণান্তরমূলক রাজধর্ম্ম বলা হইলেও

যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অবিরুদ্ধ তাহাই মনু ৭ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন; সুতরাং মেধাতিথির মতে মনুপ্রোক্ত রাজধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধই অসম্ভব। এ স্থলে মেধাতিথি যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত কিনা তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের রুচিবিপর্য্যয়ের ফলে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমাদের নিকট থাকিলেও মানব অর্থশাস্ত্র আমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রগুলির বিলোপ ঘটিল কেন? ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ অর্থশাস্ত্রসমূহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতঃপর আমরা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিব। ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারে দার্শনিক সাহিত্যের প্রাচুর্য্য এখনও পরিলক্ষিত হয়—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বহু প্রকার শৈবদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন নানা প্রস্থানের বৌদ্ধ-দর্শন ও জৈনদর্শন প্রভৃতি বহু দর্শন গ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত গ্রন্থের আলোচনাও ভারতবর্ষে অল্প বিস্তর আছে। একেবারে উচ্ছেদ হয় নাই। যদিও পূর্ব্বমীমাংসার প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যাদি ও সাংখ্যদর্শনের প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন দার্শনিক আচার্য্যগণের নামও আমাদের বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে তথাপি খৃঃ সপ্তম অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিরচিত দার্শনিক গ্রন্থরাশি এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ ও তাহার আলোচনা বিলুপ্ত হইয়াছে এমন কি অর্থশাস্ত্রের আচার্য্যগণের নামও আমরা জানি না, জানিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করি না।

অতীত এক হাজার বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই আমাদের এই রুচিবৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের এই দুর্গতি হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে যাঁহারা নিষ্ণাতবুদ্ধি তাঁহাদের মধ্যে অনেক দিন হইতেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিক গণের অধিকাংশই অনাত্ম বস্তুর সত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য বদ্ধপরিকর। অনাত্মবস্তুর মিথ্যাত্বের নাম শুনিলেও তাঁহারা রোমাঞ্চিত হন। অনাত্মবস্তুর সত্যত্ব প্রতিপাদন মানবসমাজের অশেষ কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন এমন ভারতীয়–দার্শনিকগণের অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—খৃষ্টীয় নবম দশম শতক হইতে বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অনাত্ম-প্রপঞ্চের সত্যত্ববাদী দার্শনিকগণ তাঁহাদের বিশেষ আদরের সত্যপ্রপঞ্চকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যপ্রপঞ্চের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন যদি মানবজীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যদি মনুষ্যজীবন প্রভাবিত না হয়, দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন যদি ব্যক্তিবিশেষের বৃথা আয়ুঃক্ষয়েরই একমাত্র সাধন হয় তবে তাদৃশ অনুশীলনের কিছুই মূল্য নাই বুঝিতে হইবে।

প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সমর্থন করিয়াও খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতকের আচার্য্যগণ প্রপঞ্চের সুব্যবস্থার জন্য, সংসারের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য, প্রাণিগণের হিতের জন্য মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত ব্যবহারকাণ্ডের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া মানবসমাজকে অনুগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। অনাত্মবস্তুর সুব্যবস্থা দ্বারা আত্মার নৈর্ম্মল্য সাধনপূর্ব্বক অধ্যাত্মজগতে প্রকর্ষলাভ করিয়াছেন, অন্যেরও প্রকর্ষলাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য বিশ্বরূপাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বালক্রীড়া নামক টীকা রচনা করিয়া ভারতীয় ব্যবহারবিভাগ অর্থাৎ বিচারবিভাগ সমুজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায়েরই আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক খৃষ্টীয় একাদশ শতকে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকা লিখিয়া ব্যবহারকাণ্ডের

পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব স্বীকার না করিয়াও খৃষ্টীয় নবম শতকে মেধাতিথি মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করিয়া ব্যবহার বিদ্যারও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

লোকমর্য্যাদা স্থিত না থাকিলে যেমন রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সাধিত হয় না এইরূপ সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণও হইতে পারে না। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার অস্বস্থ থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিও যে সুদূরপরাহত হয় ইহা আমরা নোয়াখালী, কলিকাতা, পশ্চিমপাঞ্জাব ও কাশ্মীরের ঘটনাতে বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি ও শিখিয়াছি। যাঁহারা প্রপঞ্চের সত্যত্বরক্ষণে অতিমাত্র উৎসাহী তাঁহারা এই সত্যপ্রপঞ্চের রক্ষার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? ভারতের অনেক দার্শনিকপ্রস্থানেই অনাত্ম বস্তুর সত্যত্বরক্ষার প্রয়াস লক্ষিত হইলেও তাহার রক্ষণ ও বর্দ্ধনবিষয়ে কোনও প্রয়াসই লক্ষিত হয় না। এই সত্যপ্রপঞ্চের রক্ষাকল্পে দ্বৈতসত্যত্ববাদী দার্শনিকগণ স্বতন্ত্রভাবে বা পরতন্ত্রভাবে কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই যাহাদ্বারা রাষ্ট্র বা সমাজ সুরক্ষিত হইতে পারে। লোকরক্ষার জন্য মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনরূপ আলোকপাত করিতেও তাঁহারা বিরূপ হইয়াছেন। সত্যজগতের সুব্যবস্থার জন্য কোনরূপ চিন্তা করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।

দার্শনিকগণের সুমার্জ্জিত বুদ্ধি যদি লোকরক্ষার কার্য্যে নাই লাগিল, রাষ্ট্রীয়সংহতি নির্মাণে যদি তাহা অপেক্ষিতই না হইল তবে তাদৃশ বুদ্ধি রাষ্ট্রের নিকট উপেক্ষিতই হইবে ইহাতে দুঃখের কথা কি?

ভারতীয় মহর্ষিবৃন্দ ব্রহ্মবিদ্যায় অগ্রণী হইয়াও অধ্যাত্মজগতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াও রাষ্ট্রীয় কল্যাণে কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহা আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের দুই একটি ঘটনা হইতে দেখাইয়াছি ও আরও বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে অসুররাজ শম্বর ও প্রহ্লাদকে নীতিশাস্ত্রের বক্তা বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় শুক্রাচার্য্য হইতেই অসুরদিগের মধ্যে এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রসার লাভ করিয়াছিল। অসুরগণের আচার্য্য শুক্রাচার্য্য দণ্ডনীতিশাস্ত্রের একজন প্রধান প্রবক্তা। উদ্যোগপর্ব্বের ৭২ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে এবং শান্তিপর্ব্বের ১০২ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোকে শম্বরনীতি উদ্ধৃত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বে এই শম্বরনীতির আলোচনাও করা হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৮ অধ্যায়ে অসুররাজ প্রহ্লাদের নীতি বর্ণিত হইয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণকে রাজকার্য্যনির্ব্বাহক ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ঋষিরাই সম্রাট্ দশরথের রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একশততম অধ্যায়ে রামচন্দ্র ভরতের নিকট বিস্তৃতভাবে রাষ্ট্রনীতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি আলোচনা করিলে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যায়। রামায়ণের এই অধ্যায়ের অনুরূপ একটি অধ্যায় মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে। সভাপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকটে রাষ্ট্রনীতির বিশদ বর্ণনা করিয়াছে। নারদ যে রাষ্ট্রনীতির একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন তাহা আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতেও জানিতে পারি। আমরা ইহার পরে রামায়ণ ও মহাভারতের এই অধ্যায় দুইটির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামায়ণে দণ্ডনীতি

শ্রীরামচন্দ্রের অনুশাসন

রামচন্দ্র যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে অমাত্যগণপরিবৃত ভরত রামচন্দ্রের প্রসাদনের নিমিত্ত চিত্রকূটে আগমন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভরতের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে প্রশ্নচ্ছলে রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধে ভরতকে কতকগুলি উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন:-

ধনুর্ব্বেদবিশারদ ও অর্থশাস্ত্রবিশারদ উপাধ্যায় সুধন্বার প্রতি তুমি বহু মান প্রদর্শন করিয়া থাক ত? শূর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশসম্ভূত, ইঙ্গিতজ্ঞ ও তোমার আত্মসম পুরুষগণকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ ত? মন্ত্রই রাজগণের বিজয়ের মূল—নীতিশাস্ত্রবিদ্ মন্ত্রী ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাজগণের বিজয়ের মূল। তুমি যথাকালে জাগরিত হও ত? রাত্রিশেষে অর্থলাভের চিন্তা কর ত? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল, লোকমধ্যে প্রকাশিত হয় না ত? কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্প প্রয়াসসাধ্য ও বহু ফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্র আরম্ভ কর ত? তাহাতে বিলম্ব কর না ত? তোমার সুনিষ্পন্ন কার্য্য অথবা কৃতপ্রায় কার্য্য ভিন্ন সুমন্ত্রিত কর্ত্তব্য কার্য্য সামন্তনরপতিগণ জানিতে পারেন না ত? তোমাদ্বারা বা তোমার আমাত্যগণ দ্বারা যে সকল মন্ত্রণা প্রকাশিত হয় নাই—তাহা অন্য লোক যুক্তি বা তর্কমূলক অনুমান দ্বারা জানিতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ করিয়াও একজন বিদ্বান্কে সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে—বিদ্বান্ ব্যক্তিই সঙ্কট নিস্তাররূপ মহৎ কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। রামচন্দ্রের এই উপদেশ গণভোটের যুগে স্বীকৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। মূর্খের ভোটই রাষ্ট্রপরিচালক—ইহাই বর্ত্তমান নীতি। তোমার প্রধান ভৃত্যগণ প্রধান কার্য্যে, মধ্যম ভৃত্যগণ মধ্যম কার্য্যে ও সামান্য ভৃত্যগণ সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত আছে ত? অযোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে ও যোগ্য লোকদের অযোগ্যস্থানে নিয়োজিত কর না ত? আমরা মনে করি বর্ত্তমান সময়ে ভগবান্ রামচন্দ্রের এই উপদেশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তোমার যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পিতৃ-পিতামহাদি পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন ও যাঁহাদের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় বিশুদ্ধ—সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছ ত? তীক্ষ্ণ দণ্ড দ্বারা প্রজাগণকে উৎপীড়িত কর না ত? উত্তেজিত প্রজা ও মন্ত্রিগণ তোমার অবজ্ঞা করে না ত? বিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিতে সক্ষম, প্রগল্‌ভ, বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্ সৎকূলসম্ভূত, শুদ্ধাচারী অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ ত? যুদ্ধবিৎ বল ও বিক্রমশালী যোদ্ধৃগণের যুদ্ধকার্য্যে নৈপুণ্য দর্শন করিয়া তুমি তাহাদিগকে সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়া থাক ত? সৈন্যগণের যথোচিত বেতন যাহা দৈনিক ও মাসিক—তাহা তুমি যথা সময়ে দিয়া থাকত? বিলম্ব কর না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগেই রাজ্যে মহা অনর্থের সূত্রপাত হয়। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত আছেন ত? বিদ্বান্, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথার্থবাদী, বিচক্ষণ এবং তোমার জনপদবাসী ব্যক্তিকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ ত?

ভারতীয় দণ্ডনীতিতে রাষ্ট্রের ১৮টি তীর্থ বলা হইয়াছে। (১) মন্ত্রী (২) পুরোহিত, (৩) যুবরাজ, (৪) সেনাপতি, (৫) দৌবারিক, (৬) অন্তঃপুরাধিকৃত, (৭) কারাগারাধ্যক্ষ, (৮) ধনাধ্যক্ষ, (৯) কার্য্যনিয়োজক (রাজাজ্ঞানুসারে বিষয়ের বক্তা), (১০) প্রাড়্ বিবাক (প্রাধান বিচারক), (১১) সেনাগণের বেতনদানাধ্যক্ষ, (১২) নগরাধ্যক্ষ, (১৩) কর্ম্মান্তিক (কর্ম্মাবসানে বেতনগ্রাহী), (১৪) রাজ্যসীমাপালক, (১৫) দুর্গপাল, (১৬) রাষ্ট্রপাল, (১৭) দণ্ডপাল, (১৮) ধর্ম্মাধ্যক্ষ। এই আঠারটি পদকে আঠারটি তীর্থ বলা হয়। রাম ভরতকে বলিয়াছিলেন যে পরকীয় রাজ্যে এই ১৮টি তীর্থ ও স্বকীয় রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ব্যতীত ১৫টি তীর্থের যথাযথ সংবাদ লইয়া থাক ত? নিযুক্ত চারবর্গ পরস্পরের অবিদিত ভাবে এবং অন্যের অবিদিত ভাবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রগত তীর্থসমূহের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করিবে। এক একটি তীর্থে ক্রমিক তিন জন চার সমান তথ্য সংগ্রহ করিলে রাজা তাহার যথোপযুক্ত বিধান করিবেন। চারগণ পরস্পর বিসম্বাদী হইলে রাজা তাহার কারণ অবধারণপূর্ব্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন পররাষ্ট্রের ১৮টি তীর্থ ও স্বরাষ্ট্রের ১৫টি তীর্থের যথাযথ সংবাদ চারগণ দ্বারা বিদিত থাক তো? রামচন্দ্র ভরতকে এই যে অমূল্য উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা জাগ্রত রাজগণের প্রাণস্বরূপ কিন্তু নিদ্রিত বা মৃত রাজার পক্ষে ইহার আবশ্যকতা নাই। শাস্ত্রে যাহাকে চার বলা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ে একরূপ নাই বলিলেই চলে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে চার স্থানাপন্ন ডিটেকটিভ আছে বটে—ইহারা ঘরোয়া ব্যাপারে তিলকে তাল করিয়া তুলিতে পারে বটে কিন্তু পররাষ্ট্রের প্রবেশের কৌশল ইহাদের স্বপ্নেরও অতীত। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে রাজা চার-চক্ষু—এই চক্ষু যাহার নাই সে অন্ধ। এই ১৮টি তীর্থে নিয়ত বিচরণশীল চার-বর্গের যে বিপুল শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ছিল আজ তাহার নাম গন্ধও নাই। আমরা মনে করি কোন কাজ করিতে কোন শিক্ষারই প্রয়োজন নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে। হে ভরত! তুমি চার্ব্বাক মতাবলম্বী শুষ্কতর্কে নিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা করনা ত? তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছ ত? আমাদের সমৃদ্ধ রাজ্য যাহাতে বহু যজ্ঞভূমি আছে এবং যাহা সুসমৃদ্ধ বহু জন পরিপূর্ণ ও যাহা বহু দেবালয় সমন্বিত, যাহা বহু তড়াগ দ্বারা সুশোভিত, যে রাজ্যের নরনারী অতি আনন্দিত—যে রাজ্যে প্রজাগণের মধ্যে নানাবিধ উৎসব ও সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যে রাজ্য বহু পশু সমন্বিত যে রাজ্যে কৃষিকর্ম্ম অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যে রাজ্য হিংসা বিবর্জ্জিত, যে রাজ্যে বৃষ্টিজলের অপেক্ষা না করিয়া নদী তড়াগ প্রভৃতি জলের দ্বারা শস্য উৎপন্ন হয়, যে রাষ্ট্র অতি রমণীয়, শ্বাপদ বিবর্জ্জিত, সর্ব্ববিধ ভয় বিবর্জ্জিত, খনি ও আকর (খনন লভ্য স্বর্ণাদি এবং লবণাদির আকর) দ্বারা শোভিত ও পাপীষ্ঠজন বিবর্জ্জিত ও যাহা পূর্ব্ব রাজগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সেই রম্য জনপদ সুখে আছে ত?

কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী জনগণের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট আছ ত? কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য দ্বারা লোক সমৃদ্ধ হইতেছে ত? এই সকল জনগণের রক্ষা ও ইষ্টসম্পাদন দ্বারা ইহাদের ভরণ করিয়া থাক ত? রাষ্ট্রবাসী মনুষ্যমাত্রই ধর্ম্মতঃ রাজার প্রতিপাল্য। তোমার হস্তিধন সুরক্ষিত আছে ত? হস্তী সংগ্রহের উপযোগী হস্তিনী সমূহকে রক্ষা করিয়া থাক ত? হস্তী সংগ্রহকারি-হস্তিনী, অশ্ব ও হস্তী ইহাদের সংগ্রহে তৃপ্ত হওনা ত? তুমি প্রত্যহ রাজবেশে ভূষিত হইয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? কর্ম্মচারিগণ নির্ভীক ভাবে তোমায় নয়ন গোচর হয় না ত? অথবা তাহারা তোমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে না ত? কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীতাই কল্যাণের কারণ। রাজ্যের দুর্গ সমূহ ধনধান্য, অস্ত্র-শস্ত্র যন্ত্র শিল্পী ও যোদ্ধৃগণের দ্বারা পরিপূর্ণ আছে ত? তোমার আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? অপাত্রে

ব্যয়িত হওয়ায় ধনাগার অর্থশূন্য হইতেছে না ত? যোদ্ধৃগণের ও মিত্রগণের জন্য তোমার ধন ব্যয়িত হইয়া থাকে ত? নিরাপরাধ সজ্জন ব্যক্তি তোমার কর্ম্মচারিগণের ধনলোভে দণ্ডিত হয় না ত? অপরাধী ব্যক্তিগণকে ধনলোভে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না ত? ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার অমাত্যগণ ধনলোভে ধনী ব্যক্তির জয় ও নির্ধনের পরাজয় ঘোষণা করেনা ত?

অমাত্যগণ অর্থলোভশূন্য হইয়া ইহাদের বিবাদ দর্শন করিয়া থাকেন ত? মিথ্যা অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির অশ্রু রাজার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। তুমি চতুর্দ্দশটি রাজদোষ বর্জ্জন করিয়া থাকত? (১) নাস্তিক্য, (২) মিথ্যাব্যবহার, (৩) ক্রোধ, (৪) প্রমাদ, (৫) দীর্ঘসূত্রতা, (৬) বিজ্ঞজনের অদর্শন, (৭) আলস্য, (৮) ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, (৯) একাকী মন্ত্রণা, (১০) অর্থশাস্ত্রানাভিজ্ঞজনের সহিত মন্ত্রণা, (১১) নিশ্চিতকার্য্যের অনারম্ভ, (১২) মন্ত্রগুপ্তি না রাখা, (১৩) মাঙ্গলিক কর্ম্মের অননুষ্ঠান, (১৪) বহু শত্রুর সহিত যুগপৎ বিরোধ—রাম ভরতকে এই চতুর্দ্দশটি রাজদোষ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন। রাম আরও বলিয়াছিলেন যে হে ভরত! তুমি (১) মৃগয়া, (২) অক্ষক্রীড়া, (৩) দিবানিদ্রা, (৪) পরনিন্দা, (৫) অত্যধিক স্ত্রীসেবা, (৬) মদ্যপান, (৭) নৃত্য, (৮) গীত, (৯) বাদ্য, (১০) বৃথা ভ্রমণ এই দশটি কামজ ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া থাক ত? মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে এই দশটি কামজ ব্যসনের কথা বলা হইয়াছে।

রাম ভরতকে বলিয়াছিলেন তুমি জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বনদুর্গ, ঐরীণদুর্গ, ধান্বনদুর্গ, এই পঞ্চবিধ দুর্গ সুরক্ষিত রাখত? মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ৭০ শ্লোকে ছয় প্রকার দুর্গের কথা বলা হইয়াছে। (১) ধন্বদুর্গ অর্থাৎ যে দুর্গের চতুর্দ্দিকে মরুভূমি অবস্থিত তাহাকে ধান্বনদুর্গ বলে। (২) মহীদুর্গ—পাষাণ বা ইষ্টকাদি দ্বারা রচিত কবাট ও গবাক্ষাদি যুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গকে মহীদুর্গ বলে। (৩) চতুর্দ্দিকে অগাধ জলরাশি দ্বারা বেষ্টিত দুর্গকে জলদুর্গ বলে। (৪) দুর্ল্লঙ্ঘ্য ভীষণ অরণ্য পরিবেষ্টিত দুর্গকে বন দুর্গ বা বার্ক্ষ দুর্গ বলে। (৫) চতুরঙ্গিনী সেনা দ্বারা রক্ষিত দুর্গকে নৃদুর্গ বলে। (৬) পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গমস্থানে অবস্থিত দুর্গকে গিরিদুর্গ বলে। কামন্দকনীতিশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকে পাঁচটি দুর্গের কথাই বলা হইয়াছে। কামন্দক গিরিদুর্গ দ্বিবিধ বলিয়াছেন। (১) প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ এবং (২) পর্ব্বত গুহাস্থিত দুর্গ। এই দ্বিবিধ দুর্গই গিরিদুর্গ নামে অভিহিত হয়। নির্জ্জনদেশে অবস্থিত দুর্গকে ঐরীণ দুর্গ বলে। জল ও তৃণরহিত দেশকে ধন্বন্ বলে তাদৃশ দেশে অবস্থিত দুর্গকে ধান্বনদুর্গ বলে।

তাহার পর রাম ভরতকে বলিয়াছেন, হে ভরত! তুমি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বর্গের যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়া থাক ত? (১) রাজা, (২) অমাত্য, (৩) রাজ্য, (৪) দুর্গ, (৫) কোষ, (৬) বল, (৭) সুহৃৎ এই সাতটিকে লইয়া রাষ্ট্র সপ্তাঙ্গ হইয়া থাকে। এই সাতটি অঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপকারী। তুমি এই সাতটি অঙ্গ সুস্থ রাখিতে চেষ্টা কর ত? (১) পৈশুন্য, (২) সাহস, (৩) দ্রোহ, (৪) ঈর্ষা (৫) অসূয়া, (৬) সাধুনিন্দা, (৭) বাক্‌পারুষ্য, (৮) নিষ্ঠুরতা এই আটটিকে ক্রোধজ ব্যসনবর্গ বলে। তুমি এই আটটি ক্রোধজ ব্যসনকে পরিত্যাগ করিয়া থাক ত? মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে এই ক্রোধজ আটটি ব্যসনের কথা বলা হইয়াছে। উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তি এই ত্রিবর্গ যথাযথরূপে জানিয়া তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক ত? ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই ত্রিবিধ বিদ্যা তুমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ ত? তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে সচেষ্ট থাক ত? ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়জয় রাজার অতিশয় অপেক্ষিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের তৃতীয় প্রকরণে এবং মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে রাজার ইন্দ্রিয়জয়ের কথা বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং অজিতেন্দ্রিয় রাজা কি ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহাও মনুসংহিতা ও কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র ভরতকে আরও বলিয়াছিলেন যে (১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ, (৩) যান, (৪) আসন, (৫) দ্বৈধীভাব ও (৬) আশ্রয়—এই ষাড়্‌গুণ্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া যথাস্থানে প্রয়োগ কর ত? (১) অগ্নি, (২) জল, (৩) ব্যাধি, (৪) দুর্ভিক্ষ ও (৫) মরক এই পঞ্চবিধ দৈববিপদের প্রতিকারের জন্য তুমি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাক ত? যাঁহারা মনে করেন পূর্ব্বসময়ে রাষ্ট্রের ব্যাধি প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য রাজার কোনওরূপ ব্যবস্থা ছিল না এবং দুর্ভিক্ষ মরকাদির প্রতিকারেও রাজা উদাসীন থাকিতেন, আমরা রামচন্দ্রের এই উপদেশের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার কথাও রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন। হে ভরত! তুমি পাঁচপ্রকার দৈববিপদের প্রতিকার করিয়া রাষ্ট্রবাসি গণের রক্ষায় সচেষ্ট থাক ত? (১) রাজকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষগণ হইতে, (২) তস্করগণ হইতে, (৩) শত্রু হইতে, (৪) রাজবল্লভ পুরুষ হইতে, (৫) পৃথিবীপাল হইতে, রাষ্ট্রবাসিগণের যে ভয় উৎপন্ন হয় তহাকে মানুষবিপদ বলে। হে ভরত তুমি এই পঞ্চবিধ মানুষবিপদের নিবারণের জন্য সচেষ্ট থাক ত? (১) ক্রুদ্ধ, (২) ভীত, (৩) অপমানিত, (৪) লুব্ধ, এই চারপ্রকার পুরুষ রাজ্য মধ্যে অবস্থান করে। তাহাদিগকে প্রশমন করা রাজার প্রধান কার্য্য। এজন্য এই চারিটিকে কৃত্যবর্গ বলে। এই কৃত্যবর্গ স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে অবস্থিত আছে। স্বরাষ্ট্রস্থিত কৃত্যবর্গের প্রশমন ও পররাষ্ট্রস্থিত কৃত্যবর্গের প্রোৎসাহন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা তুমি করিয়া থাক ত? (১) বালক, (২) বৃদ্ধ, (৩) দীর্ঘরোগী, (৪) জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, (৫) ভীরু, (৬) ভীরুজনক—ভীরুজন পরিবেষ্টিত, (৭) লুব্ধ, (৮) লুব্ধজনক—লুব্ধজন পরিবেষ্টিত, (৯) বিরক্ত প্রকৃতি, (১০) বিষয়ে অতিশয় আসক্ত, (১১) অনেকচিত্ত, (১২) দেবব্রাহ্মণ নিন্দুক, (১৩) দৈবোপহত, (১৪) দৈবচিন্তক, (১৫) দুর্ভিক্ষাদি বিপদাপন্ন, (১৬) সৈন্যক্ষয়রূপ বিপদগ্রস্ত, (১৭) দূরদেশস্থ, (১৮) বহুশত্রুপরিবেষ্টিত, (১৯) যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত, (২০) সত্যভ্রষ্ট—এই কুড়িটি পুরুষকে বিংশতিবর্গ বলে। ইহাদের সহিত কদাচ সন্ধি কর্ত্তব্য নহে। ইহাদের সহিত বিগ্রহই কর্ত্তব্য। ইহাদের সহিত সন্ধি না করিয়া তুমি ইহাদের সহিত বিগ্রহ করিয়া থাক ত? (১) অমাত্য, (২) রাষ্ট্র, (৩) দুর্গ, (৪) কোষ, (৫) দণ্ড, এই পাঁচটি রাজ্যের প্রকৃতি তুমি অবগত আছ ত?

অযোধ্যাকাণ্ডের এই অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে "ইন্দ্রিয়ানাং জয়ং বুদ্ধা ষাড়্‌গুণ্যং দৈবমানুষম্। কৃত্যং বিংশতিবর্গং চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্" বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছেন তুমি প্রকৃতিমণ্ডল অবগত হইয়া যথাকালে সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্‌গুণ্যের প্রয়োগ করিয়া থাক ত? এস্থলে প্রকৃতি মণ্ডল বলায় দ্বাদশরাজমণ্ডল এবং প্রত্যেক রাজার অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই পাঁচটি প্রকৃতি বুঝা যায়। দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া প্রকৃতি হইলে দ্বাদশরাজমণ্ডলের ৬০টি প্রকৃতি হইবে। এই ৬০টি প্রকৃতির সহিত দ্বাদশরাজমণ্ডল যুক্ত করিলে ৭২ সংখ্যা হইবে। এই ৬০টি প্রকৃতির সহিত দ্বাদশরাজমণ্ডলকেই রামায়ণে প্রকৃতিমণ্ডল বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ৬০টি প্রকৃতির সহিত বারটি রাজাকে প্রকৃতিমণ্ডল পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামায়ণের এই উক্তি মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৫৬-৫৭ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। মনুসংহিতার ১৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে রাজমণ্ডল দ্বাদশটি এবং অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই পাঁচটি প্রত্যেক রাজার প্রকৃতি বা দ্রব্যপ্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। আর তাহাতে বলা হইয়াছে "অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থ দণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চচাপরাঃ। প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ॥" মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে—(১) বিজিগীষু রাজা, (২) শত্রু, (৩) মধ্যম ও (৪) উদাসীন এই চারিটি রাজা দ্বাদশরাজমণ্ডলের মূল প্রকৃতি। দ্বাদশরাজমণ্ডলের অবশিষ্ট আটটি রাজাকে শাখাপ্রকৃতি বলা হয়। মূলপ্রকৃতিভূত রাজা চারিজন ও শাখাপ্রকৃতিভূত রাজা আটজন মিলিতভাবে দ্বাদশজনকে দ্বাদশরাজমণ্ডল বলা হইয়াছে। শাখাপ্রকৃতিরূপ আটজন রাজার পরিচয় এইরূপ বুঝিতে হইবে যে বিজিগীষু ও শত্রু এই দুইটি রাজাকে অপেক্ষা করিয়াই দ্বাদশরাজমণ্ডল গণনা করা হইয়াছে। বিজিগীষু ও শত্রু রাজাকে অপেক্ষা করিয়াই মধ্যম ও উদাসীন এই দুইটি রাজার নিরূপণ করা হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে বিজিগীষু রাজার যে শত্রু সেই শত্রু রাজারও বিজিগীষু রাজা শত্রুই বটে। এজন্য একটি বিজিগীষু রাজাকে অপেক্ষা করিয়া দ্বাদশরাজমণ্ডলের পরিকল্পনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিজিগীষু রাজার যে শত্রু সেই শত্রু

রাজার রাজ্যের অব্যবহিত অনন্তর (=পরবর্ত্তী) রাজ্যের রাজাকে বিজিগীষুর মিত্র বলা হয়। এই বিজিগীষু রাজার মিত্র রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য বিজিগীষুর শত্রুর মিত্র। এজন্য বিজিগীষুর শত্রু। এই অরিমিত্র রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য বিজিগীষুর মিত্রের মিত্র। আর এজন্য উহা বিজিগীষু রাজার মিত্রই বটে। এই মিত্রমিত্ররাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য বিজিগীষু রাজার শত্রু মিত্রের মিত্র। সুতরাং (১) মিত্র, (২) অরিমিত্র, (৩) মিত্রমিত্র, (৪) অরিমিত্রমিত্র এই চারটি রাজ্য বিজিগীষু রাজার শত্রুভূমির অগ্রবর্ত্তী ভাগে আছে। এইরূপ বিজিগীষু রাজার অব্যবহিত পশ্চাৎভাগে যে রাজ্য অবস্থিত আছে তাহা বিজিগীষুর শত্রুরাজ্য। এই শত্রুরাজ্যের রাজাকে বিজিগীষু রাজার পার্ষ্ণিগ্রাহ বলা হয়। পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে আক্রন্দ বলে। এই আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহের শত্রু ও বিজিগীষুর মিত্র। এই আক্রন্দ রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে পার্ষ্ণিগ্রাহাসার বলে। এই পার্ষ্ণিগ্রাহাসার পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং আক্রন্দের শত্রু। এই পার্ষ্ণিগ্রাহাসার রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে আক্রন্দাসার বলে। এই আক্রন্দাসার আক্রন্দের মিত্র এবং পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের শত্রু। এইরূপে বিজিগীষু রাজার পশ্চাদ্বর্ত্তী (১) পার্ষ্ণিগ্রাহ, (২) আক্রন্দ, (৩) পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, (৪) আক্রন্দাসার। পূর্ব্বোক্ত চারিটি ও এই চারিটি, মিলিতভাবে আটটি রাজাকে মূলপ্রকৃতির শাখাপ্রকৃতি বলে। এই আটটি রাজা ভিন্ন শত্রু ও বিজিগীষু দুইটি ও মধ্যম এবং উদাসীন দুইটি এই চারিটিকে রাজমণ্ডলের মূলপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। এইরূপে দ্বাদশরাজমণ্ডল হইয়া থাকে।

সমস্ত দণ্ডনীতিশাস্ত্রে দ্বাদশরাজমণ্ডলের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাতে বিজ্ঞানেশ্বর ত্রয়োদশরাজমণ্ডল বলিয়াছেন। কামন্দকনীতিসারে এই রাজমণ্ডলের সংখ্যা সম্বন্ধে বহু মতভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আমরা এস্থলে রাজমণ্ডল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও মিতাক্ষরার আশয় প্রদর্শন করিব। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ের রাজধর্ম্ম প্রকরণের ৩৪৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে বিজিগীষু রাজার রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্যের রাজাই বিজিগীষুর শত্রু এবং শত্রুরাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্যের রাজাই বিজিগীষু রাজার মিত্র এবং বিজিগীষু রাজার মিত্ররাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্যের রাজাই বিজিগীষু রাজার উদাসীন। এইরূপে বিজিগীষু রাজার রাজ্যের প্রত্যেকদিকে বিজিগীষুর শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনটি রাজ্য ও রাজা অবস্থিত। প্রত্যেকদিকে তিনটি করিয়া চারিদিকে সর্ব্বশুদ্ধ বারটি নরপতি বিজিগীষু রাজার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত এবং মধ্যদেশে বিজিগীষু রাজা অবস্থিত। বিজিগীষু রাজা এই দ্বাদশরাজমণ্ডলে সামদানাদির উপায়ের অনুষ্ঠান করিবেন। বিজিগীষু রাজার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দ্বাদশরাজমণ্ডল ও বিজিগীষু মিলিত ভাবে তেরটি রাজা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। সুতরাং বিজিগীষুর সহিত ত্রয়োদশ রাজমণ্ডল বলা হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ে রাজধর্ম্ম প্রকরণের ৩৪৫ শ্লোকের ব্যখ্যা প্রদর্শন প্রসঙ্গে মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে শত্রু মিত্র ও শত্রুমিত্র বিলক্ষণ উদাসীন—এই তিনটি রাজা বলা হইয়াছে। যে রাজা শত্রুও নহে মিত্রও নহে—তাহাকে উদাসীন বলা হয়। বিজিগীষু রাজার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনটি নরপতির প্রত্যেকটিই তিন প্রকার :—(১) সহজ, (২) কৃত্রিম ও (৩) প্রাকৃত। যেমন সহজ শত্রু, কৃত্রিম শত্রু, প্রাকৃত শত্রু। এইরূপ সহজ মিত্র, কৃত্রিম মিত্র ও প্রাকৃত মিত্র এবং সহজ উদাসীন, কৃত্রিম উদাসীন ও প্রাকৃত উদাসীন।

(১) সহজ শত্রু—পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদি সহজ শত্রু।

(২) কৃত্রিম শত্রু—যাহার পূর্ব্বে অপকার করা হইয়াছে বা যে বিজিগীষু রাজার পূর্ব্বে অপকার করিয়াছে তাহাকে কৃত্রিম শত্রু বলা হয়।

(৩) প্রাকৃত শত্রু—অব্যবহিত দেশের অধিপতিকে প্রাকৃত শত্রু বলে।

(৪) সহজ মিত্র—ভাগিনেয়, পিতৃষ্বসার পুত্র, মাতৃষ্বসার পুত্র প্রভৃতি।

(৫) কৃত্রিম মিত্র—পূর্ব্বে যাহার উপকার করা হইয়াছে বা পূর্ব্বে যে উপকার করিয়াছে।

(৬) প্রাকৃত মিত্র—একান্তরিক দেশের অধিপতি প্রাকৃত মিত্র।

(৭) সহজ উদাসীন—সহজ শত্রু মিত্র বিলক্ষণ হইতেছে সহজ উদাসীন।

(৮) কৃত্রিম উদাসীন—কৃত্রিম শত্রু-মিত্র বিলক্ষণ যে সে হইতেছে কৃত্রিম উদাসীন। বিজিগীষু রাজা পূর্ব্বে যাহার উপকার করেন নাই বা বিজিগীষু রাজার যে পূর্ব্বে উপকার করে নাই তাহাকে কৃত্রিম উদাসীন বলা হয়।

(৯) প্রাকৃত উদাসীন—দ্ব্যন্তরিত দেশের অধিপতিকে প্রাকৃত উদাসীন বলা হইয়া থাকে।

শত্রু ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। আবার শত্রুকে চতুর্ব্বিধ বলা হইতেছে। ত্রিবিধ শত্রুর প্রত্যেকটি চারি প্রকার হইয়া থাকে। (১) যাতব্য, (২) উচ্ছেত্তব্য বা উচ্ছেদনীয়, (৩) পীড়নীয়, (৪) কর্শনীয়।

(১) যাতব্য—অনন্তর ভূমির অধিপতিকে শত্রু বলা হইয়াছে। এই শত্রু যদি ব্যসনী হয় অর্থাৎ কামজ বা ক্রোধজ ব্যসনযুক্ত হয়, হীনবল হয়, বিরক্ত প্রকৃতি হয়, (অর্থাৎ অমাত্যাদি প্রকৃতি যাহার প্রতি বিরক্ত) তবে তাদৃশ শত্রু যাতব্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাকে নানা উপায়ে উৎপীড়নপূর্ব্বক বিজিগীষু নরপতি নিজের অধীনস্থ নরপতিরূপে রাখিতে চেষ্টা করেন তাহাকে যাতব্য বলা হয়। (২) উচ্ছেত্তব্য—যে রাজার দুর্গাদি নাই, মিত্রহীন ও দুর্ব্বল তাদৃশ শত্রু নরপতিকে উচ্ছেত্তব্য বলা হয়। অর্থাৎ তাদৃশ নরপতির রাজ্য, ধনাদি সমস্তই বিজিগীষু আত্মসাৎ করিবেন। (৩) পীড়নীয়—যে নরপতির মন্ত্রবল নাই এবং সৈন্যবল অল্প তাদৃশ নরপতি পীড়নীয় হইবে। (৪) কর্শনীয়–প্রভূত মন্ত্রশক্তি ও দণ্ডশক্তি আছে তাদৃশ নরপতি কর্শনীয় হইবে। যে নরপতিকে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল করা হয় তাদৃশ নরপতিকে উচ্ছেদনীয় বলে। শত্রুনির্ম্মূল করাকেই উচ্ছেদ বলে। শত্রুকে উচ্ছেদ না করিয়া তাহার মন্ত্রশক্তি ও দণ্ডশক্তি বিনাশ করাকে পীড়ন বলা হয়। আংশিকভাবে কোষ ও বলের হানি করার নাম কর্ষণ।

মিত্রও দুই প্রকার বৃংহণীয় ও কর্শনীয়। কোষবল হীন মিত্রের কোষবল বৃদ্ধি করাইয়া বৃংহণ করাইবে অর্থাৎ বৃদ্ধি করাইবে। এতাদৃশ মিত্রকে বৃংহণীয় মিত্র বলে। আর যে মিত্র অত্যধিক কোষ ও বল সম্পন্ন তাহার কোষ বলাদির হানি করাইবে। এতাদৃশ মিত্রকে কর্শণীয় মিত্র বলে।

মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন যে অন্য দণ্ডনীতিশাস্ত্রে যে পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার প্রভৃতি বিভাগ প্রদর্শন করা হইয়াছে সে সমস্ত বিভাগই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিনটিরই অন্তর্গত হইয়া থাকে। এজন্য যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ সমস্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করার আবশ্যক মনে করেন নাই।

রামায়ণে যে প্রকৃতিমণ্ডলের কথা বলা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রদর্শন করিলাম। মহাভারতের নারদানুশাসন প্রদর্শন প্রসঙ্গে আরও বিস্তৃতভাবে এই প্রকৃতিমণ্ডলের পরিচয় প্রদান করিব। এই প্রকৃতিমণ্ডল চিন্তাই পররাষ্ট্রনীতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ইহার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের এমন একদিন ছিল যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাতেও রাজনীতির আলোচনা করিতে হইত। রাজনীতি আলোচনা বর্জ্জন করিয়া ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতিও রচিত হইতে পারিত না কিন্তু আজ আমরা রাজনীতির আলোচনাকে অসৎ কার্য্যের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকি।

যাহা হউক রামচন্দ্র ভরতকে এই রাজপ্রকৃতিমণ্ডলে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব প্রভৃতির যথাযথভাবে চিন্তা করিবার কথা বলিয়াছিলেন। অতি সংক্ষেপে পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রদর্শিত ষাড়্গুণ্যের মধ্যে কোন্ স্থলে কোন্‌টির প্রয়োগ ও কোন্ স্থলে কোন্ গুণের বর্জ্জন করিতে হইবে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে রাম ভরতকে বলিয়াছিলেন। রাম আরও বলিয়াছিলেন যে, হে ভরত! তুমি মন্ত্রিলক্ষণযুক্ত তিন বা চারজন মন্ত্রীর সহিত মিলিতভাবে অথবা এক একজন মন্ত্রীর সহিত পৃথক্‌ভাবে নীতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রণাপদ্ধতি অতিক্রম না করিয়া থাক ত? শিষ্টগণের পরিপালনকারিণী ও দুর্জ্জনগণের সন্তাপকারিণী বৃত্তির অবলম্বন করিয়া থাক ত? শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু একাকী ভোগ কর না ত? মিত্রগণকে তোমার ভোগ্যবস্তুর অংশ প্রদান করিয়া থাক ত? হে ভরত! মহীপতিগণ দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসারে প্রজাপালন করিয়া সমগ্র বসুন্ধরার আধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন এবং যথাযথভাবে রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় মহীপতিগণ পরলোকেও শ্রেষ্ঠ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। আদিকাব্য রামায়ণে রামচন্দ্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রবক্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রামচন্দ্রকে অধ্যাত্মশাস্ত্রের—উপনিষদের প্রবক্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অধ্যাত্মরামায়ণের রামগীতার প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সময়ে ভারতীয় জনগণের দণ্ডনীতিশাস্ত্রে অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হইতেছিল সেই সময় রচিত কোনও গ্রন্থেই রামচন্দ্র দণ্ডনীতি শাস্ত্রের বক্তা হইতে পারেন না। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবসাদই ইহার কারণ। এই অবসাদ কবে নিবারিত হইবে তাহা ভগবান্‌ই জানেন।

যাহা হউক আমরা আদিকাব্য রামায়ণ হইতে রাজধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রদর্শন করিলাম। রামায়ণের বহুস্থানেই রাজধর্ম্মের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় যেমন—রাবণশূর্পণখা সংবাদে, বিভীষণের রামাভিগমন সময়ে কুম্ভকর্ণরাবণ সংবাদে, রাজধর্ম্মের বহুকথা আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের আদিকাব্য রাজধর্ম্মের আলোচনায় উদাসীন হইতেই পারে না। ভারতের অধঃপতনের সময় হইতে ভারতীয়কাব্যে রাজধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। ভারতের পরাধীনতা যত দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে ততই রাজধর্ম্মের আলোচনা পাতকবিশেষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ধারণা, কাব্য রাজধর্ম্ম আলোচনার স্থানই হইতে পারে না, কেবল নায়কনায়িকার প্রেমবর্ণনাতেই কাব্য পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পূর্ণভাবে হস্তচ্যুত হইলে সেই রাষ্ট্রীয়জনতার এতাদৃশ দুর্গতি ভিন্ন অন্য গতি নাই।

আমরা অতঃপর প্রদর্শিত রামায়ণীয় অধ্যায়ের অনুরূপ মহাভারতের একটি অধ্যায়ের আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাভারতে দণ্ডনীতি—নারদের অনুশাসন

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে কৌরবসাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এই রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণের নূতন রাজধানী স্থাপিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বান্ধববর্গ ও মিত্রপক্ষীয় রাজন্যবর্গ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্বর্ধনার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময় ইন্দ্রপ্রস্থসভাতে পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য দেবর্ষি নারদও সেই সভাতে আগমন করিয়াছিলেন।

এই দেবর্ষি নারদ বেদ ও উপনিষদের বেত্তা, ইতিহাসে ও পুরাণে অভিজ্ঞ, পুরাকল্পবিশেষাভিজ্ঞ, ন্যায়বিৎ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, ষড়ঙ্গবিৎ—শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদের অঙ্গ, ইহা যিনি জেনেন তাঁহাকে ষড়ঙ্গবিৎ বলে। দেবর্ষি নারদ ষড়ঙ্গবিৎ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, প্রগল্ভ, মেধাবী, স্মৃতিমান্, নীতিবিৎ অর্থাৎ ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ, অনাগতদর্শী, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগবিৎ, লৌকিক ও অলৌকিক প্রমাণদ্বারা বিষয়সমূহের নিশ্চয়বান্, পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের গুণদোষবিৎ, উত্তরোত্তর প্রবক্তা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বিশেষজ্ঞ, সমস্তভুবনকোষের যথার্থ জ্ঞানবান্ এবং সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, সাংখ্যযোগ-বিভাগবিৎ, সুরাসুরগণের বিবাদপ্রবর্ত্তক ও বিবাদপ্রশমক, সন্ধি বিগ্রহাদির তত্ত্ববিৎ, অনুমানবিদ্যায় প্রবীণ, সন্ধি বিগ্রহ, যান আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এই ছয়টি গুণের বিশেষজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী, সমস্ত বিষয়ে অপ্রতিহত বুদ্ধি, এইরূপ আরও অনেক গুণ সমন্বিত দেবর্ষি নারদ পাণ্ডব সভাতে উপনীত হইয়াছিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে দেবর্ষি নারদের বিদ্যাবত্তার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে—দেবর্ষি নারদ ঋকবেদ্, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাসপুরাণরূপ—পঞ্চমবেদ, পিতৃবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, দৈববিদ্যা, নিধিশাস্ত্র, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যাতে নিষ্ণাত ছিলেন। সভাপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদকর্ত্তৃক রাজধর্ম্মের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু উপদেশ করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন—মহারাজ! তোমার নির্ব্বাধে অর্থাগম হইয়া থাকে ত? ধর্ম্মে তোমার মন রত আছে ত? নানাবিধ বিষয়সুখ তুমি অনুভব করিয়া থাক ত? আত্মচিন্তায় তোমার মন প্রতিহত হয় না ত? পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের সমাচরিত প্রশস্তবৃত্তির আচরণ করিয়া থাক ত? অর্থলোভে ধর্ম্মের ও ধর্ম্মলোভে অর্থের বাধা হয় না ত? ধর্ম্ম ও অর্থ—উভয়ই কামভোগ দ্বারা বাধিত হয় না ত? সময়ের বিভাগপূর্ব্বক অর্থ ধর্ম্ম ও কাম এই তিনটির সেবা করিয়া থাক ত? হে নররাজ! তুমি তোমার পূর্ব্বপিতামহগণকর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্মার্থযুক্ত ব্যবহারের প্রতিপালন করিয়া থাক ত? উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্রের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাক ত?

তুমি ছয়প্রকার রাজগুণ দ্বারা সাতপ্রকার উপায়ের পরীক্ষা করিয়া থাক ত? ১। বক্তৃত্ব, ২। প্রগ্‌লভতা, ৩। মেধাবিত্ব, ৪। স্মৃতি—অতীতের স্মরণ, ৫। নীতি—নয়, এবং ৬। কবিত্ব—অনাগত বেদিতা এই ছয়টি

রাজার গুণ। বক্তৃত্বগুণ প্রযুক্ত রাজা, অমাত্য চার প্রভৃতির যথাযোগ্য কার্য্যের উপদেশে কুশল হইয়া থাকেন। বক্তৃত্ব না থাকিলে উপদেশকুশলতা থাকে না। শত্রুদমনাদি বিষয়ে উৎকর্ষ প্রদর্শনই রাজার প্রগ্লভতা গুণ, এই প্রগ্লভতা না থাকিলে রাজা শত্রুদমনাদি বিষয়ে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তর্ককুশলতাই রাজার মেধাবিত্বগুণ, এই গুণ না থাকিলে রাজা উহ ও অপোহ করিতে সমর্থ হন না। এই মেধাবিত্ব গুণ প্রযুক্তই রাজা সন্দিগ্ধ বিষয়ের অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। স্মৃতিগুণ দ্বারা অতীতবেদী ও কবিত্বগুণ দ্বারা অনাগতবেদী হইয়া থাকেন। যিনি অতীত ও অনাগতের প্রতিসন্ধান করিতে পারেন না,—অতীতে কি হইয়াছিল আগামীতে কিরূপ হইবে ইহা যিনি বুঝিতে পারেন না তিনি রাজগুণভ্রষ্ট অযোগ্য রাজা। এস্থলে রাজার যে ছয়টি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে এই ছয়টি গুণ দেবর্ষি নারদেরও ছিল তাহা বলা হইয়াছে, এজন্য এই ছয়টি গুণ যে কেবল রাজারই অপেক্ষিত তাহা নহে কিন্তু যাঁহারা রাজতন্ত্রের উপদেষ্টা বা রাজমন্ত্রী প্রভৃতি, তাঁহাদের সকলেরই এই ছয়টি গুণ থাকা আবশ্যক। নারদেরও এই ছয়টি গুণের উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার ইহাই বুঝাইয়াছেন। প্রদর্শিত ছয়টি রাজগুণ দ্বারা যে সাতটি উপায়ের পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে সেই সাতটি উপায়—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, মন্ত্র, ঔষধ ও ইন্দ্রজাল। এই সাত প্রকার উপায়ের বিবরণ পরে প্রদর্শিত হইবে।

নারদ আরও বলিয়াছেন যে—স্বপক্ষে ও পর পক্ষে এই সপ্তবিধ উপায়ের সমতা অথবা পরের হীনতা অথবা নিজের হীনতা এই ত্রিবিধরূপে সামাদির বলাবল, ষড়্‌বিধরাজগুণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাক ত? এবং তুমি চৌদ্দটি রাজদোষ পরীক্ষাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিয়া থাক ত? ১। নাস্তিক্য, ২। মিথ্যাভাষিতা, ৩। ক্রোধ, ৪। প্রমাদ, ৫। দীর্ঘসূত্রতা, ৬। বিজ্ঞপুরুষগণের সহিত অপরিচয়, ৭। আলস্য, ৮। ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, ৯। একাকী মন্ত্রনিরূপণ, ১০। অনভিজ্ঞজনের সহিত মন্ত্রণা, ১১। মন্ত্রণা দ্বারা নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, ১২। মন্ত্রগুপ্তি না রাখা, ১৩। মাঙ্গলিক কর্ম্মের অননুষ্ঠান, ১৪। যুগপৎ বহুশত্রুর সহিত বিরোধ। রাজা পরীক্ষাপূর্ব্বক নিজে এই দোষগুলি বর্জ্জন করিবেন এবং পরপক্ষীয় রাজগণের এই দোষগুলি আছে জানিয়া তদনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক পরপক্ষীয় রাজগণকে আনত করিবেন।

১। দেশ, ২। দুর্গ, ৩। রথ, ৪। হস্তী, ৫। অশ্ব, ৬। যোধ, ৭। এবং তাহাদের অধ্যক্ষ, ৮। অন্তঃপুর, ৯। অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, ১০। অন্ন—খাদ্যদ্রব্য, ১১। অশ্ব রথ ধনাদির সংখ্যা, ১২। আয় ব্যয় লেখন, ১৩। পর্য্যাপ্ত বা অপর্য্যাপ্ত ধনের বিচার, ১৪। এবং প্রচ্ছন্ন শত্রুর অবধারণ, এই চৌদ্দটি বিষয়ের বলাবল রাজা সম্যক্‌রূপে বিচার করিবেন। এজন্য দেবর্ষি বলিয়াছেন যে—হে মহারাজ! দেশাদি চৌদ্দটি বিষয়ের বলাবল তুমি সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া থাক ত? সামাদি সাতটি বিষয়ের যে বলাবল বিবেচনা করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহাতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে যে—এইরূপ শত্রুর সহিত সামবাক্য প্রয়োগ করা উচিত কি না—সামবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহাতে অভিমত ফল সিদ্ধ হইবে কি না—ফল সিদ্ধ হইলেও সামপ্রয়োক্তা রাজার কল্যাণ হইবে কি না ইত্যাদির নিরূপণকেই সামাদির বলাবল পরীক্ষা বলে। এইরূপ দেশাদি চৌদ্দটি বিষয়ের বলাবল পরীক্ষার কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহারও অভিপ্রায় এই যে স্বীয় ও পরকীয় দেশাদি চৌদ্দটি বিষয়ের স্বপক্ষে ও পরপক্ষে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্বীয়বুদ্ধিদ্বারা এবং চারদ্বারা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিবে। পূর্ব্বে যে সাত প্রকার উপায় ও দেশাদি চৌদ্দটি বিষয়ের বলাবল পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে ও চতুর্দ্দশরাজদোষ পরিহারের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরীক্ষার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—স্বপক্ষ ও পরপক্ষ পরীক্ষাপূর্ব্বক পরপক্ষীয় রাজগণের সহিত যথাযোগ্য সন্ধিস্থাপন করিয়া স্বীয়রাষ্ট্রের বিবৃদ্ধির জন্য আটটি কর্ম্ম করিয়া থাক ত? এই আটটি কর্ম্ম—১। কৃষিকর্ম্মের সুব্যবস্থা, ২| বাণিজ্যের জন্য দূরদেশগামী পথ নির্ম্মাণ, ৩। দুর্গ নির্ম্মাণ, ৪। সেতু নির্ম্মাণ, ৫। হস্তীসংগ্রহ, ৬। খনি হইতে শুল্ক সংগ্রহ, ৭। আকর হইতে শুল্ক সংগ্রহ, ৮। পতিত ভূমিতে কৃষ্যাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা। খনি ও আকরের ভেদ এই যে, খননদ্বারা যে ভূমিতে মণি রত্নাদি পাওয়া যায় সেই ভূমিকে খনি বলে, আর

অগ্নাদিসংযোগের দ্বারা প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি হইতে সুবর্ণ লবণাদি, যে ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে আকর বলে।

হে মহারাজ! তুমি সাতটি রাজ্যপ্রকৃতি যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া থাক ত? ১। স্বামী—অধ্যক্ষ, ২। মন্ত্রী—অমাত্যাদি, ৩। সুহৃৎ, ৪। কোষ, ৫। রাষ্ট্র, ৬। দুর্গ, ৭। বল—সৈন্যপ্রভৃতি। প্রথম প্রকৃতি স্বামী সাতপ্রকার—দুর্গাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রধানসেনাপতি, রাজপুরোহিত, চিকিৎসক ও দৈবজ্ঞ। চতুরঙ্গিনী সেনার আহারাদির ব্যবস্থা যিনি করেন তাঁহার নাম বলাধ্যক্ষ। এবং যুদ্ধকালে চতুরঙ্গিনী সেনা যাঁহার অধীন হইয়া যুদ্ধ করে তাঁহাকে প্রধানসেনাপতি বলে। এই সাতটি প্রকৃতিকে শত্রুনরপতিগণ ধনাদিদ্বারা আয়ত্ত করিয়া রাজ্যের বিনাশসাধন করিয়া থাকে, এজন্য দেবর্ষি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে—শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণ তোমার দুর্গাধ্যক্ষ প্রভৃতি স্বামিবর্গকে যাহাতে ধনাদির দ্বারা আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখ ত? এই সমস্ত অধ্যক্ষবর্গ ধনাঢ্য হইয়া দ্যূত পান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইয়া থাকে। এই অধ্যক্ষবর্গ ব্যসনাসক্ত হইলে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এই সমস্ত অধ্যক্ষবর্গ যাহাতে ব্যসনাসক্ত হইতে না পারে তাহার প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখ ত? এই সমস্ত অধ্যক্ষবর্গ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছে ত? যাহাদের দুষ্টভাব শঙ্কা করা যায় না তাদৃশ দূতবর্গ ও সুহৃদ্‌বর্গ, উভয়পক্ষ হইতে বেতনগ্রাহী হইয়া তোমার সুমন্ত্রিতবিষয় শত্রুগণের নিকটে প্রকাশ করিয়া দেয় না ত? তুমি মিত্র উদাসীন ও শত্রুরাজগণের সম্যক্ অনুসন্ধান করত? তাহাদের চিকীর্ষিতকর্ম্ম সম্যক্ অবগত থাক ত? সম্যক্ অবগত হইয়া যথাকালে তাহাদের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া থাক ত? মধ্যম ও উদাসীন রাজগণের সহিত সমবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাক ত? তোমার সহিত ও তোমার শত্রুরাজগণের সহিত তুল্যভাবে যাহারা সম্বন্ধরক্ষা করে তাহাদিগকে মধ্যম নরপতি বলিয়া জানিবে। এই মধ্যমরাজগণকে উভয়বেতন বলা হয়। আর যে সমস্ত নরপতিগণ তোমার সহিত ও তোমার শত্রুরাজগণের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করে না, সেই সমস্ত নরপতিগণকে উদাসীননরপতি বলিয়া জানিবে। এই মধ্যম ও উদাসীন রাজগণের সহিত সমানস্থিতি রক্ষা করিয়া থাক ত? হে মহারাজ! সৎকুলসম্ভূত নির্ম্মলচরিত্র এবং বিপৎকালে তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এমন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে তুমি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া থাক ত?

মন্ত্রণাই রাজার জয়ের মূল—তোমার শাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়া থাকেন ত? মন্ত্রভেদ রাজ্যবিনাশের কারণ, মন্ত্রগুপ্তির অভাবে শত্রুগণ দ্বারা তোমার রাষ্ট্র উৎপীড়িত হয় না ত? তুমি যথাকালে জাগ্রত হইয়া রাত্রির শেষভাগে অমাত্যগণের সহিত অর্থ বৃদ্ধির চিন্তা করিয়া থাক ত? তুমি একাকী অথবা বহুমন্ত্রীপরিবৃত হইয়া মন্ত্রণা কর না ত? তোমার মন্ত্রণা, কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই রাজ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে না ত? অল্প ব্যয়সাধ্য অথচ বহু ফলপ্রদ উপায় সমূহের দ্রুত আরম্ভ করিয়া থাক ত? তাহাতে বিলম্ব কর না ত? তোমার রাজ্যে ধনবর্দ্ধন কার্য্যে নিযুক্ত পুরুষগণ, তোমার অজ্ঞাত থাকে না ত? তাহারা তোমার অবিশ্বাসের পাত্র নহে ত? পুনঃ পুনঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে যোগ দিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গকে তুমি রাজ্যের বৃদ্ধিকর কার্য্যে নিযুক্ত কর না ত? বিশ্বস্ত পরিণতবয়স্ক কুলক্রমাগত ব্যক্তিবর্গকে অর্থবর্দ্ধন কার্য্যে নিযুক্ত রাখ ত? মন্ত্রগুপ্তির মত কর্ম্মগুপ্তিও তোমার থাকে ত? তোমার কৃত বা কৃতপ্রায় কর্ম্মসমূহই তো লোকে জানিতে পারে? কার্য্যের প্রারম্ভে বা কার্য্যপ্রারম্ভের পূর্ব্বে লোকে জানিতে পারে না ত? যুদ্ধবিদ্যায় পণ্ডিত আচার্য্যগণ, রাজকুমারগণকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া থাকেন ত? সহস্র মূর্খের বিনিময়ে একজন বিদ্বান্ ব্যক্তির সংগ্রহ করিয়া থাক ত? যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বিপৎকালে রাজ্য রক্ষা করিতে পারে। তোমার সমস্ত দুর্গসমূহ ধন, অস্ত্র, যন্ত্র, অন্ন ও জল পূর্ণ থাকে ত? শিল্পী ও ধনুর্ধরগণদ্বারা দুর্গসমূহ পরিপূর্ণ থাকে ত? মেধাবী বিক্রমশালী দান্তবুদ্ধি বিচক্ষণ একজন মন্ত্রীই রাজার মহাশ্রীপ্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে এজন্য তাদৃশ মন্ত্রী সংগ্রহে যত্নবান্ থাক ত?

ভারতীয় দণ্ডনীতিতে রাষ্ট্রের ১৮টি তীর্থ বলা হইয়াছে ১। প্রধান-মন্ত্রী, ২। পুরোহিত, ৩। যুবরাজ, ৪। সেনাপতি, ৫। দৌবারিক, ৬। অন্তঃপুরাধিকৃত, ৭। কারাগারাধ্যক্ষ, ৮। ধনাধ্যক্ষ, ৯। কার্য্যনিয়োজক, ১০। প্রাড়িববাক, ১১। সেনাগণের বেতন দানাধ্যক্ষ, ১২। নগরাধ্যক্ষ, ১৩। কর্ম্মান্তিক, ১৪। রাজ্যসীমাপাল, ১৫। দুর্গপাল ১৬। রাষ্ট্রপাল, ১৭। দণ্ডপাল, ১৮। ধর্ম্মাধ্যক্ষ, এই আঠারটি পদকে আঠারটি তীর্থ বলা হয়। পরকীয়রাজ্যে এই আঠারটি তীর্থ ও স্বকীয়রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ ব্যতীত পনরটি তীর্থের যথাযথ সংবাদ লইয়া থাক ত? মহীপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত চারবর্গ, পরস্পরের অবিদিতভাবে এবং অন্যের অবিদিতভাবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র গত তীর্থসমূহের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করিবে। এক একটি তীর্থে ক্রমিক তিনজন চার, সমান তথ্যসংগ্রহ করিলে রাজা তাহার যথোপযুক্ত বিধান করিবেন। চারগণ পরস্পর বিসংবাদী হইলে রাজা তাহার কারণ অবধারণপূর্ব্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন হে মহারাজ! তুমি পররাষ্ট্রের ১৮টি তীর্থ ও স্বরাষ্ট্রের ১৫টি তীর্থের যথার্থ সংবাদ চারগণ দ্বারা বিদিত থাক ত? শত্রুরাজগণের অবিদিতভাবে শত্রুরাজ্যের সমস্ত সংবাদ তুমি সাবধানতার সহিত সর্ব্বদা অবগত হইয়া থাক ত? বিনয়সম্পন্ন সদ্‌বংশদ্ভূত বহুবিদ্যাযুক্ত অসূয়ারহিত শাস্ত্রচর্চ্চাকুশল পুরুষকে পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত রাখ ত? শাস্ত্রজ্ঞ মতিমান্ কৌটিল্যরহিত পুরুষ তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে ত? সামুদ্রিকশাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রকুশল, ধূমকেতু ভূমিকম্প প্রভৃতি দিব্য ও ভৌম উৎপাত নিরূপণে দক্ষ, দৈবজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজ্যে নিযুক্ত রাখ ত? উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে তাহাদের যোগ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাক ত? ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা এবং ভয়োপধা এই চতুর্ব্বিধ উপধা দ্বারা বিশুদ্ধ অমাত্যবর্গকে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক ত? শত্রুরাজগণের অবিদিত ভাবে শত্রুরাজ্যের সমস্ত সংবাদ তুমি সাবধানতার সহিত সর্ব্বদা অবগত থাক ত?

তুমি উগ্রদণ্ডদ্বারা প্রজাগণকে উদ্বিগ্ন কর না ত? মন্ত্রিগণ তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা তোমার রাজ্য শাসন করে না ত? অমাত্যবর্গ তোমাকে অবজ্ঞা করে না ত? উৎসাহযুক্ত, শূর, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, নির্ম্মলবুদ্ধি, সৎকুলসম্ভূত, তোমার প্রতি অনুরাগযুক্ত এবং কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ ত? সর্ব্ববিধ যুদ্ধবিদ্যাতে বিশারদ যাঁহারা অত্যন্ত বিক্রমী এমন বলপ্রধানগণকে তুমি সৎকারপূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাক ত? তোমার সৈন্যগণের যথোপযুক্ত বেতন ও ভাতা যথাকালে দিয়া থাক ত? কাল বিলম্ব কর না ত? যাহারা বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে যথাকালে বেতন ও ভাতা না দিলে তাহার অত্যন্ত দুর্গত হইয়া পড়ে, তাহাতে তাহারা স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঘোর অনর্থ আনয়ন করে। তোমার রাজ্যের প্রধানঅমাত্যবর্গ—তোমার প্রতি অনুরক্ত আছে ত? যুদ্ধদিবিপৎকালে তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে ত? সেনাপতিবর্গ তোমার আজ্ঞা ব্যতীতই স্বেচ্ছানুসারে সৈন্যবর্গকে পরিচালিত করে না ত? তোমার ভৃত্যবর্গের মধ্যে কোন পুরুষ, স্বীয়যোগ্যতা দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিলে—তুমি তাহাকে অধিক সম্মান দিয়া থাক ত? এবং তাহার বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করিয়া থাক ত? জ্ঞানবান্ বিদ্যাবিনীত বক্তিবর্গকে তাহাদের গুণানুসারে দানমান দ্বারা সম্মানিত কর ত? তোমার কার্য্য-সম্পাদনের জন্য যাহারা প্রাণত্যাগ করে এবং তোমার ভৃত্যবর্গের মধ্যে যাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত তাহাদের পোষ্যবর্গকে ভরণ-পোষণ করিয়া থাক ত? কোন ব্যক্তি ভীত হইয়া তোমার শরণাগত হইলে অথবা দুর্ব্বল শত্রু তোমার শরণাগত হইলে এবং যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির তুমি রক্ষা করিয়া থাক ত? তুমি রাজ্যের প্রজাবর্গের নিকটে তাহাদের পিতামাতার মত অশঙ্কনীয় এবং সকলের নিকটে সমভাবে আদৃত হইয়া থাক ত? দুর্ভিক্ষ মরক প্রভৃতি দ্বারা তোমার শত্রুরাজ্য বিপন্ন হইয়াছে জানিয়া তুমি কাল-বিলম্ব না করিয়া সেই শত্রুরাজ্য আক্রমণ কর ত? আক্রমণকালে তুমি তোমার মন্ত্র কোষ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখ ত? দ্বাদশ প্রকৃতি রাজমণ্ডলের অভিপ্রায় সম্যগ্‌ভাবে অবগত হইয়া এবং শত্রুপক্ষের পরাজয়ের মূল তাহাদের ব্যসনবর্গ অবগত

হইয়া এবং স্বপক্ষে ব্যসনবর্গের অভাব জানিয়া শত্রুরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাক ত? যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্যগণকে বেতন অগ্রিম প্রদান কর ত? তোমার শত্রুরাজ্যে যে সমস্ত প্রধান সেনাপতিবর্গ অবস্থিত আছে তাহাদিগকে গোপনে তাহাদের যোগ্যতানুসারে ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া থাক ত?

তুমি প্রথমে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিজেকে জয় করিয়া পরে অজিতেন্দ্রিয় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাক ত? তুমি যখন শত্রুগণের প্রতি যুদ্ধযাত্রা কর—তখন সৈনিকগণের অগ্রভাগে অর্থাৎ তোমার সৈন্যগণ শত্রুরাজ্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি অগ্রভাগে গমন করিয়া থাকে ত? তুমি নিজের রাজ্য সুরক্ষিত রাখিয়া শত্রুরাজ্যের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাক ত? নিজের রাজ্য সুরক্ষাপূর্ব্বক শত্রুরাজ্য আক্রমণ ও শত্রুকে জয় করিয়া শত্রুরাজ্যের রক্ষা করিয়া থাক ত? তোমার সৈন্যবর্গের মধ্যে ১। রথ ২। হস্তী ৩। অশ্ব ৪। পদাতি ৫। বিষ্টি (কর্ম্মকারক) ৬। নৌকা ৭। চার ৮। দেশিক (সৈন্যগণের পথপ্রদর্শককে দেশিক বলে, জলযুদ্ধে জলপথাভিজ্ঞ দেশিক ও স্থলপথে স্থলপথাভিজ্ঞ দেশিক) এই অষ্টাঙ্গ সুসম্পন্ন থাকে ত? এই অষ্টাঙ্গযুক্তসেনা, শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শত্রুনিবারণে উদ্‌যুক্ত থাকে ত?

যে সময়ে শত্রুরাজ্যে শস্যসংগ্রহকাল উপস্থিত হয় অথবা যে সময়ে শত্রুরাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়—সেই সময়ে তুমি কালবিলম্ব না করিয়া শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়া থাক ত? তোমার নিজের রাজ্য-রক্ষার জন্য যেমন বহুতর অধিকারিবর্গ নিযুক্ত আছে এইরূপ শত্রুরাজ্যেও তোমার অধিকারিগর্গ প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার রাজ্যস্থিত অধিকারিবর্গের, সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া থাকে ত? এবং তোমার রাজ্যস্থিত অধিকারিবর্গ, শত্রুরাজ্যস্থিত তোমার প্রচ্ছন্ন অধিকারিবর্গকে সাহায্য করিয়া থাকে ত? তোমার ভক্ষ্যবস্তুসমূহ, বস্ত্রসমূহ, চন্দন অগুরু প্রভৃতি গাত্রানুলেপন এবং সুগন্ধি বস্তুসমূহ, তোমার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ তোমার জন্য বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকে ত? তোমার রাজকোষ, শস্যাগার, বাহন, অস্ত্র, নগর, দুর্গাদি এবং তোমার আয়বিভাগ—কল্যাণবুদ্ধিসম্পন্ন অনুরক্ত ভৃত্যগণদ্বারা রক্ষিত থাকে ত? আন্তর পাচকাদি হইতে এবং বাহ্য সেনাপতিগণ হইতে তোমার নিজের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাক ত? এই আন্তর ও বাহ্য ভৃত্যগণকে, স্বীয় পুত্র ও অমাত্যাদি হইতে রক্ষা করিয়া থাক ত? এবং পুত্রকে অমাত্যাদিবর্গ হইতে এবং অমাত্যগণকে পুত্র হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাক ত? তোমার পানাদিব্যসন-জন্য ব্যয় লোকে জানিতে পারে না ত? তুমি রাজকোষ বৃদ্ধিতে যত্নবান্ থাক ত? সুভিক্ষকালে আয়ের চতুর্থাংশ দ্বারা এবং সমকালে আয়ের অর্দ্ধাংশ দ্বারা এবং দুর্ভিক্ষসময়ে আয়ের চারিভাগের তিন ভাগের দ্বারা তোমার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে ত? তুমি তোমার জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বৃদ্ধব্যক্তি, বণিক্, শিল্পী এবং আশ্রিতজনকে অনুগৃহীত করিয়া থাক ত? তোমার রাজ্যের দুর্গতজনকে ধন-ধান্যের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়া থাক ত? তোমার গণক ও লেখকগণ তোমার আয় ও ব্যয় যথারীতি গণন ও লেখন করিয়া থাকেন ত? আয়ের ও ব্যয়ের গণন ও লেখনাদি কার্য্য, অনিষ্পন্ন হইয়া থাকে না ত? তোমার ভৃত্যগণ বিনা অপরাধে কার্য্য হইতে বিতাড়িত হয় না ত? যাহারা স্বীয় কার্য্যে নিপুণ ও তোমার হিতকামী তাহাদিগকে বিনা অপরাধে কার্য্য হইতে বিযুক্ত কর না ত? ভৃত্যবর্গের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী জানিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত কর ত? লুব্ধ, চোর, শত্রু ও কার্য্যে অযোগ্য এইরূপ লোককে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর না ত? তোমার লুব্ধকর্ম্মচারিবৃন্দ, চোরগণ, রাজকুমারগণ অথবা রাজমহিষীবর্গ দ্বারা তোমার রাজ্য পীড়িত হয় না ত? তুমিও রাজ্যকে পীড়িত কর না ত?

তোমার রাজ্যের কর্ষকগণ সন্তুষ্ট আছে ত? তোমার রাষ্ট্রে সুবিশাল জলপূর্ণ তড়াগসমূহ ভাগশঃ ব্যবস্থিত আছে ত? তোমার রাজ্যে কৃষি, দেবমাতৃক নয় ত? অর্থাৎ তোমার রাজ্যে কৃষি, বৃষ্টি-সম্পাদ্য নহে ত? তোমার রাজ্যের কর্ষকগণের প্রয়োজনীয় অন্ন ও বীজের অভাব হয় না ত? অতি অল্পবৃদ্ধি গ্রহণ করিয়া কর্ষকগণকে

অনুগ্রহ ঋণ প্রদান করিয়া থাক ত? কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি মানুষের জীবিকানির্ব্বাহক ব্যবহার তোমার রাজ্যে নির্ব্বাধভাবে প্রচলিত আছে ত? এই কৃষি প্রভৃতি বার্ত্তাকর্ম্মে আশ্রিত লোকসমূহ সুখে কাল যাপন করিয়া থাকে ত? কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মের নাম বার্ত্তা। তুমি প্রতিগ্রামে কৃতপ্রজ্ঞ দক্ষ পাঁচজন করিয়া লোক নিযুক্ত রাখ ত? এই নিযুক্ত পাঁচজন লোক অবিসংবাদিতভাবে জনপদের কল্যাণ করিয়া থাকে ত? এই পাঁচজনের নাম—(১) প্রশাস্তা। (২) সমাহর্ত্তা। (৩) সংবিধাতা। (৪) লেখক। (৫) সাক্ষী। গ্রামের শাসকের নাম প্রশাস্তা। গ্রামস্থিত প্রজাগণের নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহা একত্রিত করিয়া রাজাকে যিনি প্রদান করেন তিনি সমাহর্ত্তা। প্রশাস্তা ও সমাহর্ত্তা ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। যিনি শাসন করিবেন, তিনি প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যিনি প্রজাগণের নিকট হইতে রাজগ্রাহ্য কর গ্রহণ করিবেন—তিনি শাসক হইতে পারিবেন না। প্রজা ও সমাহর্ত্তার একবাক্যতা ঘটককে সংবিধাতা বলে। প্রজা যাহা দিল ও সমাহর্ত্তা যাহা লইলেন এই উভয়ের অনুসন্ধান করিয়া যিনি ঐকমত্য নির্দ্দেশ করেন—তাঁহার নাম সংবিধাতা। রাজগ্রাহ্য বস্তু যিনি পুস্তকে লেখেন—তাহাকে লেখক বলে এবং এই লেখকের কার্য্যে যিনি সত্যতার অনুসন্ধান করেন, তিনি সাক্ষী। এই পাঁচজন, গ্রামে থাকিয়া মিলিতভাবে বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জনপদের কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। তোমার রাজ্যের অন্তর্গত গ্রামসমূহকে নগরসদৃশ করিয়াছ ত? বহু বীরপুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত গ্রামকেই নগরবৎ গ্রাম বলা হয়। এই নগরবৎ গ্রামসমূহই, মুখ্যনগর রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক এবং তোমার রাজ্যের সীমান্তভাগ, যে স্থলে আটবিকগণ বাস করে, সেই প্রান্তভাগকে তুমি গ্রাম সদৃশ করিয়াছ ত? গ্রামে যেরূপ শাসন ও রাজগ্রাহ্য দ্রব্যের সংগ্রহ নির্ব্বাধভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সীমান্তপ্রদেশেও সেইভাবে হয় ত? সীমান্ত, গ্রাম ও নগর হইতে সংগৃহীত সামগ্রী তোমার নিকটে যথার্থভাবে উপস্থিত হয় ত? সীমান্তের অধিপতি গ্রামাধিপতির নিকটে, গ্রামাধিপতি নগরাধিপতির নিকটে, নগরাধিপতি দেশাধিপতির নিকটে এবং দেশাধিপতি সাক্ষাৎ রাজার নিকটে রাজগ্রাহ্য দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া থাকে ত? পুরাধ্যক্ষগণ রক্ষকপরিবৃত্ত হইয়া রাজ্যে উপদ্রবকারী চোরগণের নিবারণের জন্য চোরগণের অনুধাবন করিয়া থাকে ত?

তোমার রাজ্যে স্ত্রীসকল সুরক্ষিত আছে ত? তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে কাল যাপন করে না ত? স্ত্রীলোকের নিকটে কোন গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ কর না ত? কোন আত্যয়িক কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহা শ্রবণ করিয়াও তুমি সুখানুভবের নিমিত্ত অন্তঃপুরে অবস্থান কর না ত? রাত্রির ২য় ও ৩য় যাম নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া ৪র্থ যামে প্রবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করিয়া থাক ত? বর্ম্মাবৃত্ত রক্ষকগণ, খড়্গধারণ পূর্ব্বক তোমার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা তোমার সমীপবর্ত্তী থাকে ত? তুমি পরীক্ষাপূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাক ত? তোমার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমানভাবে দণ্ডের ব্যবস্থা কর ত? ঔষধ ও নিয়মাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য এবং জ্ঞানবৃদ্ধজনের সেবা দ্বারা মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাক ত? অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে কুশল চিকিৎসকগণ তোমার শরীর রক্ষার জন্য উদ্‌যুক্ত থাকেন ত? তুমি লোভ, মোহ ও মান বশতঃ অর্থী ও প্রত্যর্থী (বাদী ও বিবাদী) জনের কার্য্যে অবহেলা কর না ত? তোমার আশ্রিত জনের বৃত্তিচ্ছেদ কর না ত? তোমার শত্রু রাজ্য হইতে ধনাদি গ্রহণ করিয়া তোমার পুরবাসী ও রাষ্ট্রবাসী জনগণ, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করে না ত? শত্রুরাজগণ অর্থদ্বারা তোমার রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণকে ক্রয় করে না ত? যে শত্রু তোমার দ্বারা পীড়িত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল, কালান্তরে সেই শত্রু মন্ত্রবল দ্বারা বলবান্ হইয়া তোমার বিরোধী হয় নাই ত? প্রধান নরপতিগণ তোমার অনুরক্ত আছেন ত? তোমার কার্য্যে তাঁহারা প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত আছেন ত? নানাবিদ্যাতে পারদর্শী সাধু ও ব্রাহ্মণগণের গুণানুসারে পূজা করিয়া থাক ত? তোমার পূর্ব্বরাজগণ কর্ত্তৃক আচরিত বেদমূলক ধর্ম্মকার্য্য সমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ত? তোমার গৃহে ব্রাহ্মণগণ স্বাদু অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ত? বাজপেয় পুণ্ডরীক প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাক ত? জ্ঞাতি, গুরু ও বৃদ্ধগণকে, দেবতা তপস্বী, দেবালয় ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাক ত? প্রদর্শিত নিয়মানুসারে যে রাজা রাজ্য শাসন করেন তিনি সমস্ত পৃথিবী জয়

করিয়া অশেষ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। কোন আর্য্যচরিত বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিকে, কোন দুষ্কর্ম্মে অপরাধী করিয়া বিচারকগণ লোভবশতঃ তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করে না ত? লোভী অশাস্ত্রজ্ঞ বিচারক, শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তির প্রতিও অপবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তোমার রাজ্যে এইরূপ হয় না ত? যথার্থ দুষ্কৃতকারিগণ, রাজপুরুষদ্বারা গৃহীত হইলেও এবং প্রমাণ দ্বারা দুষ্কৃতকারী নিশ্চিত হইলেও, ধনলোভে তোমার বিচারকগণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন না ত? ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির বিবাদে ধনলোভে তোমার বিচারকগণ ধনাঢ্য ব্যক্তির পক্ষালম্বন করে না ত?

নারদ আরও বলিয়াছেন যে, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তোমার বেদ সফল হইয়াছে ত? তোমার ধন সফল হইয়াছে ত? তোমার দারক্রিয়া সফল হইয়াছে ত? তোমার বিদ্যা সফল হইয়াছে ত? যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, এই চারটি কিরূপে সফল হয়? এতদুত্তরে নারদ বলিয়াছেন,—বেদের ফল অগ্নিহোত্র, ধনের ফল দান ও ভোগ, দারক্রিয়ার ফল পুত্র ও রতি, বিদ্যার ফল শীল ও বৃত্ত। অনন্তর নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে মহারাজ! দূরদেশ হইতে বণিক্‌সমূহ তোমার অভিপ্রেত সামগ্রী তোমার রাজ্যে আনয়ন করিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে ত? এবং এই আনীত সামগ্রীর যথোপযুক্ত শুল্ক, তোমার শুল্কাধ্যক্ষগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ত? বণিক্‌গণ তোমার রাজ্যে ও নগরে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া আসে তাহারা পণ্যদ্রব্যে কোনও প্রবঞ্চনা করিতে পারে না ত? তোমার কৃষি বিভাগ হইতে ও পশুবিভাগ হইতে উৎপন্ন ধন্যাদিপণ্য ও ঘৃত-দুগ্ধ চর্ম্ম প্রভৃতি বস্তু তোমার প্রভূত সঞ্চিত থাকে ত? সেই সঞ্চিত বস্তু হইতে ধর্ম্মার্থ দ্বিজগণকে মধু, ঘৃত প্রভৃতি দিয়া থাক ত? তোমার রাজ্যে শিল্পিগণের শিল্পকর্ম্মযোগ্য দ্রব্য ও উপকরণের অভাব হয় না ত? অন্ততঃ চারিমাস শিল্পকার্য্যের যোগ্য বস্তু শিল্পিগণের সঞ্চিত থাকে ত? তোমার রাজ্যে যে সমস্ত পুরুষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তুমি তাহাদের সংবাদ রাখ ত? উৎকৃষ্ট কার্য্যের কর্ত্তাকে তুমি প্রশংসা করিয়া থাক ত? তাদৃশ পুরুষকে সজ্জনের মধ্যে আনিয়া পূজা ও সৎকার করিয়া থাক ত? তুমি হস্তিসূত্র ও রথসূত্র প্রভৃতি সেই সেই সূত্রাভিজ্ঞজনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাক ত? তোমার রাজ্যে ধনুর্ব্বেদসূত্র ও যন্ত্রসূত্র সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হয় ত? এস্থলে টীকাকার ‘নীলকণ্ঠ’ বন্দুকনির্ম্মাণ-শাস্ত্রকে যন্ত্রসূত্র বলিয়াছেন। সর্ব্ববিধ অস্ত্র এবং আভিচারিক ব্রহ্মদণ্ড এবং শত্রুনাশক বিষযোগ প্রভৃতি অবগত আছ ত? অগ্নিভয়, সর্পভয়, রোগভয় প্রভৃতি হইতে তুমি নিজের রাজ্যকে রক্ষা করিয়া থাক ত? অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকৃতাঙ্গ এবং অবান্ধবজনগণকে এবং সন্ন্যাসিগণকে তুমি পিতার মত রক্ষা কর ত? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী অনর্থ তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ ত?

আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত একটি অধ্যায় ও মহাভারতের সভাপর্ব্বের অন্তর্গত একটি অধ্যায়ের আলোচনা করিলাম। এই দুইটি অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কতগুলি এমন বিষয় আছে, যাহা উভয় গ্রন্থেই এক। কেবল যে বিষয়ই এক তাহা নহে ; ভাষাও এক। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের যে পরিপূর্ণাঙ্গ রাজনীতি শাস্ত্র ছিল, তাহা হইতেই রামায়ণে ও মহাভারতে রাজনীতি সংগৃহীত হইয়াছে। আর এজন্যই উভয় গ্রন্থেই বিষয়ের সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় গ্রন্থেই রাজনীতি প্রকরণে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি বিষয় প্রচলিত মনুসংহিতাতেও আছে। প্রচলিত মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা রামায়ণ ও মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতাতে রাজধর্ম্ম বিষয়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে—কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে সেই সমস্ত বিষয়গুলিই কোনস্থলে সংক্ষিপ্ত ও কোনস্থলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ কৌটিল্যের শিষ্য ‘কামন্দক’ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যারূপ যে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। কামন্দকনীতিশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া তাহার কিয়দংশের সংগ্রহমাত্র কামন্দকীয়—

নীতিসার নামে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থখানি মাত্র ১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা না থাকায় এই গ্রন্থখানির পাঠও প্রমাদপূর্ণ এবং এই গ্রন্থের যে টীকা পাওয়া যায় তাহাও অস্পষ্ট।

রামায়ণের প্রদর্শিত অধ্যায়ে ভগবান্ রামচন্দ্র রাজনীতিশাস্ত্রের বক্তা এবং মহাভারেতর প্রদর্শিত অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ রাজনীতিশাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বনবাসী রামচন্দ্র, সম্রাট্ ভরতের নিকটে এবং দেবর্ষি নারদ, সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের নিকটে এই রাজনীতিশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই রাজনীতির আলোচনা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক সৎপুরুষের অতিশয় অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ শুনিতেই পাই না, যদিও বা কদাচিৎ শুনিতে পাই—তাহাতেও রাজনীতির গন্ধমাত্র থাকে না। পরবর্ত্তীকালে এমনভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে রাজনীতির স্থানই হইতে পারে না। রামচরিত্রে বা যুধিষ্ঠিরচরিত্রে কূটরাজনীতিশাস্ত্রের স্থান থাকা আমরা ভারতীয়-সভ্যতার কলঙ্ক বলিয়াই মনে করি। ইহার ফলে আমাদের যে শোচনীয় রাষ্ট্রীয়দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—তাহা ভারতের ২|১ জন বুদ্ধিমান্ লোক হয়ত এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কামন্দকীয়-নীতিসারের উপাধ্যায়নিরপেক্ষানুসারিণী টীকাতে টীকাকার এই রাজনীতি শাস্ত্রের একটি আচার্য্য পরম্পরা দেখাইয়াছেন। টীকাকার কোথা হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা লেখেন নাই এবং এই টীকার রচয়িতা কে তাহাও জানা যায় না। কেবল মাত্র এই মনে করিয়া আমরা টীকাকারের কথাগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি যে—প্রাচীন ভারতে রাজনীতিশাস্ত্রের প্রণেতৃগণ জগন্মান্য ছিলেন। যদি এখনও কেহ প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের সন্মান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইবে না। টীকাকার বলিয়াছেন যে, অতিপূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকীয় বুদ্ধিদ্বারা একলক্ষ অধ্যায়যুক্ত একখানি রাজধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাগণের আয়ুর অল্পতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নারদ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র, ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, ভীষ্ম, পরাশর এবং মনু প্রভৃতি মহর্ষিবর্গ সেই ব্রহ্ম-বিরচিত গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য মহর্ষিগণও সেই তন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিষ্ণুগুপ্ত-কৌটিল্য, এই শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুগুপ্ত-পর্য্যন্ত আচার্য্যগণ একই দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বৃহৎ, মধ্যম ও সংক্ষিপ্তভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রাজনীতি শাস্ত্রের আদর বিলুপ্ত হইয়াছে ও তাহাতে এই সমস্ত সুবিপুল গ্রন্থরাশির অধিকাংশই বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে—নিপুণতার সহিত তাহা আলোচনা করিলে পূর্ণাঙ্গ নীতিশাস্ত্রের উদ্ধার এখনও অসম্ভব নহে। যদি আমরা ভারতীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিতে পারি, তবে ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে যে এই প্রাচীন ভারতীয় পূর্ণাঙ্গ অর্থশাস্ত্র অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইবে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ, বিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধির জন্য আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই যে, যে শাস্ত্রের আলোচনায় দেশের সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় এবং যাহার অভাবে সমস্ত সমৃদ্ধির বিনাশ ঘটে, সেই শাস্ত্রের আলোচনার জন্য কেহ একটি কথাও উচ্চারণ করিতেছেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থশাস্ত্রের অনাদরের কারণ

অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনায় ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ ক্রমশঃ অধিকতর শিথিল-আদর হইয়াছেন। যদিও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন—আর্য্য গ্রন্থ সমূহ দণ্ডনীতির আলোচনাতে পরিপূর্ণ তথাপি পরবর্ত্তীগ্রন্থে ক্রমশঃ এই শাস্ত্রের আলোচনা ক্ষীণতর হইয়াছে। আদিকাব্য রামায়ণের একটি অধ্যায়ের আলোচনা আমরা দেখাইয়াছি, এরূপ যুদ্ধকাণ্ডের ৬৩ অধ্যায়, ৩৫ অধ্যায় ২৯ অধ্যায় ২৭ অধ্যায় ১৮ অধ্যায় এবং ১৬ অধ্যায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আদিকাব্য রামায়ণ রাজনীতির আলোচনাতে পরিপূর্ণ। এই শাস্ত্রের আলোচনায় আদিকাব্য রামায়ণ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভারতের এই সুবিশাল আদিকাব্যে দণ্ডনীতির আলোচনা সুবিন্যস্ত হইয়া কাব্যের অসাধারণ গৌরববৃদ্ধি ও প্রাচীন আর্য্যজাতির সুমার্জিত রুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পরবর্ত্তিকালে রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কাব্যও এই রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা সর্ব্বথা উপেক্ষিত হয় নাই, কিন্তু ১২শ শতকে রচিত নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পর্য্যন্ত রচিত কাব্য সমূহে রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা কাব্যের শোভাবর্দ্ধক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কেবল যে শোভাবর্দ্ধক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই তাহা নহে, বরং এই শাস্ত্রের আলোচনা কাব্যের অপকর্ষাধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, দূরদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি যখন ক্রমশঃ ম্লান হইয়াছিল, সিন্ধুনদের পশ্চিমতট আর্য্যগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক সিন্ধুর পশ্চিমতটভূমি সম্পূর্ণ ভাবে অধিকৃত হইয়াছিল, যে ভূমিতে এক সময়ে ভরতের পুত্র পুষ্কর, পুষ্কলাবত নামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুনদের পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল এবং ভারতের অপরপুত্র তক্ষ, সিন্ধুর পূর্ব্বতটে 'তক্ষশীলা' নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন।[1] যে তক্ষশীলাতে ভারতসম্রাট্ 'জনমেজয়' সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ বৈশম্পায়নের নিকটে মহাভারত প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন এই সমস্ত পবিত্র ভূমি, আর্য্যজাতির তেজ ও বীর্য্যের অভাবে ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইতেছিল, এই সময়ে ভারতীয়পণ্ডিতবর্গ রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনাতে হতাদর হইয়া প্রসঙ্গক্রমেও রাজনীতি আলোচনাতে বিরত হইয়াছিলেন। কেবল বিরতই হইয়াছিলেন না—এই শাস্ত্রের আলোচনা দুষ্কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময়ে যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেম-কাহিনীই বিবৃত হইয়াছে, নায়ক নায়িকার প্রেম-কীর্ত্তন করাই কাব্যের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

এই সময়ে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের গৌরব বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছিল। শৃঙ্গাররসের আলোচনায় যিনি যত বাড়াবাড়ি করিতে পারিয়াছেন তিনিই বিদ্বৎসমাজে তত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসের আলোচনায় ইঁহারা অধিক আকৃষ্ট হইলেও পরকীয়াসাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই, স্বকীয়াতেই চিত্ত নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এ মর্য্যাদাও থাকে নাই। সংস্কৃতভাষাতেও

[1] রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০০তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরকীয়াসাহিত্য রচিত হইতে লাগিল—যে সাহিত্যের নির্ব্বাধ প্রচার বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই সাহিত্যের আলোচনা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আর্য্যজাতির তেজবীর্য্যও তেমনই ক্ষীণ হইয়া আর্য্যজাতিকে নিতান্ত ক্লীব করিয়া তুলিতেছে। অতিক্ষুদ্র গ্রাম্যধর্ম্মের আলোচনায় যে জাতি অতিমাত্র লিপ্ত হিইবে, তাহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ১২শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাকৃতসাহিত্য ও দেশী সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় একমাত্র নায়কনায়িকার প্রেমকথা। কিন্তু স্বাধীনভারতের প্রধান কাব্য রামায়ণ মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানুষের আলোচ্য বিষয় প্রেমকাহিনী ভিন্ন আরও অনেক আছে। আমরা রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মহাভারতের আলোচনা করিলে এই রাজনীতিশাস্ত্রের সুবিশাল পরিব্যাপ্তি আরও সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইবে। যে দণ্ডনীতিশাস্ত্র ভারতীয় বিদ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিল, কিরূপ এই বিদ্যা ক্রমশঃ উচ্ছিন্ন হইয়াছে—তাহার কিছু আলোচনা করিব। ভারতীয় বিদ্বজ্জনের রুচি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে এই অধঃপতিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎসায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্ (ন্যায়ভাষ্য ৬৫ পৃষ্ঠা কলিকাতা সংস্করণ) বলিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভগবান্ অক্ষপাদ প্রমাণাদি ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে বলিয়াছেন। এই অক্ষপাদ-বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিদ্যাতেই তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স ভিন্ন ভিন্ন বুঝিতে হইবে। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বার্ত্তিককার 'উদ্দ্যোতকর' (যিনি পঞ্চমশতকে বিদ্যমান ছিলেন) বলিয়াছেন যে, সমস্তবিদ্যাতেই তত্ত্বজ্ঞানও আছে নিঃশ্রেয়সও আছে। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী—এই চারটি বিদ্যা। বেদ বিদ্যাকে ত্রয়ীবিদ্যা বলে। ত্রয়ী বিদ্যাতে অগ্নিহোত্রাদির সাধনসমূহের স্বাগতাদিপরিজ্ঞান, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ক্রমিকঅঙ্গসমূহের পরিজ্ঞান এবং কর্ম্মের অঙ্গসমূহের অনুপঘাতাদি পরিজ্ঞান ও কর্ত্তার বিশুদ্ধ অভিসন্ধির পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান ও স্বর্গ-প্রাপ্তি নিঃশ্রেয়স। এইরূপ বার্ত্তাশাস্ত্রে ভূম্যাদির পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই ভূমিতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এই ভূমিতে হয় না, এইরূপে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এইরূপে হয় না—এইরূপ জ্ঞানকে বার্ত্তাশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার উপযোগী ধনার্জ্জন প্রভৃতি, যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়া থাকে তাহাকে বার্ত্তাশাস্ত্র বলা হয়।

আমরা মহাভারতের যে অধ্যায় আলোচনা করিয়াছি—তাহাতেও বলা হইয়াছে যে,—"বার্ত্তায়াং সংশ্রিত স্তাত! লোকোঽয়ং সুখমেধতে" বার্ত্তাশ্রিতলোক সুখে কালযাপন করিতে পারে। সুতরাং বার্ত্তাশাস্ত্রে ভূম্যাদির পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান ও শস্যধনাদির লাভই নিঃশ্রেয়স। দণ্ডনীতি বিদ্যাতে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি যথাকালে যথাদেশে যথাশক্তি প্রয়োগের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং পৃথিবীজয় নিঃশ্রেয়স। আন্বীক্ষিকী–অধ্যাত্মবিদ্যাতে আত্মাদির জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স-অপবর্গ। কৌটিল্যঅর্থশাস্ত্রের বিদ্যোদ্দেশ প্রকরণে—আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি—এই চারিটি বিদ্যা বলা হইয়াছে এবং ইহার প্রতিপাদ্যবিষয়ও যথাক্রমে ত্রয়ীবিদ্যাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তাবিদ্যাতে অর্থ ও অনর্থ, দণ্ডনীতিবিদ্যাতে নয় (নীতি) ও অপনয় (দুর্নীতি) এবং অন্বীক্ষিকীবিদ্যা পুরুষের প্রজ্ঞা, বাক্য ও ক্রিয়ার নৈর্ম্মল্যসম্পাদক, ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে পুরুষের বুদ্ধিকে স্বস্থ ও অবিকৃত রাখে, এবং ত্রয়ী প্রভৃতি বিদ্যাত্রয়ের বলাবল হেতুদ্বারা অবধারণ করিয়া লোকের উপকার করিয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই বিদ্যোদ্দেশ প্রকরণে বলা হইয়াছে যে মনুশিষ্যগণ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিনটি বিদ্যা স্বীকার করিয়াছেন, আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীর অন্তর্গত বলিয়াছেন। বৃহস্পতিশিষ্যগণ বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটিকেই বিদ্যা বলিয়াছেন, ত্রয়ীকে লোকসংবরণ বলিয়াছেন। ত্রয়ী পৃথক্ বিদ্যা নহে বলিয়া—ত্রয়ীর অন্তর্গত আন্বীক্ষিকীও পৃথক্‌বিদ্যা নহে। শুক্রশিষ্যগণ দণ্ডনীতিই একটিমাত্র বিদ্যা বলিয়াছেন। অপর ত্রয়ী বার্ত্তা প্রভৃতি বিদ্যা, দণ্ডনীতিতেই প্রতিষ্ঠিত।

দণ্ডনীতি অপর বিদ্যাত্রয়ের যোগক্ষেমসাধন,—অর্থাৎ রক্ষক এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু কৌটিল্য চারিটি বিদ্যাই স্বীকার করিয়াছেন।

ভগবান্ মনু সপ্তম অধ্যায়ে এই চারিটি বিদ্যার কথাই বলিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—"ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্। আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ"॥ (৭-৪৩ শ্লোক)—ইহার অর্থ বেদত্রয়বেত্তা-দ্বিজাতিদিগের নিকট হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে। শাশ্বত-অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থশাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যাই আন্বীক্ষিকী, তাহা সেই শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষা করিবে। কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনাদি—যাহা ধনার্জ্জনের উপায়, তাহার প্রতিপাদক শাস্ত্রই বার্ত্তাশাস্ত্র, এই শাস্ত্র অভিজ্ঞ কৃষক, বণিক্ প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির রাজধর্ম্ম প্রকরণে বলা হইয়াছে—রাজা আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও ত্রয়ীতে কৃতবিদ্য হইবেন। (যাজ্ঞ আচার অধ্যায় ৩১১ শ্লোক) মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসনের সূত্রাধ্যায়ে (৫৯ অধ্যায়) বলা হইয়াছে যে, "ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ। দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ" (৩৩ শ্লোক) মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে যে চারিটি বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তিকালে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ ঘটিয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির আচার অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণাদি ৬টি বেদাঙ্গ ও ৪টি বেদ এই চতুর্দ্দশটিকে বিদ্যা ও ধর্ম্মের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিদ্যা চতুর্দ্দশটি নির্দ্দিষ্ট হইলেও বস্তুতঃ আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী এই দুইটী বিদ্যাকেই চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা, এই চতুর্দ্দশটি বিদ্যার অন্তর্গত নহে, এজন্য তাহা ধর্ম্ম ও বিদ্যার স্থানও নহে,—অর্থাৎ দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাকে বিদ্যাস্থান হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

যদিও ন্যায়ভাষ্য ও তাহার বার্ত্তিকে চারিটি বিদ্যাই বলা হইয়াছে, তথাপি নবমশতকে বর্ত্তমান কাশ্মীর-দেশীয় নৈয়ায়িক 'জয়ন্তভট্ট' ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, ন্যায়ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার চারিটি বিদ্যা বলিলেন কিরূপে? যদি চারিটি বিদ্যাই হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকার যাজ্ঞবল্ক্য ১৪টি বিদ্যা বলিলেন কেন? ১৪টি বিদ্যা বলায় বস্তুত ২টি বিদ্যাই বলা হইয়াছে, আন্বীক্ষিকী; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রকারের সহিত ন্যায়ভাষ্যকারের বিরোধ ঘটিতেছে। এইরূপ শঙ্কা করিয়া 'জয়ন্তভট্ট' বলিয়াছেন যে ১৪টি বিদ্যাই হওয়া উচিত, ৪টি নহে, কারণ বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি মাত্র দৃষ্টপ্রয়োজন—ইহাদের অদৃষ্টরূপ প্রয়োজন নাই। ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকীতে সমস্ত পুরুষার্থের উপদেশ আছে; সুতরাং সর্ব্বপুরুষার্থের উপদেশ বিদ্যাবর্গে, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির গণনা হইতে পারে না। ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী এই দুইটি বিদ্যাকেই চতুর্দ্দশভাগে বিভক্ত করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ঠিক।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—ন্যায়ভাষ্যকার ও তাহার বার্ত্তিককার যাহাদিগকে বিদ্যা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মতানুযায়ী পরবর্ত্তী 'জয়ন্তভট্ট' অনায়াসেই তাঁহাদের উক্তির অন্যথা করিয়া, দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রকে বিদ্যা-বিভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। উৎকট পরলোকরাগ এমনই বিমুগ্ধ করিয়াছিল যে—যে বিদ্যার প্রভাবে সাক্ষাৎভাবে ইহলোক ও পরম্পরাভাবে পরলোক রক্ষিত হইত, সেই দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্র উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল। দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা সাক্ষাৎভাবে পরলোক সাধক নহে। যদিও 'জয়ন্তভট্ট' কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্ম্মার সুশাসিত রাজ্যেই বাস করিতেন এবং রাজার সুশাসনের গুণেই নবমশতকে কাশ্মীরমণ্ডল বিদ্বজ্জনপূর্ণ ছিল এবং ছিল বলিয়াই জয়ন্তভট্ট অসাধারণ পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে দণ্ডনীতির সুপ্রয়োগের প্রভাবে তাঁহার এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ হইয়াছিল—মাত্র পারলৌকিক ফলের উৎকট তৃষ্ণাতে সেই দণ্ডনীতি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ভগ্বান মনুও ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, আন্বীক্ষিকী ও বার্ত্তা এই চারিটি বিদ্যারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশটি বিদ্যার কথা মনু বলেন নাই, মনুসংহিতার রাজধর্ম্ম প্রকরণে রাজার শিক্ষণীয়রূপে এই চারিটি বিদ্যার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, চাণক্যাদিশাস্ত্রের বেত্তা পুরুষগণের নিকট হইতে রাজা দণ্ডনীতি শিক্ষা করিবেন। এইরূপ বলিয়া আবার বলিয়াছেন যে, চাণক্যাদিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলেই জানিতে পারে, কারণ দণ্ডনীতির প্রতিপাদ্যবিষয়গুলি অলৌকিক নহে, তাহা লৌকিক। মাত্র লৌকিক বিষয়গুলি জানিবার জন্য, শাস্ত্রের অপেক্ষা নাই। অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। যেমন শোয়া বসা খাওয়া প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারগুলি জানিবার জন্য কাহারও শাস্ত্রের অপেক্ষা হয় না, অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারাই সকলে বুঝিয়া থাকে, এইরূপ দণ্ডনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও শাস্ত্রের উপদেশ ব্যতীতই সকলে বুঝিতে পারিবে। মেধাতিথির এই সমস্ত উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় পারলৌকিক বিষয় জানিবার জন্যই মাত্র শাস্ত্রের অপেক্ষা, ইহলোকে অপেক্ষিত বস্তুর জ্ঞানের জন্য শাস্ত্রের অপেক্ষা নাই। মেধাতিথির এই উক্তি, জয়ন্তভট্টের উক্তিরই অনুরূপ। এমন একসময় ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, যে সময়ে সমস্ত পুরুষার্থের রক্ষক ও আশ্রয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতি ভারতীয় পণ্ডিতগণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা মহাভারত ও রামায়ণের উক্তির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি যে, দণ্ডনীতিশাস্ত্র সর্ব্ববিদ্যার অবলম্বন, ইহার বিনাশেই সর্ব্বনাশ। যাহাহউক, মেধাতিথি তাঁহার ভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন যে, যদিও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই সকলে বুঝিতে পারে, তথাপি দণ্ডনীতিশাস্ত্র পড়া উচিত। দণ্ডনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অজ্ঞজনের বোধ ও বিজ্ঞজনের সংবাদ হইয়া থাকে। সুতরাং অবুধজনের বোধনের জন্য এবং বুধজনের সংবাদের জন্য, দণ্ডনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র যে অনায়াসবোধ্য নহে—তাহা আমরা আজ বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিতেছি। কত সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার একখানিও সমীচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয় নাই। আর প্রাচীনব্যাখ্যার অভাবে এই গ্রন্থ, অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়াছে। এই শাস্ত্রের রহস্যাবধারণ, দূর হইতেও সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয়ের নিরূপণ যদি এত সহজেই হইত, তবে ইহার বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখা যাইত এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্য ব্যতীতও আমরা অনায়াসে এই শাস্ত্রের অর্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতাম। এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র ভারতীয় জনতার হৃদয় হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এজন্য এইশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয় লইয়া আলোচনা করেন ও ভারতের দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিনকে আরও শোচনীয় করিয়া তোলেন।

এস্থলে আমাদের বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ৭ম শতকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি হর্ষবর্দ্ধন ভারতে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সভায় মহাকবি বাণভট্ট স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব প্রভাবে আদৃত হইয়াছিলেন। এই মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গদ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাদম্বরীর প্রথমভাগে শুকনাশের উপদেশ অতি প্রসিদ্ধ। মন্ত্রী শুকনাশ যুবরাজ চন্দ্রাপীড়কে অনেক বহুমূল্য উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উপদেশ বাক্যগুলি কবিত্বছটায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু এই সমুজ্জ্বল উপদেশ বাক্যের মধ্যেই এমন কতগুলি কথা আছে, যাহাতে বুঝিতে পারা যায়—মহাকবি বাণভট্টের সময়ে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মন্ত্রী শুকনাশ বলিতেছেন—যাহাদের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই প্রমাণ—যে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে অতি নৃশংসপ্রায় উপদেশসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, এই শাস্ত্রের অনুবর্ত্তিগণের অকার্য্য কি থাকিতে পারে? এই শাস্ত্রানুসারে অভিচারক্রিয়ানিপুণ ক্রূরপ্রকৃতি পুরোহিতগণই রাজার গুরু হইবেন। অন্যের নিগ্রহচিন্তায় নিরত মন্ত্রিগণই রাজার উপদেষ্টা হইবেন। অতি সহস্র নরপতিগণকর্ত্তৃক ভুক্ত ও পরিত্যক্ত রাজলক্ষ্মীতে রাজার আসক্তি

উৎপাদন করা হইবে। শত্রুবিনাশের জন্যই রাজা শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন এবং স্বাভাবিক প্রীতিসম্পন্ন ভ্রাতৃগণই রাজার উচ্ছেদ্য হইবে।

এই সমস্ত উপদেশ দ্বারা অর্থশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল অবজ্ঞাই প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে, ভারতীয় নরপতিগণের স্বাধীনতার মূল শিথিল করা হইয়াছে। বৈরাগ্যসম্পন্ন রাজা কোনদিনই রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের যে ঐশ্বর্য্য বাণভট্ট দেখিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হর্ষবর্দ্ধনের বৈরাগ্যলব্ধ নহে। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ভারতীয়গণের চিত্তকে বিরক্ত করিতে ইঁহারা সহায়ক হইয়াছিলেন। ৭ম শতকের পূর্ব্বে কোন রাজমন্ত্রীই রাজা বা যুবরাজকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বিতৃষ্ণ করিবার জন্য প্রয়াসী হন নাই। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার আস্বাদ জানিত, তখন তাহাদের চিত্ত কখনও দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বিমুখ হইত না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে অস্বাভাবিকভাবে ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে এক অদ্ভুত ইহকালবৈরাগ্য উদিত হইাছিল, যাহার প্রভাবে বুদ্ধিমান লোকেরাও এইরূপ বৈরাগ্যের সমর্থনই নিজের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—হর্ষবর্দ্ধনের পরে তাঁহার মত প্রতাপশালী অন্য রাজা ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ৭ম শতকের পরে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ পরস্পর বিবাদে রত থাকিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ষষ্ঠ শতকে মহাকবি দণ্ডী যে দশকুমার-চরিত নামক গদ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ৮ম উচ্ছ্বাসে কবি দণ্ডী নীতিশাস্ত্রের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার দণ্ডনীতিশাস্ত্রে নৈপুণ্য কেন আবশ্যক, দণ্ডনীতিশাস্ত্রে পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োগে সুশিক্ষিত না হইলে, রাষ্ট্র কিভাবে বিনষ্ট হয় তাহা মহাকবি দণ্ডী, সুন্দর আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্যবিদ্যাব্যসনী জনগণ দণ্ডনীতিশাস্ত্রে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কিভাবে রাষ্ট্রকে অধঃপতিত করে তাহারও একটি সুন্দর চিত্র এই ৮ম উচ্ছ্বাসে দণ্ডী দেখাইয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন যে, বিদর্ভদেশে পুণ্যবর্ম্মা নামক একজন রাজগুণভূষিত শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। এই রাজা বহুগুণ ভূষিত হইলেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রে রাজার শ্রদ্ধা ছিল না। রাজাকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তবর্ম্মার পিতা পুণ্যবর্ম্মাও মন্ত্রী বসুরক্ষিতকে বহু সম্মান করিতেন। এই মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, তুমি বহুগুণভূষিত এবং তোমার বুদ্ধিও প্রখর। নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি ললিত কলাবিদ্যাতে তোমার অসাধারণতা আছে, তথাপি তুমি দণ্ডনীতি বিদ্যাতে পরিশ্রম কর নাই বলিয়া তোমার বুদ্ধি বিশুদ্ধি-লাভ করিতে পারে নাই, যে রাজা দণ্ডনীতির দ্বারা বুদ্ধি বিশোধন করেন নাই—সে রাজা বুদ্ধিহীন। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে বুদ্ধিহীন রাজা অতি সমৃদ্ধ হইলেও শত্রুরাজগণ কিরূপে তাঁহাকে অবনমিত করিয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারেন না। কোন্ কার্য্যে রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় ও কোন্ কার্য্যে রাষ্ট্রের অকল্যাণ হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। রাষ্ট্রের শুভাশুভ বুঝিতে না পারিয়া দণ্ডনীতি জ্ঞানহীন রাজা যে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন সেই সমস্ত কার্য্যে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় জনগণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় জনগণ দ্বারা অবজ্ঞাত রাজার কোন আদেশই প্রজাগণের কল্যাণসাধন করিতে পারে না। নীতিজ্ঞানহীন রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রজারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে। আর তাহাতে রাষ্ট্রের স্থিতি বিপ্লুত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবাসী জনগণ যখন মর্য্যাদাশূন্য হইয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারা নিজেদের ও রাজার ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। দণ্ডনীতি লোকযাত্রার প্রদীপ। এই দণ্ডনীতি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে লোকযাত্রা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং দূরবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহেরও স্বরূপ অবলোকন করিবার নিমিত্ত এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রই অপ্রতিহত চক্ষু। এই নীতিচক্ষু বিবর্জ্জিত রাজা বিশাল চর্ম্মচক্ষুযুক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় বিষয় অবধারণ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে অন্ধই বলা হয়; অতএব হে রাজকুমার! তুমি নৃত্য-গীতাদি বিদ্যাতে অতিশয়িত রুচি পরিত্যাগ করিয়া তোমার

কুলবিদ্যা দণ্ডনীতি অভ্যাস কর। এই বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তদনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে রাজশক্তির বৃদ্ধি হইবে, কোন স্থলেই তোমার পরাজয় হইবে না এবং তুমি চিরকাল পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকিতে পারিবে।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিত নূতন রাজা অনন্তবর্ম্মাকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—এইরূপ উপদেশ প্রসিদ্ধ কাব্য কাদম্বরী গ্রন্থেও যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি বৃদ্ধ মন্ত্রী শুকনাশ করিয়াছিলেন। শুকনাশের উপদেশ হইতে কিয়দংশ আমরা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই দুইটি উপদেশের বিশেষ বৈলক্ষণ্য এই যে, ৬ষ্ঠ শতকের কবি দণ্ডী, মন্ত্রীর উপদেশে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ৭ম শতকের কবি বাণভট্ট শুকনাশের উপদেশে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে আজ পর্য্যন্তও ভারতে দণ্ডনীতি শাস্ত্র অবজ্ঞাতই রহিয়াছে এবং ভারতীয় জনতার হৃদয় হইতে রাষ্ট্রীয় চেতনা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এস্থলে বিশেষ দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে মহীশূর ষ্টেটের লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান শাম শাস্ত্রী ৰি, এ, মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সম্পাদন করিযাছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে, দণ্ডী অর্থশাস্ত্রে অত্যন্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। (শামশাস্ত্রীবিরোচিত কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা পৃঃ ৬-৭)। 'দশকুমার চরিতে'র ৮ম উচ্ছ্বাসের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবি দণ্ডী অর্থশাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিতের উপদেশে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এস্থলে বিশেষভাবে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। রাজার চাটুকার 'বিহারভদ্র' রাজাকে বিলাস ব্যসনে ডুবাইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অসৎ কথা বলিয়াছিল তাহাতেই দণ্ডনীতির নিন্দা হইয়াছে। বাক্যের বক্তা ও বোদ্ধব্য নিরূপণ না করিয়া কেবলমাত্র গ্রন্থে আছে—এই মনে করিয়াই যদি তাহাতে গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা হয়, তবে রামায়ণাদি গ্রন্থেও বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণের দুষ্কার্য্যে তাৎপর্য্য নিরূপিত হইবে। যেমন রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে মহাপার্শ্ব রাবণকে বলিতেছেন,—হে রাক্ষসরাজ! তুমি বৈদেহীর সহিত নির্ব্বাধে ক্রীড়া কর, তোমার সহিত ক্রীড়া করিতে সীতা সম্মতা না হইলে তুমি বলপূর্ব্বক কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পুনঃ পুনঃ সীতাকে আক্রমণ করিয়া ভোগ কর। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে বাল্মীকি পরস্ত্রীধর্ষণে পরামর্শ দিতেছেন? এই বাক্যের বক্তা দুষ্ট রাক্ষস মহাপার্শ্ব ও শ্রোতা মহাক্রূর বুদ্ধি রাক্ষসরাজ রাবণ, এস্থলে সদ্‌বৃত্তি আলোচিত হইলে—সজ্জন ও দুর্জ্জনের কোন প্রভেদই থাকিত না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বিভ্রান্তির স্থলগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এস্থলে দেখাইতেছি, আর তাহাতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, মহাপার্শ্ব যেমন রাবণকে উপদেশ করিয়াছিল এইরূপ বিহারভদ্রও অনন্তবর্ম্মাকে উপদেশ করিয়াছিল। বিহারভদ্রের উপদেশেই দণ্ডনীতির নিন্দা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তবর্ম্মা যদি তাঁহার পিতার মত রাজগুণভূষিত রাজা হইতেন—তবে বিহারভদ্রের কি উপায় হইত? তাঁহার স্থান হইত কোথায়? বড়লোককে ডুবাইতে না পারিলে তাঁহার দুষ্ট পারিষদগণ অর্থ উপার্জ্জন করিবে কিরূপে? চিরকালই একই নীতি চলিয়া আসিতেছে, প্রবল নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই চাটুকারের উদ্ভাবিত মোহে মুগ্ধ হন না, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোক—এই চাটুকারগণের তোষামোদে চিরকালই ডুবিয়াছে, এখনও ডুবিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ডুবিবে।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বসুরক্ষিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া নূতন রাজা অনন্তবর্ম্মা বলিয়াছিলেন যে,—আপনি আমার গুরুস্থানীয়; আপনি উপযুক্ত উপদেশ করিয়াছেন। আপনার উপদেশানুসারে আমি কার্য্য করিব। এইরূপ বলিয়া নূতন রাজা অনন্তবর্ম্মা অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং অন্তঃপুরে যাইয়া কথাপ্রসঙ্গে অন্তঃপুরস্থিত প্রমদাগণের নিকটে এই বৃদ্ধমন্ত্রীর উপদেশের কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা যখন প্রমদাগণের নিকট মন্ত্রীর উপদেশের কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই সময় রাজার অন্তঃপুরচারী চাটুকার এবং রাজার চিত্ত প্রসাদন দ্বারাই

জীবিকানির্ব্বাহকারী এবং রাজার অন্তরঙ্গ বলিয়া খ্যাত হওয়ায় রাজমন্ত্রিগণের নিকট হইতেও উৎকোচগ্রহণে অভ্যস্ত এবং রাজার সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির শিক্ষক এবং রাজার কাম-বিলাসের পথ-প্রদর্শক বিহারভদ্র নূতন রাজার অন্তঃপুর সেবক, মৃদু হাস্য করিয়া রাজাকে বলিল—মহারাজ! যদি কেহ দৈবানুগ্রহপ্রযুক্ত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়, তবে তাহাকে ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্য দ্বারা বিড়ম্বিত করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক—যাহারা বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত—তাহারা ধনী ব্যক্তির পরলোকে পরম কল্যাণ লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া তাহার শিরোদেশ মুণ্ডনপূর্ব্বক কুশরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া কৃষ্ণাজিন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া নবনীত দ্বারা তাহার গাত্র আলেপনপূর্ব্বক তাহাকে অনশনে রাখিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে দীক্ষা সংস্কার বলা হইয়াছে এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। 'বিহারভদ্র' বেদজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণকে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

বিহারভদ্র আবার বলিতেছে যে, এই সমস্ত ধূর্ত্ত ঋত্বিক্‌গণ হইতেও ঘোরতর প্রবঞ্চক আছে, যাহারা ধনবান্‌গণের উৎকট পরলোক আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া ধনবান্ ব্যক্তিগণকে তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া এমন কি তাহাদের শরীর পর্য্যন্তও ত্যাগ করাইয়া থাকে। যদি বা কেহ সৌভাগ্যক্রমে এই সমস্ত প্রবঞ্চক দ্বারা প্রবঞ্চিত না হয়, তবে অন্য কতকগুলি প্রবঞ্চক সেই ধনী ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রবঞ্চনা করে যে, মহাশয়! আমি একটি পয়সাকে লক্ষ পয়সা করিয়া দিতে পারি। বিনা শস্ত্রাঘাতে সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করিতে পারি। আমি একজন অসহায় ব্যক্তিকেও চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ করিয়া দিতে পারি। যদি আপনি আমার উপদেশমত কার্য্য করিতে পারেন, তবে অনায়াসে পৃথিবীর সম্রাট্ হইতে পারিবেন। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন আপনার উপদিষ্ট উপায়টি কি? তখন এই সমস্ত ধূর্ত্তগণ বলে যে, মহাশয়! চারিটি বিদ্যা আছে—ত্রয়ী, বার্ত্তা, আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতি। এই চারিটী বিদ্যার মধ্যে প্রথম তিনটি মন্দ ফল, এজন্য ঐ তিনটি বিদ্যার প্রয়োজন নাই। আপনি দণ্ডনীতি অধ্যয়ন করুন। এই বিদ্যা আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্ত মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের জন্য ছয় হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করিয়াছেন। এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হওয়া যায়। যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ প্রবঞ্চকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয় তবে সেই প্রবঞ্চিত ব্যক্তি দণ্ডনীতির অধ্যয়নে ও শ্রবণেই জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন কোনও কালেই পূর্ণ হইতে পারে না, এজন্য সমস্ত জীবন এই শাস্ত্র শ্রবণেই কাটিয়া যায়। দণ্ডনীতিশাস্ত্র, শাস্ত্রান্তরের সহিত সংবদ্ধ। সর্ব্বশাস্ত্র না জানিয়া এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র যথার্থ অবগত হওয়া যায় না। শাস্ত্র গ্রহণেই যদি জীবন কাটিয়া যায়, তবে আর চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইবে কবে। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়, তথাপি সেই অভিজ্ঞ শাস্ত্রার্থ পুরুষের দশা কি হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইলে প্রথমতঃই তাহার স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিবে। এই ব্যক্তি অন্যের জন্য ত বটেই নিজের জন্যও সে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে যে, এই পরিমাণ তণ্ডুল দ্বারা এই পরিমাণ অন্ন প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ একজনের আহারের জন্য কতটা চাল লাগে, কত ভাত পাক করিতে কি পরিমাণ কাঠ লাগে ইহার সূক্ষ্ম পরিমাণ অবধারণ পূর্ব্বক সে পরের জন্য ও নিজের জন্য ব্যবস্থা করিবে।

দণ্ডনীতিবিদ্ রাজা রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন প্রকারে মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য উদরস্থ করিয়া অধিকারী পুরুষগণের নিকট হইতে সমস্তদিনের আয় ও ব্যয় অবগত হইবেন। এই কথাগুলি কৌটিল্য শাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের ১৯শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কৌটিল্য যাহা বলিয়াছেন—বিহারভদ্র তাহকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া এস্থলে বলিয়াছে। অবশ্য বিহারভদ্র রাজার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই এরূপ বলিয়াছেন। ইহার পর বিহারভদ্র বলিয়াছিল,—যিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার বহু দুর্দ্দশা হইবে। দিবসের প্রথমভাগে রাজা যখন এই আয়ব্যয়ের হিসাব শ্রবণ করেন, তখন সেই রাজার ধূর্ত্ত অধ্যক্ষবর্গ, রাজা

আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া যে পরিমিত অর্থ রক্ষা করিবেন, তাহার দ্বিগুণ তাহারা অপহরণ করিয়া থাকে। চাণক্য অর্থাহরণের উপায় ৪০ প্রকার বলিয়াছেন, কিন্তু রাজার ধূর্ত্ত অধ্যক্ষবর্গ স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা তাহার সহস্র প্রকার কল্পনা করিয়া অর্থ অপহরণের সুযোগ করিয়া থাকে।

দিবসের দ্বিতীয় ভাগে রাজা পরস্পর বিবাদমান প্রজাগণের ব্যবহার দর্শন করিবেন। (ইহাই দেওয়ানী ফৌজদারী বিচার) বিবাদমান প্রজাগণের নানাবিধ উক্ততে দগ্ধকর্ণ হইয়া রাজা কষ্টে জীবনধারণ করেন, ইহাতেই শেষ নহে,—প্রজাগণের এই ব্যবহারেও প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি বিচারকবর্গ নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিবাদমান ব্যক্তিগণের জয়পরাজয়ের নির্দ্দেশ করিয়া পাপ ও অকীর্ত্তি দ্বারা রাজাকে ডুবাইয়া থাকেন ও নিজেরা প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া থাকেন।

দিবসেয় ৩য় ভাগে রাজা স্নান-ভোজনের অবকাশ পাইয়া থাকেন। রাজার ভোজনও এমন চমৎকার যে, রাজার ভক্ষিত অন্নের যে পর্য্যন্ত পরিপাক না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বিষভয় নিবৃত্ত হইবে না, বিষমিশ্রিত অন্ন খাওয়াইয়া রাজাকে বধ করিবার জন্য অনেকেই উদ্যুক্ত।

দিবসের ৪র্থ ভাগে ভোজনের পর বিশ্রান্ত রাজা, প্রজাগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ধন গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া উত্থিত হইবেন।

দিবসের ৫ম ভাগে মন্ত্রিগণের সহিত নানাবিধ মন্ত্রণা চিন্তাদ্বারা রাজা মহাক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। রাজার ইহাতেই নিস্তার নাই। মন্ত্রিগণ রাজার স্বার্থে উদাসীন থাকিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে রাজাকে দোষ ও গুণ বুঝাইয়া থাকেন। অর্থাৎ দোষকে গুণরূপে আর গুণকে দোষরূপে বুঝাইয়া থাকেন। এইরূপে রাজার সাধ্য কার্য্যকে অসাধ্যরূপে ও অসাধ্য কার্য্যকে সাধ্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। যে দেশে ও যে কালে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা অকর্ত্তব্যরূপে ও অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্যরূপে বিপরিবর্ত্তিত করিয়া মন্ত্রিবর্গ রাজার স্বমণ্ডল, মিত্রমণ্ডল ও শত্রুমণ্ডল হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রিমণ্ডল এইরূপ দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও রাজাকে ক্ষমা করেন না। এই মন্ত্রিমণ্ডল রাজার স্বকীয় রাজ্যে প্রজামণ্ডলের মধ্যে গুপ্তভাবে রাজবিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া এবং শত্রু ও মিত্র রাজগণকেও গুপ্তভাবে রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যে এই মন্ত্রিগণ যেন ঐ বিদ্বেষ প্রশমন করিবার জন্যই ব্যাপৃত আছেন এইরূপ দেখাইয়া রাজাকে নিজেদের হাতের মুঠার মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করেন।

দিবসের ৬ষ্ঠ ভাগে রাজা স্বেচ্ছায় বিহারাদি করিবেন, অথবা মন্ত্রণাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। রাজার এই যে বিহারের কথা বলা হইয়াছে তাহাও পৌনে চারিদণ্ড মাত্র।

দিবসের ৭ম ভাগে চতুরঙ্গ সেনার প্রত্যবেক্ষণ ও তাহার গুণদোষাদি বিচারে রাজার ক্লেশ অনুভবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দিবসের ৮ম ভাগে সেনাপতির সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ যুদ্ধ চিন্তায় রাজার ক্লেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিবাভাগকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের কর্ম্মব্যবস্থা প্রদর্শিতরূপে বলা হইয়াছে। দিনের অষ্টম ভাগের অবসানে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া রাত্রির প্রথম ভাগে গুপ্তচরদিগের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। গুপ্তচরের মুখে শুনিয়া তদনুসারে শস্ত্র, অগ্নি, বিষ এবং প্রণিধিগণের ব্যবস্থা করিবেন.

রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে ভোজনানন্তর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবেন।

রাত্রির তৃতীয় ভাগে নানাবিধ বাদ্যধ্বনির অনন্তর নিদ্রিত হইবেন।

রাত্রির চতুর্থ ও পঞ্চমভাগে রাজা নিদ্রিত থাকিবেন। রাজার এই যে নিদ্রার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও অতিশয় ক্লেশপ্রদ্। কারণ, যে রাজা প্রভাতকাল হইতে রাত্রির দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত নানাবিধ চিন্তা ও আয়াসে ব্যাকুলিতচিত্ত থাকেন তাঁহার এই সময়ে নিদ্রা-সুখলাভ যে দুর্লভ হইবে তাহাতে কোন বক্তব্যই নাই।

রাত্রির ষষ্ঠ ভাগে রাজা জাগ্রত হইয়া একাকী শাস্ত্র চিন্তা ও রাজকার্য্য চিন্তা করিবেন।

রাত্রির ৭ম ভাগে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ও নানা দেশে দূত প্রেরণ করিবেন। এই ধূর্ত্ত দূতগণ রাজার নিকটে ও শত্রু রাজগণের নিকটে তাহাদের অনুকূল কথা বলিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে, ইহারা এতই ধূর্ত্ত যে ইহাদের প্রদর্শিতরূপে অর্জিত অর্থে কোন রাজ শুল্ক দিতে হয় না এবং ইহারা এমন চতুরতার সহিত উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি করে যাহাতে কোন রাজশুল্ক লাগে না। এই দূতগণ এইরূপ ধূর্ত্ত যে ইহাদের করণীয় কোন কার্য্য না থাকিলেও কোন সামান্য কার্য্যের উদ্ভাবন করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং রাজার নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করে।

রাত্রির ৮ম ভাগে অর্থাৎ প্রত্যূষ সময়ে প্রবঞ্চক পুরোহিতগণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলে—অদ্য রাত্রে আমি রাজার প্রতিকূল বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, কেহ বা বলে রাজার গ্রহসন্নিবেশ বড়ই অনিষ্টকর। আবার কেহ বলে—রাজার অশুভসূচক দুর্নিমিত্ত সমূহ দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত অশুভের শান্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক, এই শান্তি কার্য্যে যে হোম করিতে হইবে তাহাতে সমস্তই সুবর্ণনির্ম্মিত দ্রব্য আবশ্যক। সুবর্ণনির্ম্মিত দ্রব্য সমূহের দ্বারা শান্তি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। এই শান্তি কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মার সদৃশ গুণবৎ ব্রাহ্মণসকল পাওয়া গিয়াছে, ইঁহারা শান্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যে বিশেষ শুভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা সকলেই অতি দরিদ্র, বহু সন্ততিযুক্ত এবং বীর্য্যবান্ যাজ্ঞিক,—ইঁহারা আজ পর্য্যন্ত কোন স্থান হইতে প্রতিগ্রহ করেন নাই। ইঁহাদিগকে যে সমস্ত ধন দেওয়া হইবে তাহাতে রাজার স্বর্গলাভ আয়ুবৃদ্ধি এবং অশুভ বিনাশ হইবে। দুষ্ট পুরোহিতগণ রাজাকে প্রবঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুধন দেওয়াইয়া থাকে এবং ঐ ধন গোপনে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুরোহিতেরা আত্মসাৎ করে। এইরূপে দিবাভাগে ও রাত্রিভাগে রাজার কার্য্যক্রম ব্যবস্থিত হওয়ায় রাজার সুখলেশেরও সম্ভাবনা থাকে না এবং সর্ব্বদা কষ্টের বাহুল্যই থাকে এবং রাজা সর্ব্বদা বিড়ম্বিতই হইতে থাকেন। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে প্রবীণ রাজা এইরূপ বিড়ম্বনায় কালযাপন করিলে তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তিতা লাভ ত হইবেই না তাঁহার নিজের রাজ্যটুকুও রক্ষিত থাকিবে না। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা যাহাকে দান করেন অথবা যাহাকে সম্মানিত করেন ও যাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন—এ সমস্তই রাজার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ইহাই লোকে বুঝিয়া থাকে, আর তাহাতে কাহারও রাজার প্রতি বিশ্বাস থাকে না। যিনি সকলের অবিশ্বাস্য তাঁহাতে অলক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করে। সুতরাং দণ্ডনীতি শাস্ত্র অধ্যয়নের কোনও আবশ্যকতা নাই। যতটুকু নীতি অবলম্বন না করিলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, তাহা লোকব্যবহার দ্বারাই জানা যায়। যাহা লোকব্যবহার দ্বারা জানা যায়—তাহার জন্য শাস্ত্রের কোন আবশ্যকতা নাই। স্তন্যপায়ী শিশুও নানা উপায়ে মাতার স্তন পান করিয়া থাকে, এই উপায় উদ্ভাবনের জন্য শিশুকে কোন শাস্ত্র পড়িতে হয় না; সুতরাং হে মহারাজ! আপনি অতি দুঃখপ্রদ দণ্ডনীতি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান ও প্রয়োগের কথা ছাড়িয়া দিয়া যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুন।

যে সমস্ত নীতিবিদ্গণ উপদেশ করিয়া থাকেন, এইরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে—এইরূপে কাম ক্রোধাদি অরিষড়্বর্গ ত্যাগ করিতে হইবে—সামদানাদি উপায়বর্গ স্বকীয় মণ্ডলে ও পরমণ্ডলে সর্ব্বদা প্রয়োগ

করিতে হইবে—সন্ধিবিগ্রহাদি চিন্তা দ্বারাই কালযাপন করিতে হইবে—নিজের সুখের জন্য অল্পকালও ব্যয়িত করা উচিত নয়—এই সমস্ত বকধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ রাজগণের নিকট হইতে চৌর্য্য দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া বেশ্যাগৃহেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত বকধূর্ত্ত মন্ত্রিগণের উপদেশ শ্রোতব্যই নহে। রাজাকে উপদেশ করিবার কি যোগ্যতা ইহাদের আছে? যাহারা এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রণেতা—শক্র, বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ (উমাপতি শঙ্কর), বাহুদন্তীপুত্র (ইন্দ্র) ও পরাশর প্রভৃতি ইঁহারাই কি অরিষড়্বর্গজয় করিয়াছিলেন? ইঁহারাও কি দণ্ডনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? ইঁহাদের প্রারব্ধ কার্য্যেও ত কোনস্থলে সিদ্ধি ও কোনস্থলে অসিদ্ধি দেখা গিয়াছে। এইরূপও ত বহু দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা দণ্ডনীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহারাও যাঁহারা দণ্ডনীতির ধার ধারে না তাঁহাদের দ্বারা বহুস্থানে পরাজিত হইয়াছেন। সুতরাং রাজ্যরক্ষার জন্য দণ্ডনীতির আবশ্যকতা কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে।

আমার মতে আপনার পক্ষে ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, আপনি শ্রেষ্ঠবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার নূতন রাজ্য, সুন্দর দেহ, অসীম ঐশ্বর্য্য, এই সমস্ত স্বরাষ্ট্র চিন্তা ও রিপুচিন্তা দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে, এই স্বরাষ্ট্র চিন্তা ও শত্রু সচিন্তা দ্বারা আপনার সকলের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিবে ও আপনি সকলের অবিশ্বাস্য হইবেন। আপনার সুখোপভোগ থাকিবে না এবং রাষ্ট্রচিন্তার বহুবিধ সংশয় দ্বারা সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রচিন্তাস্রোত বহুবিধ এবং তাহাতে কোন স্থলেই নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আপনার দশ সহস্র হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব এবং অনন্ত পদাতি সৈন্য রহিয়াছে। সুবর্ণরত্নাদি দ্বারা আপনার কোষাগার পরিপূর্ণ; সমস্ত জীবলোক যদি সহস্র যুগও ভোগ করে, তথাপি আপনার কোষ্ঠাগার রিক্ত হইবে না (ধান্যাদি সঞ্চয়ের স্থানকে কোষ্ঠাগার বলে)। আপনার এই বিশাল রাজ্য কি আপনার নিকট অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে যে জন্য আপনি অন্যের রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন? মানুষের জীবন অতি অল্পস্থায়ী তাহাতেও আবার ভোগযোগ্য কাল অল্প। মূর্খেরাই কেবল ধনার্জ্জন করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহারা স্বোপার্জ্জিত অর্থের অল্প মাত্রও ভোগ করিতে পারে না। এ বিষয়ে আপনাকে আর অধিক কি বলিব, আপনি আপনার রাজ্যভার আপনার অন্তরঙ্গ আপনার প্রতি ভক্তিমান্ ও রাজ্যভার বহনক্ষম মন্ত্রিবর্গের উপর ন্যস্ত করিয়া অপ্সরাগণ সদৃশ অন্তঃপুর কামিনীগণের সহিত রমণ করুন। গীত, সঙ্গীত এবং পানগোষ্ঠীতে রত থাকিয়া শরীর লাভ সফল করুন। এই বলিয়া ধূর্ত্ত কুমারসেবক বিহারভদ্র, রাজাকে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিল এবং অনুকূল উপদেশ শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ললোচন অন্তঃপুর কামিনীবর্গ হাস্য করিতে লাগিল। তখন রাজা স্মিতমুখে বিহারভদ্রকে বলিলেন, আপনি উঠুন উঠুন, প্রদর্শিতরূপে হিতোপদেশ করায় আপনি আমার গুরু। আপনি গুরুজনের বিরুদ্ধ কার্য্য মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন কেন? এইরূপ রাজা বিহারভদ্রকে উঠাইয়া ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইলেন। বিহারভদ্রের এই কথাগুলির অভিপ্রায় সুস্পষ্ট, ইহাতে দণ্ডনীতিশাস্ত্র অবজ্ঞাত হয় নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে (২১ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবল। ইহার টীকাতে মিতাক্ষরাকার অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধের উদাহরণ দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, হিরণ্য ও ভূমি লাভ হইতে মিত্রলাভ শ্রেষ্ঠ। ইহা অর্থশাস্ত্রের কথা। এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ে ৩৫২ শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—রাজা, লোভ ও ক্রোধবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন। এই শ্লোকটি ব্যবহারাধ্যায়ের ১ম শ্লোক। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, রাজা বাদীপ্রতিবাদীর ব্যবহার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যদি দেখেন বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে একজনের জয় নির্ণয় করিলে তাহাতে আমার মিত্র লাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষিত হয় না এবং অপরের জয়াবধারণ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু মিত্রলাভ হয় না—এস্থলে অর্থশাস্ত্রানুসারে যাহার জয়াবধারণ করিলে রাজার মিত্রলাভ হয় তাহাই কর্ত্তব্য কিন্তু যেরূপ বিচার করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষিত হইবে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহাই কর্ত্তব্য।

এস্থলে মিতাক্ষরাকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সঙ্গত নয়। প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, আচারাধ্যায়ের রাজধর্ম্মপ্রকরণে পঠিত হিরণ্য ভূমি লাভাদি বচনকে মিতাক্ষরাকার অর্থশাস্ত্র বুঝিলেন কিরূপে? এই রাজধর্ম্মপ্রকরণে ৩৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যে রাজা শাস্ত্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক লোভাদি দ্বারা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন সেই রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি ও লোক বিনষ্ট হইয়া থাকে, সম্যক্ দণ্ডই স্বর্গ কীর্ত্তি ও লোক রক্ষক। মিতাক্ষরাকারের মতে যদি রাজধর্ম্মপ্রকরণ অর্থশাস্ত্রই হয় তবে সে অর্থশাস্ত্রেও তো মিত্রলাভের জন্য রাজা স্বেচ্ছায় একজনের জয় ও অপরের পরাজয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। অর্থশাস্ত্রানুসারে ব্যবহারের অর্থ কি রাজার যাদৃচ্ছিক ব্যবহার? রাজা নিজের সুবিধা দেখিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, ইহাই কি অর্থশাস্ত্র? মিতাক্ষরাসম্মত অর্থশাস্ত্রে কি তাহাই বলা হইয়াছে? মিতাক্ষরাকার "হিরণ্যভূমিলাভেভ্যঃ" এই যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এই বচনের শেষভাগটি তিনি উদ্ধৃত করেন নাই। তাহাতে বলা হইয়াছে "রক্ষেৎ সত্যং সমাহিতঃ" এই অংশের ব্যাখ্যাতেও মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন—রাজা সাবধান হইয়া সত্য রক্ষা করিবেন, রাজার মিত্রলাভের মূলই সত্য পরিপালন। সুতরাং যে রাজা অসত্য ব্যবহার দ্বারা মিত্রলাভের প্রয়াস করেন, সে প্রয়াস ব্যর্থই হইবে, মিত্রলাভ হইবে না, অধর্ম্মানুসারে ব্যবহার দ্বারা মিত্রলাভ হয় না। কেবল যে মিত্রলাভই হয় না, তাহা নহে, অধর্ম্ম ব্যবহারে স্বর্গ কীর্ত্তি ও লোক—তিনই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে মিতাক্ষরাকার ব্যবহার অধ্যায়ের বচনটিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই বা অভিপ্রায় কি হইবে?

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে যে রাজধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সে স্থলেও ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, মনুসংহিতাতে যে সমস্ত রাজধর্ম্ম বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে। মেধাতিথির কথা যদি স্বীকার করা যায়, তবে যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতিতেও যে রাজধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অবিরুদ্ধই বলা উচিত। কিন্তু মিতাক্ষরাকার তাহা মনে করেন নাই।

যাহা হউক, অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ দেখাইবার জন্য মিতাক্ষরাকার যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। মিতাক্ষরাকার যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির কোন অংশ অর্থশাস্ত্র ও কোন অংশ ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ মনে করিয়াছেন—এরূপ মনে করিবার হেতু কি? যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অর্থশাস্ত্র হইল কিরূপে? রাজধর্ম্ম থাকিলেই কি তাহা অর্থশাস্ত্র? ধর্ম্মশাস্ত্রে কি রাজার স্থান হইতে পারে না? রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ থাকিলেই তাহা অর্থশাস্ত্র হইবে? রাজবৃত্তনিরপেক্ষ ধর্ম্ম থাকিবে ত? অনুবিধেয়কে বাদ দিয়া ব্যবহার সম্ভাবিত হয় কি? ভাষ্যকার মেধাতিথিও ত রাজধর্ম্মনিরূপক মনুর ৭ম অধ্যায়কে অর্থশাস্ত্র বলিতে সাহস করেন নাই। আমাদের মনে হয় মিতাক্ষরাকার অর্থশাস্ত্রের আলোচনাই করেন নাই। আরও বিশেষ কথা এই যে—"হিরণ্যভূমি লাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্বরা যতঃ। অতো যতেত তৎপ্রাপ্তৌ রক্ষেৎ সত্যং সমাহিতঃ।" (৩৫২ শ্লোক আচার অধ্যায়) এই শ্লোকটি কি—চতুষ্পাদ্‌ব্যবহার প্রকরণের কথা? ইহা তো রাজা স্বকীয় বৃদ্ধির জন্য যখন পররাষ্ট্র আক্রমণ করেন—সেই পররাষ্ট্র আক্রমণ দ্বারা রাজার হিরণ্যলাভ, ভূমিলাভ ও মিত্রলাভ হইয়া থাকে, আক্রান্ত নরপতি স্বরক্ষার জন্য আক্রমণকারী নরপতিকে হিরণ্য ও ভূমি প্রদান প্রভৃতি করিয়া থাকেন এবং কোনস্থলে আক্রমণকারী নৃপতি দ্বারা আক্রান্ত নৃপতি সাধু ব্যবহৃত হইলে মিত্রও হইয়া থাকেন। এই স্থলেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পররাষ্ট্র হইতে হিরণ্য ও ভূমি প্রভৃতি পাইলে রাজার তত বৃদ্ধি হয় না—যত বৃদ্ধি হয় পররাষ্ট্র নৃপতিকে মিত্ররূপে পাইলে, এজন্য রাজা মিত্রবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। সাময়িক হিরণ্যাদি লাভই রাজার বড় কথা নয়—ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ। মিতাক্ষরাও তাহাই বলিয়াছেন, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ দেখাইতে যাইয়া মিতাক্ষরাকার নিজের ব্যাখ্যারই বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

আর যে ৯ম শতকের ভাষ্যকার মেধাতিথি রাজধর্ম্মপ্রতিপাদক মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়কে ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ রাজধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ৭ম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে, রাজা আপনার অধিকৃত দেশে ন্যায়ানুসারী হইবেন এবং শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করিবেন। শত্রুরাষ্ট্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ডের বিধান কি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত? যদি অনুমোদিত হয় তবে অর্থশাস্ত্রই বা ইহা অপেক্ষা অধিক কি বলিতেন? ৭ম অধ্যায়ের ১৭১ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে, রাজা যখন বুঝিবেন যে, নিজের অমাত্যাদি ও সৈন্যবর্গ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত এবং শত্রু রাজার তাহা বিপরীত তখন সেই রাজ্য রাজা অবশ্য আক্রমণ করিবেন। বিপন্ন শত্রুকে আক্রমণ করা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় হয় তবে অর্থশাস্ত্রেই বা ইহা অপেক্ষা অধিক কি বলা হইবে। ১৯৫ শ্লোকে আবার মনু বলিয়াছেন যে, যখন শত্রুরাজ্য দুর্গাবস্থিত বা অন্যত্র অবস্থিত থাকেন তখন বিজিগীষু রাজা সেই শত্রু রাজাকে সৈন্যাদি দ্বারা ঘিরিয়া রাখিবেন এবং শত্রু রাজার দেশকে উৎসন্ন করিবেন এবং শত্রুর অন্ন, জল, ঘাস প্রভৃতিকে বিষাদি দ্বারা দূষিত করিবেন। এই কার্য্য কি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ? এইরূপ নৃশংস কার্য্যও যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হয়, তবে অর্থশাস্ত্রেই বা ইহার অধিক কি বলা হইয়াছে।

আমরা রামায়ণ ও মহাভারতে রাজধর্ম্ম প্রকরণে যে বিংশতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রাজ্যরক্ষণের অযোগ্য ও বিপন্ন ২০টি রাজা কখনও সন্ধিযোগ্য হইতে পারেন না। বিগ্রহ দ্বারা ইহাদের উচ্ছেদই বিজিগীষু রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মনুসংহিতাতেও বিংশতিবর্গীয় রাজগণকে বিগ্রহ দ্বারা উচ্ছেদ করিবার কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং মেধাতিথি যে বলিয়াছেন ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ রাজধর্ম্মই মনুসংহিতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে—ইহা আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি, কাত্যায়নের একটি বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজা অর্থশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—ইহার অভিপ্রায় কি? রাজাও যদি অর্থশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত না হন, তবে অর্থশাস্ত্র কাহার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে? আমরা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি হইতেও কাত্যায়নবচনের অনুরূপ বচন দেখাইয়াছি এবং যাজ্ঞবল্ক্যটীকা মিতাক্ষরাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি।

বস্তুত কথা—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চারটি বিদ্যার ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন—"ইমা শ্চতস্রো বিদ্যাঃ পৃথকপ্রস্থানাঃ প্রাণভৃতাম্ অনুগ্রহায়োপদিশ্যন্তে" এইরূপ বলিয়াছেন। (ন্যায়ভাষ্য ১|১| ১)। ভাষ্যকারের এই উক্তি দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অর্থশাস্ত্রের বিরোধের সম্ভাবনাই নাই বলা হইয়াছে। চারিটি বিদ্যারই ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন। বিষয় সমান না হইলে বিরোধ হইতে পারে না। যে বিষয় যে শাস্ত্রের মুখ্যতাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত সেই বিষয়েই সেই শাস্ত্র প্রমাণ। যে বিষয় যে শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, সেই বিষয় সেই শাস্ত্রে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইলেও তাহাকে সেই শাস্ত্রেরই বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও "কণ্টকশোধন" প্রভৃতি যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য নহে তাহা অর্থশাস্ত্রের অসাধারণ বিষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের ক্ষত্রিয়বর্ণের কর্ম্ম বলিতে যাইয়া ক্ষত্রিয় নরপতির কর্ম্মও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য বর্ণও পৃথিবী শাসন করিলে, 'কণ্টকশোধনাদি' কার্য্য তাঁহারও অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। রাজ্য পরিপালন কেবল ক্ষত্রিয়েরই কর্ম্ম হইবে, এরূপ বলা যায় না। এইরূপ অর্থশাস্ত্রেও বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অর্থশাস্ত্রের অসাধারণ বিষয় নহে, তাহা প্রসঙ্গক্রমেই বলা হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত শাস্ত্র সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ধর্ম্মস্থীয় অধিকরণে বিবাদ পদনিবন্ধ নামক ১ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, "শাস্ত্রং বিপ্রতিপদ্যেত ধর্ম্মন্যায়েন কেনচিৎ। ন্যায়স্তত্র প্রমাণং স্যাৎ তত্র পাঠোহি নশ্যতি।" ইহার অভিপ্রায় এই

যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের কোন বিরোধ নাই। দণ্ডনীতি শাস্ত্রই ইতর সমস্ত বিদ্যার রক্ষক ও পরিপালক। পরিপালক শাস্ত্রের সহিত পরিপাল্য শাস্ত্রের বিরোধই হইতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন—দণ্ডনীতির অপেক্ষা না করিয়াই ইতর সমস্ত বিদ্যা স্বচ্ছন্দভাবে স্ব স্ব বিষয়ের অনুষ্ঠাপক হইতে পারে, তাঁহারা বোধ হয় এখন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন যে—দণ্ডনীতি হাতছাড়া হইলে ইতর বিদ্যা কেন—দেশের প্রাণীমাত্রও রক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহারা এখনও একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা আর কিছুদিন পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যেদিন ত্রয়ীবিদ্যার উচ্চারণ করিলেই মানুষ দণ্ডার্হ হইবে। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দণ্ডনীতির উচ্ছেদে দেশের কি দশা হইবে—তাহা স্পষ্টভাবে মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিরোধ—বিরোধই নহে। যদি কোন স্থলে ন্যায়ানুসারী অর্থশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্রেরই পাঠ বিপ্লুত হইয়াছে ইহাই কৌটিল্য বাক্যের অর্থ।

মনু সংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে যে রাজধর্ম্ম বলা হইয়াছে তাহা সমস্তই বেদমূলক নহে, কিন্তু প্রমাণান্তরমূলক। রাজার যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবশ্য প্রমাণান্তর দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে—তাহাও এই ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। মেধাতিথি যে প্রমাণান্তর দ্বারা নিরূপিত অর্থের কথা বলিয়াছেন সেই প্রমাণান্তর শব্দ দ্বারা অর্থশাস্ত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অর্থশাস্ত্রেই রাজধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রবল হইবে এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের নিকটে আমাদের বক্তব্য এই যে—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ের অশৌচ প্রকরণের ২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে মহীপতিগণের প্রজাপালন কার্য্যে অশৌচ হইবে না। এইরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত পুরোহিত, অমাত্য প্রভৃতিরও তাঁহাদের অধিকারোচিত কার্য্য নির্ব্বাহে রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের অশৌচ থাকিবে না। পুরোহিতাদির কার্য্যে বিঘ্ন না হউক মনে করিয়া মহীপতি যদি তাঁহাদের অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা সদ্যই শুচি হইবেন, তাঁহাদের অশৌচ থাকিবে না। প্রত্যেক বর্ণের বিশেষ বিশেষ অশৌচ ব্যবস্থা—যেমন ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাঁহারাই যদি মহীপতি হন অথবা মহীপতির মন্ত্রী বা পুরোহিতাদি হন তবে রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহাদের অশৌচ হইবে না—এইরূপ বলা হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত অশৌচকালের বাধা রাজকার্য্যের জন্য স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতে কি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা অর্থশাস্ত্র বাধিত হইল অথবা অর্থশাস্ত্রদ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র বাধিত হইল?

যদি বলা যায় রাজকার্য্যানুরোধে যে সদ্যঃশৌচের বিধান তাহা ত ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিধান। তবে এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অর্থশাস্ত্রের বিধান তবে আর কি হইবে? অর্থশাস্ত্র ত কোনও স্থলে লৌকিক রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অর্থশাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবে—ইহাই ত টীকাকার বলিয়াছেন। রাজকার্য্যের অনুরোধে সদ্যঃশৌচ পরিকল্পনা ইহা কি দৃষ্টমূলক অথবা অদৃষ্টমূলক? রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে লোকের সুবিধা হইবে এই মনে করিয়াই ত মহীপতির রাজকার্য্যে অশৌচ নাই বলা হইয়াছে। উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোকের মিতাক্ষরা টীকাতে প্রচেতার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে—কারু, শিল্পী, চিকিৎসক, দাস, দাসী, রাজা ও রাজভৃত্য, ইহাদের স্ব স্ব অসাধারণ কার্য্যে অশৌচ হইবে না, সূপকারকে কারু বলা হয় এবং চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পী নামে অভিহিত হয়।

এইস্থলে মিতাক্ষরাতে বিষ্ণুস্মৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—রাজকার্য্যে রাজার এবং কারুকার্য্যে কারুকারের অশৌচ হয় না। শাতাতপ স্মৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইছে মূল্যগ্রহণ করিয়া কর্ম্মকর শূদ্র দাসী দাস ইহারা প্রভুর স্নানে প্রভুর শরীর সংস্কারে এবং প্রভুর গৃহ কার্য্যে অশুচি হইবে না।

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন—ইহাদের স্পর্শও প্রভুর অপরিহার্য্য বলিয়া ইহারা অশৌচে অস্পৃশ্য হইবে না। আবার মিতাক্ষরাতে বলা হইয়াছে চিকিৎসক রোগীর যে উপকার করেন, সে উপকার অন্যদ্বারা সম্ভাবিত নহে এজন্য চিকিৎসক সর্ব্বদাই স্পর্শে শুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই যে সমস্ত সদ্যঃশৌচের কথা বলা হইয়াছে ইহা কি সমস্তই পারলৌকিক ফলের জন্য? যাহা ইহলোকের ফলের জন্য, তাহা ত প্রমাণান্তর দ্বারাই জানা যায়। চিকিৎসককে অশুচি মনে করিলে রোগীর যে দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা কি লোকবুদ্ধির গম্য নহে? অর্থশাস্ত্রের অন্বয়ব্যতিরেকগম্য বিধান গুলি ইহা হইতে আর নূতন কি? উদ্ধৃত এই সমস্ত স্থলে অর্থশাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বাধ বুঝিতে হইবে। এই কথাগুলি যে কেবল যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেই আছে তাহা নহে কিন্তু মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে ৯৪-৯৫ শ্লোকেও রাজার ও রাজকর্ম্মচারিগণের স্বীয় অসাধারণ কার্য্যে সদ্যঃশৌচের কথা বলা হইয়াছে। মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে ৯৪ শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে প্রজাসমূহের রক্ষণের জন্য রাজা ও রাজভৃত্যগণের সদ্যঃশৌচ হইবে। মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায় অর্থশাস্ত্র নহে অথচ স্ববর্ণোক্ত অশৌচ না হইয়া রাজকার্য্যের অনুরোধে সদ্যঃশৌচ হইবে। ইহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা অর্থশাস্ত্রের বাধা হইল? এই মনু শ্লোকের ব্যাখ্যাতে স্বর্গীয় ভরত শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাজার সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে যেহেতু রাজা দুর্ভিক্ষে অন্নদান উৎপাতে শান্তি হোমাদি করিয়া জগতের উপকার সাধন করেন। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া সিংহাসনে আরোহণই সদ্যঃশৌচের কারণ জানিবে। স্ববর্ণোক্ত অশৌচ পরিত্যাগ করিয়া প্রজারক্ষণের জন্য রাজা ও রাজভৃত্যগণ সদ্যই শুচি হইয়া থাকেন এরূপ বলায় ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা অর্থশাস্ত্র বাধিত হইয়াছে ত? অর্থশাস্ত্র কি ধূমকেতুর উদয়ের মত প্রজাসংহারক উৎপাত বিশেষ? প্রজারক্ষণের জন্যই ত অর্থশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই মনু শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্টও এই কথাই বলিয়াছেন।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ সঙ্গত মনে করি তাহা এই যে প্রজা পালনে রাজার সদ্যঃশৌচ হইবে বলা হইয়াছে। এই রাজা কেবল ক্ষত্রিয় নহে—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রও যদি মহীপতি হইয়া প্রজাপালন করেন তবে তাঁহাদের সম্বন্ধেও সদ্যঃশৌচই বুঝিতে হইবে। ভারতের চারবর্ণই মহীপতি হইতে পারেন ইহা শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। তথাপি বাঙ্গালী পাঠকবর্গের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এস্থলে কুল্লূকভট্টের টীকার উদ্ধরণ করিলাম। কুল্পূক বলিয়াছেন—"তচ্চ অক্ষত্রিয়াণামপিতৎকার্য্যকারিণাং বিপ্রবৈশ্যশূদ্রাণাং অবিশিষ্টমেব"।—৪৪৫ পৃঃ, বসুমতী সংস্করণ।

যাঁহারা মনে করেন আর্য্যভারতে শূদ্রগণের বড়ই দুর্গতি ছিল তাঁহারা এস্থলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার টীকাকারগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন যে রাজ্যপালনে শূদ্রেরও অধিকার ছিল।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ স্পর্শদোষ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু অত্রিসংহিতার ২৪৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—দেবযাত্রা, বিবাহ, যজ্ঞ ও উৎসবে স্পর্শ দোষ হইবে না। প্রদর্শিত স্থলগুলিতে যে স্পর্শ দোষ হইবে না বলা হইয়াছে ইহাতে কি ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা অর্থশাস্ত্রের বাধ হইল? অত্রিসংহিতার ৩২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—দুর্ভিক্ষে যে অন্নদান করে ও অরণ্যাদি দুর্গম প্রদেশে যে জলদানের ব্যবস্থা করে তাহার স্বর্গ গমন হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষে অন্নদানের অধিক ফল, ইহা কি অন্বয়ব্যতিরেকগম্য নহে? বিষ্ণুস্মৃতির ২২ অধ্যায়ে ৫৩-৫৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে দেশবিপ্লবে ও ঘোর বিপৎকালে সদ্যঃশৌচ হইবে। পরাশর স্মৃতির ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে রাষ্ট্রবিপ্লবে, প্রবাসে, ব্যাধিতে, ব্যসনে, দেহরক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই করিবে। তাহাতে ধর্ম্মব্যতিক্রম হইলেও এই ব্যতিক্রম সমাধানের জন্য স্বস্থঅবস্থায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। দারুণ, মৃদু, যে কোনও ধর্ম্ম দ্বারা দীন আত্মার উদ্ধার করিয়া পরে স্বস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। আবার বলা হইয়াছে—আপৎকাল উপস্থিত হইলে

শৌচাচার বিচার করিবে না। প্রথমতঃ নিজেকে রক্ষা করিয়া স্বস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সম্বর্ত্ত স্মৃতির ৫১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—দীন, অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিলে অধিক পুণ্য হয়। দক্ষস্মৃতির ৫ম অধ্যায়ে দীন, অনাথ প্রভৃতিকে দানের কথা বলা হইয়াছে। দক্ষস্মৃতির ৫ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে আপৎকালে ও অনাপৎকালে অশৌচ ভিন্ন হইয়া থাকে। দক্ষস্মৃতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞকালে, বিবাহে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হইবে না। আবার বলা হইয়াছে যে অশৌচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা স্বস্থকালে বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধীই নহে।

যাঁহারা মনে করেন, দণ্ডনীতিতে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা নিজেই অবধারণ করিতে পারেন। ইহার জন্য কোন বিশেষ শাস্ত্রের অপেক্ষা নাই। তাঁহাদের কথা আমরা বহু পূর্ব্বে শুনিয়াছি। আমরা এই প্রবন্ধে দশকুমার চরিতের ৮ম উচ্ছ্বাসের আলোচনাতে দেখাইয়াছি যে—বিহারভদ্র নামক অতিনীচ রাজার অনুচর রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া রাজার বিনাশ সাধনের জন্য এই কথাগুলি অতিশয় রঞ্জিত করিয়া বলিয়াছিল। মহাভাষ্য, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রও পণ্ডিতজনেরই বুদ্ধি দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। এইসব শাস্ত্রে যাহা আলোচিত হইয়াছে—তাহা পণ্ডিতজনের উহ-অপোহ দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে। এজন্য কি মহাভাষ্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের অযোগ্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে? দুরূহ তর্কশাস্ত্র, খগোল, ভূগোল, গণিতশাস্ত্র, রেখাগণিত প্রভৃতি সকল দেশেই অবশ্য অধেতব্য বলিয়া সকলেই মনে করেন ও এই সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত শাস্ত্র, মানুষের বুদ্ধিদ্বারাই উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। উহ-অপোহ-কুশল বুদ্ধিমান্ অসাধারণ ব্যক্তিবর্গই নানাযুক্তি দ্বারা এই সমস্তশাস্ত্রকে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজে বুদ্ধিমান্ সাজিয়া মনে করেন যে আমিও অসাধারণ বুদ্ধিমান্, আমি এই সমস্ত শাস্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারিব না কেন? এইরূপ মনে করিয়া যদি তিনি এই সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইতে বিরত হন, তবে তাঁহাকে গর্দ্দভ ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? অর্থশাস্ত্রকে হেয় প্রতিপাদন করিবার জন্য, এই শাস্ত্রে জনগণের আস্থা নিবৃত্তির জন্য, দণ্ডনীতি শাস্ত্রকে পুরুষবুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত বলিয়া তাহার হেয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে উপেক্ষা প্রদর্শন যে সার্থক হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্রে ভারতীয় জনতা অনভিজ্ঞ হওয়ায় অতীত এক হাজার বৎসর হইতে পরাধীন হইয়া সুখে বাস করিয়াছে। অন্য রাষ্ট্রের কোনরূপ সংবাদ না রাখিয়া কূপমণ্ডূক হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও বিহ্বল হইয়াছে। ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান–করা অতি সাধারণ বুদ্ধিসাধ্য—অথচ ইহার জন্য রচিত শাস্ত্র ও সেই শাস্ত্রের অধ্যয়ন এখনও অনেক লোকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, আর অর্থশাস্ত্র আর্য্য ঋষিগণ দ্বারা রচিত হইলেও তাহা অধ্যেতব্য নহে, যেহেতু তাহা অন্বয় ব্যতিরেকগম্য এইরূপ বিবেচনা, পরাধীন জাতির পক্ষেই শোভা পায়। ভরতকে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে নারদ যে উপদেশগুলি করিয়াছিলেন তাহার কোনই আবশ্যকতা থাকিত না যদি ভরত ও যুধিষ্ঠির ইহাদের মতানুসারে বলিতে পারিতেন যে, ইহাও সাধারণ লোকবুদ্ধিগম্য; সুতরাং ইহার উপদেশ করিবার আবশ্যকতা কি? মহাভারতের সুবিস্তৃত রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের উপদেশ করিয়া অকারণ মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিবারও আবশ্যকতা হইত না, যদি ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির ইহাদের সৎপরামর্শ শুনিতেন। পৈতামহ বৈশালাক্ষ প্রভৃতি তন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন হইত না, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রণয়নে বিপুল প্রয়াসেও প্রয়োজন হইত না। দেশ যখন অধঃপতিত হয় বা অধঃপতনের সূচনা হয়—তখন এই জাতীয় বিপরীত বুদ্ধিই তাহাকে গ্রাস করে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য, অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রবল বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাতে ‘মিতাক্ষরাকার’ ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে অর্থশাস্ত্রের বাধই হইবে, এইরূপ বলিয়া—ইহার

উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন—মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩৫০-৫১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—বধে উদ্যত আততায়ীকে কোন বিচার না করিয়া বধ করিবে। সেই আততায়ী বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ হইলেও বধ করিবে। আততায়ি-বধে হন্তার কোন দোষ নাই। মনুসংহিতার এই কথাগুলিকে 'মিতাক্ষরাকার' অর্থশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার মিতাক্ষরাতে মনুসংহিতার ১১শ অধ্যায়ের ৯০ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যা সম্বন্ধে যে সব প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে তাহা অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। স্মৃতিনিবন্ধকারগণ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যায় যে প্রায়শ্চিত্ত,—জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যায় তাহার দ্বিগুণ হইবে বলিয়াছেন। ফলকথা 'মিতাক্ষরাকারের' মতে গুরু, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আততায়ীকে বধ করিলেও কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এই আততায়ীগুলিকে বধ না করিয়া নিজে আততায়ী দ্বারা নিহত হইলে, আতায়ীর প্রতিরোধ না করিয়া গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আততায়ীর নিকট নিজের দেহ অথবা আততায়ীগণ যাহাকে যাহাকে হত্যা করিতে চায়, তাহাদিগকেও আততায়িগণের হস্তে সমর্পণ করিলে কীদৃশ পুণ্য হইবে, তাহা 'মিতাক্ষরাকার' বলেন নাই।

আমরা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই, শরশয্যাতে শয়ান ভীষ্মের নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তিনি পরমপূজ্য মান্য গুরুজনকে যুদ্ধে পাতিত করিয়া, বিশেষতঃ পরমপূজ্য পিতামহ ভীষ্মকে শরশয্যাশায়ী করিয়া লজ্জাবশতঃ ও অভিশপ্ত হইবার ভয়ে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সহসী হইতেছেন না—এই কথা কৃষ্ণ ভীষ্মকে বলিলে—ভীষ্ম তাহার উত্তরে লিয়াছিলেন—দান, অধ্যয়ন এবং তপস্যা যেমন ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম, এইরূপ যুদ্ধে দেহপাতনও ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম। পিতৃগণ, পিতামহগণ, ভ্রাতৃবর্গ এবং সম্বন্ধিবান্ধবগণ যাহারা মিথ্যাপ্রবৃত্ত, তাহাদিগকে রাজা যে যুদ্ধে নিহত করেন, ইহা রাজার ধর্ম্মই বটে। মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী লুব্ধ গুরুবর্গকেও যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিনাশ করে, সে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবীর। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে আহূত হইয়া অবশ্যই যুদ্ধ করিবে। এই যুদ্ধ—ধর্ম্ম, স্বর্গ ও লোকপ্রদ। ইহাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন। (শান্তিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়—১১-১৯ শ্লোক)।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করায় ভীষ্ম নিজেকেই মিথ্যাপ্রবৃত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে শরশয্যায় শায়িত করায় যুধিষ্ঠিরের কোন পাপ হয় নাই। প্রত্যুত যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মই হইয়াছে। এই কথাই ভীষ্ম বলিয়াছেন। মহাভারতের এই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে মিথ্যাপ্রবৃত্ত আততায়ী অবশ্য বধ্য, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আততায়ীর হস্তে নিহত হইবার উপদেশ মহাভারতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তাহাও যুদ্ধে তাঁহার নিজের যে সকল মিথ্যা প্রবৃত্তি ঘটিয়াছিল—তাহা ক্ষালনের জন্যই করিয়াছিলেন। এমন কোন কার্য্যই সম্ভাবিত নহে যাহাতে কোন ত্রুটি ঘটিবে না এবং হিংসাদি দোষও ঘটিবে না যাঁহারা উৎপথগামীরও দণ্ডবিধান অকর্ত্তব্য মনে করেন, আমরা মহাভারতের এই শ্লোকটির প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ॥ (শান্তিপর্ব্ব ১৫ অধ্যায় ১২ শ্লোক)

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সমুদায় লোকই কেবল দণ্ডভয়ে ভীত হইয়াই সৎপথগামী হয়, নতুবা স্বভাব বিশুদ্ধ মানুষ জগতে অতি বিরল। কেবল দণ্ডভয়েই সমুদায় জগৎ তাহার কর্ত্তব্যপথে স্থিত থাকে। এই জন্য যে কোন ব্যক্তি বিপথগামী হইবে সে অবশ্য রাজদণ্ডার্হ হইবে। যাঁহারা প্রাণীর বধ মাত্রই অত্যন্ত অধর্ম্ম মনে করিয়া আততায়ী শত্রুর বধও অধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকটে আমরা

মহাভারতের ২টি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—প্রাণিবধ না করিয়া তপস্বীরাও প্রাণধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা যে জল পান করেন, তাহাতেও বহুপ্রাণী বাস করে—যে পৃথিবীভাগে তাঁহারা বিচরণ করেন, তাহাতেও বহুপ্রাণী আছে, যে বৃক্ষফল খাইয়া জীৱন ধারণ করেন তাহাতেও ৱহু প্রাণী আছে, ইহাদিগকে বধ না করিয়া তপস্বীরাও জীবনধারণ করিতে পারেন না। কেবল জলে ও পৃথিবীতেই প্রাণী নহে—বায়ুতেও এমন সূক্ষ্ম প্রাণী আছে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও যুক্তিগ্রাহ্য বটে। এই সমস্ত প্রাণী এত সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল যে চক্ষুর উন্মেষ নিমেষেও ইহাদের বিনাশ হয়। (শান্তিপর্ব্ব ১৫ অধ্যায়—২৫-২৬ শ্লোক)। সুতরাং মিতাক্ষরাকার ব্রাহ্মণ বধ মাত্রে, যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আততায়ী ভিন্ন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ২১২ অধ্যায়ে উমামহেশ্বর সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে উমা মহেশ্বরকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে—ইতর মনুষ্যগণকে ভর্ৎসিত করিয়াও রাজা মৃত্যুর পরে স্বর্গ লাভ করেন কেন? এই সমস্ত কার্য্যের পর ত তাঁহাদের নরকই হওয়া উচিত। অথচ তাঁহাদের স্বর্গলাভ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য আমি রাজবৃত্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। এতদুত্তরে মহেশ্বর বলিয়াছিলেন—হে দেবি! জগতের পথ্য (জগতের হিত) রাজবৃত্ত তোমার নিকট বলিব—এই অধ্যায়ে মহেশ্বর বহু কথা বলিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে—শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন ও শত্রুদমনে রাজা যে পুণ্য লাভ করেন, সেই পুণ্য প্রভাবেই রাজা স্বর্গারোহণ করেন। এই অধ্যায়ে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের বহু সিদ্ধান্ত মহেশ্বর পার্ব্বতীর নিকট বলিয়াছেন। সাধারণ লোক উমামহেশ্বর সংবাদ শুনিলেই মনে করে যে ইহা কোন মন্ত্র সম্বন্ধে, কোন জপ সম্বন্ধে, কোন পুরশ্চরণ সম্বন্ধে বা কোন উপাসনার সম্বন্ধে কথা হইয়া থাকিবে। একমাত্র মহাভারতই এই জাতীয় গ্রন্থ, যাহাতে উমামহেশ্বর সংবাদেও দণ্ডনীতিশাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময়ে মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই দুইখানি গ্রন্থে যাহা সম্ভব অন্য গ্রন্থে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা রামায়ণের যে অধ্যায় আলোচনা করিয়াছি—তাহাতে দেখিয়াছি রামচন্দ্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বক্তা ও ভারতসম্রাট্ ভরত তাহার শ্রোতা। রামচরিত্র লইয়া বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, একমাত্র বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন রামায়ণে রামচন্দ্রকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বক্তা দেখা যায় নাই।

ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রর আদিগ্রন্থ পৈতামহ তন্ত্র। এই পৈতামহতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র পর্য্যন্ত যে পারম্পর্য্য বা ধারা আমরা বর্ত্তমান সময়ে পাইতেছি ইহাকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বলা যায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সমাপ্তিতে বলা হইয়াছে যে—এই শাস্ত্র বহু বিস্তৃত হওয়ায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে বহু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল আর তাহাতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তনিরূপণ সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য বিষ্ণুগুপ্ত—কৌটিল্য নিজের এই শাস্ত্রের সূত্র ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া ব্যাখ্যাতৃগণের মতবিরোধের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

কৌটিল্যের পরে কামন্দক কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কামন্দকনীতিগ্রন্থেরও বহু অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। মহারাজ যশোধরের সময়ে সোমদেব সূরি নীতিবাক্যামৃত নামক দণ্ডনীতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানিও সংক্ষিপ্ত। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের পরম্পরা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় এই শাস্ত্রপ্রবাহের আদিগ্রন্থ পৈতামহতন্ত্র ও সর্ব্বশেষ গ্রন্থ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র।

ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার প্রারম্ভ হইতে যে শাস্ত্রপ্রবাহ নির্ব্বাধগতিতে প্রবাহিত হইয়া স্বাধীন ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ আশ্রয় হইয়াছিল, বৌদ্ধপ্লাবনে এই শাস্ত্রের উচ্ছেদ ও ভারতীয় স্বাধীনতার বিলোপ ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ প্লাবনের ফলে ভারতীয় জনতার হৃদয়ে এক অনৈসর্গিক বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই অনৈসর্গিক বৈরাগ্যই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ এমনকি ভারতীয় নরপতিবৃন্দ

পর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষায় উদাসীন হইয়া কেবলমাত্র অনৈসর্গিক উৎকট বৈরাগ্যের আলোচনায় কালযাপন করাকেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই প্লাবন কেবলমাত্র বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্য্যদার্শনিকগণও ইহাতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যদিও আর্যদার্শনিকগণ বৌদ্ধদার্শনিকদিগের যুক্তি খণ্ডনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন তথাপি অনৈসর্গিক বৈরাগ্যে তাঁহারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে বহুতর দার্শনিক মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইসমস্ত দার্শনিকগণের দৃষ্টি সঙ্কুচিত হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় চেতনাহীন ভারতবর্ষকে পরস্পর বিদ্বেষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। দৃষ্টির সম্প্রসারণ না থাকায় ভারতীয় জনবৃন্দও এইসমস্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর যে কোনও একটির অন্তর্গত হইয়া অপরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়াছি। এই সময়ে ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতা অতিশয় প্রবল হওয়ায় ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেই সেই প্রদেশের জন্য স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া প্রাদেশিকতাবুদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিল। রাষ্ট্রের অধঃপতনের সময়ে বিদ্বৎসমাজেরও বুদ্ধির বিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। সমষ্টির স্বার্থে উদাসীন হইয়া ব্যষ্টিগত স্বার্থেই লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার ফলে রাষ্ট্র বহুধাখণ্ডিত হইয়া পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দেশের জনতা যখন চিন্তায় ও কার্য্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন সেই দেশের ঐক্য, সমস্ত দিক হইতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে রাজ্য অন্যের পদানত হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। যে সময়ে চিন্তা বা কার্য্য, সমষ্টির কল্যাণে প্রযুক্ত না হইয়া কেবল ব্যষ্টির কল্যাণেই প্রযুক্ত হয় সেই সময়ে দেশের সমষ্টিগত একতা চারিদিক হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে—যে চিন্তাধারা বা কার্য্যধারা ভারতের সংহতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও লোকে তাহারই প্রশংসা করিয়া থাকে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গড়িলে দেশের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ইহা আমাদের বুদ্ধিতে স্থানই পায় না! ভারতের চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজগতে যে গুরুতর বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হইয়াছিল আজপর্য্যন্তও তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। দিন দিন এই ভাবের বৃদ্ধিই হইতেছে। কেবলমাত্র সময়ের ভেদপ্রযুক্ত তাহার আকার অন্যরূপ হইতেছে মাত্র।

যাহারা ভারতের চিন্তাজগতে বা কর্ম্মজগতে বিভেদ ও বিদ্বেষের করিয়াছে তাহারা ভারতের কল্যাণকামী বলিয়া কোনওক্রমেই বিবেচিত হইতে পারে না। ভারতের চিন্তাধারায় বিপ্লব ও কার্য্যধারায় বিপ্লব যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারাই আবার প্রশ্ন করেন ভারতের এই অধঃপতন হইল কিরূপে? তাঁহাদের নিকট আর বক্তব্য কি আছে। দুঃখের বিষয় এই যে ইহা আমাদের বুঝিবার সামর্থ্যও নাই। একদিকে রাষ্ট্রীয় চেতনার বিলোপ অপরদিকে চিন্তাজগতের বিপ্লব ভারতবর্ষকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৈতামহ তন্ত্র

ভারতের আদি দণ্ডনীতি গ্রন্থ—কেবল ভারতের কেন সমগ্র মানব সমাজের আদি দণ্ডনীতি শাস্ত্র যাহা পৈতামহ তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল আমরা সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভগবান্ ব্রহ্মা একলক্ষ অধ্যায়ে যে সুবিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি মহাভারতের রাজধর্ম্ম পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও এই অধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। এই অধ্যায়টি সূত্রাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ।

এই শাস্ত্রে ত্রয়ী, আন্বীক্ষিকী, বার্ত্তা ও বিপুলা দণ্ডনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রী পুরোহিত ও অমাত্যগণের লক্ষণ ও তাহাদের রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অমাত্যাদির রক্ষার জন্য প্রণিধি অর্থাৎ গুপ্তচার বিভাগের কথা বলা হইয়াছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে প্রথম অধিকরণে ৭ম ও ৮ম প্রকরণে গুপ্তচার বিভাগের বিবরণ বলা হইয়াছে। ততঃপর পৈতামহ তন্ত্রে রাজপুত্র রক্ষার ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১ম অধিকরণের ত্রয়োদশ প্রকরণে রাজপুত্র রক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। পৈতামহতন্ত্রে বিবিধ প্রকার চার ও তাহাদের কার্য্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা এই পাঁচ প্রকার উপায় সমগ্রভাবে বলা হইয়াছে। রাজপরিষদের মন্ত্রণারীতি, মন্ত্রভেদ, মন্ত্রবিভ্রম এবং মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল বলা হইয়াছে। হীনসন্ধি, মধ্যমসন্ধি ও উত্তমসন্ধি এই ত্রিবিধ সন্ধির বিবরণ বলা হইয়াছে। ভয়প্রযুক্ত সন্ধি—হীনসন্ধি, সৎকার প্রযুক্ত সন্ধি—মধ্যমসন্ধি ও ধনগ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধি—উত্তমসন্ধি। ভয়, সৎকার ও ধন এই তিনটি সন্ধির কারণ। এই ত্রিবিধ সন্ধির বিস্তৃত বিবরণ পৈতামহ তন্ত্রে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের কারণ চারপ্রকার বলা হইয়াছে—স্বীয় মিত্রবৃদ্ধি ও কোষবৃদ্ধির জন্য এবং শত্রুর মিত্রনাশ ও কোষনাশের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে এজন্য যুদ্ধের কারণ চারপ্রকার বলা হইয়াছে। ধর্ম্মবিজয়, অর্থবিজয় ও আসুরবিজয় এই ত্রিবিধ বিজয় বিবৃত হইয়াছে।

অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও বল এই পঞ্চ বর্গ, উত্তম মধ্যম ও অধমভেদে এই ত্রিবিধ পঞ্চবর্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকাশদণ্ড অষ্টবিধ ও গুপ্তদণ্ড বহুবিধ বর্ণিত হইয়াছে। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, বিষ্টি, নৌকা, চর ও দেশিক এই অষ্টাঙ্গসেনার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পৈতামহ তন্ত্রে যে অষ্টাঙ্গসেনা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে বিষ্টি পঞ্চম অঙ্গ। বিষ্টিরূপ পঞ্চম অঙ্গের কার্য্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১০ম অধিকরণের ৪র্থ প্রকরণে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—শিবির স্থাপন, সৈন্যগণের গমন পথশোধন, সৈন্যগণের গমন পথে সেতু নির্ম্মাণ, সৈন্যগণের জন্য কূপ খনন, পূর্ব্বস্থিত জলাশয় সমূহের শোধন, যন্ত্র, আয়ুধ, সৈন্যগণের বর্ম্ম প্রভৃতির বহন, যুদ্ধভূমিতে অস্ত্র ও বর্ম্ম প্রভৃতির প্রদান, এবং আহত সৈনিকগণের যুদ্ধ ভূমি হইতে নিরাপদ স্থানে আনয়ন ইহাদিগের কার্য্য।

প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যাহারা শত্রুরাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে তাহাদিগকে চর বলে। যাতব্য শত্রুরাজ্যে সৈন্য পরিচালনকালে যাহারা সৈন্যের গমনপথ নির্দ্দেশের সহায় হইয়া থাকে তাহাদিগকে দেশিক বলে। সৈন্যের এই আটটি অঙ্গ প্রকাশ্য অঙ্গ। এতদ্‌ভিন্ন অপ্রকাশ্য অঙ্গও সৈন্যের আছে। এই শাস্ত্রে সর্পাদি জঙ্গম বিষ এবং নানাবিধ উদ্‌ভিজ্জ ও রাসায়নিক স্থাবর বিষ যাহা স্পর্শযোগ্য বস্ত্রাদিদ্রব্যে এবং পেয় ভোজ্য

প্রভৃতি দ্রব্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্পর্শনকারীর বা পানভোজনকারীর সদ্যঃ প্রাণনাশ করিয়া থাকে এইরূপ নানাবিধ বিষ ও চূর্ণযোগ যাহা প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুঘাতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অরি, মিত্র, উদাসীন এই ত্রিবিধ নরপতির সহিত ব্যবহার এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। জয় ও পরাজয়সূচক গ্রহ ও নক্ষত্রাদির অনুকূল অবস্থান এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে! জাঙ্গল আনূপ মরু প্রভৃতি নানাবিধ ভূমির গুণ বর্ণিত হইয়াছে। স্বীয় সৈন্যগণের রক্ষা, সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন, বিপদকালে তাহাদের আশ্বাসন এবং রথ যন্ত্র শস্ত্রাদির পরীক্ষা এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত স্বীয় বলের বিনাশক যোগসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। চক্র, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যূহ রচনা এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিচিত্র যুদ্ধকৌশলের বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। নানাবিধ গ্রহযুদ্ধ, ধূমকেতু প্রভৃতি উৎপাত এবং উল্কাপাত ভূমিকম্প প্রভৃতি নিপাত বর্ণিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে শত্রু বিনাশের জন্য যেমন সুযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ কোনও স্থলে আত্মরক্ষার জন্য সুপলায়িতও বর্ণিত হইয়াছে।

যুদ্ধে ব্যবহার্য্য শস্ত্রসমূহের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে তাহাদের উপযোগ পরিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। সৈন্যগণের মধ্যে বিরোধ, রাজার প্রতি বৈমনস্য এবং সৈন্যগণের নানাবিধ ব্যাধি প্রভৃতিকে বলব্যসন বলা হয়। এই ব্যসনের উৎপত্তি ও তাহার প্রশমন এই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন নানাবিধ ক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। সৈন্যগণের পীড়া-পরিজ্ঞান, আপৎকাল পরিজ্ঞান এবং সৈন্যগণের স্বাভাবিক অবস্থার পরিজ্ঞান এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

যুদ্ধযাত্রার নানাবিধ সঙ্কেত-পরিজ্ঞানশঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনিদ্বারা সৈন্যগণের কর্ত্তব্য বোধন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় স্থিত সৈন্যগণের সহসা একত্রীকরণ এবং সৈন্যগণের নির্দ্দিষ্ট সঞ্চারবোধন এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। নানাবিধ দস্যু তস্কর দ্বারা এবং অরণ্যবাসী জনগণ দ্বারা—পররাষ্ট্রের পীড়ন বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি প্রদানকারী, বিষ প্রদানকারী এবং নানাবিধ বিভীষিকা উৎপাদনকারিগণ দ্বারা পররাষ্ট্রের পীড়ন, পররাষ্ট্রের মাণ্ডলিক ও সৈন্য প্রভৃতির পরস্পর ভেদ উৎপাদন, ধান্যাদি শস্যের নাশ, হস্তী অশ্বাদির দূষণ—(অর্থাৎ কার্য্যে অক্ষম করিয়া দেওয়া) শত্রুসৈন্যে নানারূপ ভয়ের উৎপাদন, পররাষ্ট্রস্থিত বিজিগীষু রাজার অনুকূল জনগণের আশ্বাসন তাহাদের নানাবিধ সুবিধা প্রদান এবং তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস উৎপাদন দ্বারা পররাষ্ট্রের পীড়ন এই পৈতামহ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

১। স্বামী, ২। অমাত্য, ৩। সুহৃৎ, ৪। কোষ, ৫। রাষ্ট্র, ৬। দুর্গ এবং ৭। সৈন্য এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাজদূতগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দূতগণের অধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে। রাজ্য বৃদ্ধির উপায় সকল বলা হইয়াছে। বিজিগীষু রাজার শত্রু মধ্যস্থ উদাসীন ও মিত্ররাজগণের সহিত নানাবিধ ব্যবহার বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। যে রাজা বিজিগীষুর শত্রু ও মিত্র উভয় রাজার সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহাকে মধ্যস্থ বা মধ্যম রাজা বলা হয় এবং যে রাজা বিজিগীষুর শত্রু ও মিত্র রাজার সহিত সম্বন্ধ রাখে না সে বিজিগীষু রাজার নিকট উদাসীন রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রবলরাজার কার্য্যে নানাবিধ বিঘ্ন উৎপাদন এবং প্রবল রাজার রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন এই পৈতামহ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগের কার্য্যসমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে। স্বকীয় রাজ্যে উৎপাতকারী চোর দ্যূতক্রীড়াকারী প্রভৃতি কণ্টকবর্গের শোধন, নানাবিধ মল্লক্রীড়া, নানাপ্রকার অস্ত্রজ্ঞান, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ধন ব্যয়, রাষ্ট্রের উপকারক দ্রব্য রাশির সংগ্রহ এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের অরক্ষিত জনগণের রক্ষা এবং রক্ষিত জনগণের নানাবিধ কার্য্যে নিয়োগ, দুর্ভিক্ষাদি সময়ে অর্থের দান, রাষ্ট্রে স্ত্রী

মদ্যপানাদি ব্যসনের প্রসার নিবারণ এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি রাজগুণ ও সেনাপতির গুণ সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি এই ত্রিবর্গের গুণ এবং দোষ এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে বাগ্মিতা প্রগল্‌ভতা প্রভৃতি রাজগুণ বর্ণিত হইয়াছে। কামন্দক নীতিশাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে ১৫ হইতে ১৯ শ্লোকে রাজগুণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পৈতামহ তন্ত্রে সেনাপতির গুণ সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। উৎসাহ-শক্তি প্রভৃতি ত্রিবর্গের কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং এই ত্রিবর্গের গুণ ও দোষ এই তন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

এই তন্ত্রে রাজার অনুজীবিগণের ব্যবহার বলা হইয়াছে এবং তাহাদের নানাবিধ দুষ্কার্য্যেরও বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজার অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর রক্ষণ ও রক্ষিত বস্তুর বিবর্দ্ধন এবং বর্দ্ধিত বস্তুর যথোপযুক্ত পাত্রে প্রতিপাদন বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভের জন্য অর্থের বিনিয়োগ এবং ব্যসন ও বিপদ নিবারণের জন্য অর্থের বিনিয়োগ বলা হইয়াছে। ১। মৃগয়া, ২। অক্ষক্রীড়া, ৩। দিবানিদ্রা, ৪। পরের দোষ কীর্ত্তন, ৫। অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ, ৬। অতিশয় মদ্যমান, ৭। নৃত্য, ৮। গীত, ৯। বাদ্য, ১০। বৃথা পর্য্যটন এই দশটি কামজ ব্যসন, এবং ১। পিশুনতা, ২। সাহস, ৩। দ্রোহ, ৪। ঈর্ষা, ৫। অসূয়া, ৬। পরধনাপহরণ এবং অবশ্য দেয়ধনের অপ্রদান রূপ অর্থদূষণ, ৭। বাক্ পারুষ্য, ৮। দণ্ড পারুষ্য এই ৮টী ক্রোধজ ব্যসন এই পৈতামহ তন্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। এই কামজ ব্যসনবর্গের মধ্যে মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ ও অতিশয়-মদ্যপান এই চারিটি অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ক্রোধজ ব্যসন বর্গের মধ্যে বাক্‌পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই তিনটি অতিনিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নানাবিধ যন্ত্র ও তাহার ব্যবহার এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যন্ত্র দুই প্রকার, স্থিতযন্ত্র ও চলযন্ত্র, স্থিতযন্ত্র বহু প্রকার। যেমন সর্ব্বতোভদ্র, যামদগ্ন্য বহুমুখ, বিশ্বাসঘাতী, সংঘাটি, যানক, পর্জন্যক, ঊর্দ্ধবাহু, অর্দ্ধবাহু প্রভৃতি। এইরূপ চলযন্ত্রও অনেক প্রকার পঞ্চালিক, দেবদণ্ড, সূকরিকা, মুসল যষ্টি, হস্তিবারক, তালবৃন্ত, মুদ্‌গর, দ্রুঘন, গদা, শৃঙ্খলা, কুদ্দালক, আস্কোটিম, উদ্‌ঘাটিম, উৎপাটিম, শতঘ্নী, ত্রিশূল, চক্র প্রভৃতি এই সমস্ত যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার নামক দ্বিতীয় অধিকরণে, আয়ুধাগারাধ্যক্ষ প্রকরণে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। (কৌঃ অঃ ২৫০ পৃঃ গণপতিসং) নানা উপায়ে শত্রুরাজ্যের পীড়ন, শত্রুদেশের সীমাবৃক্ষাদির বিনাশ, স্বরাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্মাদির সুব্যবস্থা—নানাবিধ অবশ্য অপেক্ষিত বস্ত্রাদি ও বর্ম্মাদি উপকরণের নির্ম্মাণের ব্যবস্থা—হীরক পদ্মারাগাদি মণি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশু, নানাবিধ বস্ত্র, দাসাদি সেবক এবং সুবর্ণ রজতাদি ধাতু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পণব, আণক, শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি যুদ্ধপোযোগী—বাদ্যযন্ত্রের নির্ম্মাণের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। নবলব্ধ রাজ্যের আশ্বাসনের ব্যবস্থা—সেই রাজ্যে সজ্জনগণের সৎকারের ব্যবস্থা—বিদ্বজ্জনের সম্মেলনের ব্যবস্থা—দান হোমাদি ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যবস্থা, মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, রাজ পরিচ্ছদ নির্ণয়, রাজার আহার ব্যবস্থা, রাজার ব্যক্তিগত কার্য্যের ব্যবস্থা এবং রাজার সত্যনিষ্ঠতা ও মধুরভাষিতার প্রয়োজনীয়তা, রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উৎসব প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা, সর্ব্ববিধ জনসমাজে রাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্য্যের ব্যবস্থা—রাজভৃত্য দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহের পরিদর্শন ব্যবস্থা, পৌর ও জানপদবর্গের রক্ষণ ও বর্দ্ধনের ব্যবস্থা—দ্বাদশ রাজমণ্ডলে রাজার কার্য্য ব্যবস্থা বলা হইয়াছে—এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল মনু সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৫৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহার পরিচয় মেধাতিথিভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে—বিজিগীষু অরি মধ্যম ও উদাসীন এই চারিটি রাজাকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। কামন্দক-নীতি শাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে ১৮, ১৯, ২০ শ্লোকে—এই চারিটি রাজাকেই মূলপ্রকৃতি বলা হইয়াছে।

অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই ৫টীকে বিজিগীষু রাজার দ্রব্য প্রকৃতি বলা হয়, এই পঞ্চ প্রকৃতিসম্পদ্‌যুক্ত রাজা আত্মসম্পদ্‌যুক্ত হইয়া যখন অন্যের রাজ্য জয় করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হন তখন তাঁহাকে বিজিগীষু বলা হয়। এই বিজিগীষু রাজার রাজ্যের সহিত সংলগ্ন অন্য রাজ্যের অধিপতিকে অরিপ্রকৃতি বা শত্রুপ্রকৃতি বলা হয়। বিজিগীষু রাজার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে যেসমস্ত রাজ্যগুলি অব্যবহিতভাবে অবস্থিত আছে সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ অরিপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব শত্রু। এই শত্রু রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্যের অধিপতিকে মিত্র প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব মিত্র বলা হইয়া থাকে, সুতরাং শত্রু রাজ্যের অনন্তররাজ্য মিত্ররাজ্য—তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য শত্রুর মিত্ররাজ্য—তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্য মিত্রের মিত্ররাজ্য এবং তাহার পরবর্ত্তী রাজ্য শত্রুর মিত্রের মিত্ররাজ্য। সুতরাং বিজিগীষু রাজার সম্মুখভাগে যথাক্রমে এই ৫টি রাজ্য অবস্থিত আছে বুঝিতে হইবে ; ১। শত্রু, ২। মিত্র, ৩। শত্রুর মিত্র, ৪। মিত্রের মিত্র, ৫। শত্রুর মিত্রের মিত্র। এইরূপ বিজিগীষু রাজার অব্যবহিত পশ্চাৎভাগে যে রাজ্য অবস্থিত রহিয়াছে সেই রাজ্যের রাজাকে "পার্ষ্ণিগ্রাহ" বলা হয়; এই "পার্ষ্ণিগ্রাহ" রাজা, শত্রুর মিত্র। বিজিগীষু কর্ত্তৃক অভিযুক্ত রাজার হিতের জন্য এই রাজা, বিজিগীষুর পশ্চাৎদিক্ হইতে বিজিগীষুকে আক্রমণ করে বলিয়া অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার পদ পশ্চাৎদিক্ হইতে আটকাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকে "পার্ষ্ণিগ্রাহ" বলা হয়। পার্ষ্ণিগ্রাহ—শত্রুর মিত্র। এই পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে "আক্রন্দ" বলা হয়—এই আক্রন্দ বিজিগীষু রাজার মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহকে নিবারণ করিবার জন্য বিজিগীষু রাজা ইহাকে আহ্বান করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে আক্রন্দ বলা হয়। আক্রন্দ রাজ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তীরাজ্যের রাজাকে "পার্ষ্ণিগ্রাহসার" বলা হয়। এই রাজা শত্রু মিত্রের মিত্র। পার্ষ্ণিগ্রাহ শত্রুর মিত্র এবং "আসার" তাহার মিত্র। এই রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজার সহায়তা করেন বলিয়া—ইহাকে "পার্ষ্ণিগ্রাহাসার" বলা হয় এবং এই রাজ্যের অব্যবহিত পশ্চাৎবর্ত্তী রাজ্যের রাজাকে "আক্রন্দাসার" বলা হয়। এই রাজা বিজিগীষুরাজার মিত্রের মিত্র। বিজিগীষু রাজার মিত্র "আক্রন্দ" এবং তাহার মিত্র "আক্রন্দাসার"। এইরূপে বিজিগীষু রাজার সম্মুখবর্ত্তী ৫টি এবং পশ্চাৎবর্ত্তী ৪টি এই ৯টি এবং মধ্যে বিজিগীষু রাজা এইরূপে দশরাজমণ্ডল হইয়া থাকে—এই দশরাজমণ্ডলের সহিত মধ্যম ও উদাসীন এই দুটি রাজা লইয়া দ্বাদশরাজমণ্ডল হয়।

আমরা মনুসংহিতা হইতে প্রকৃতিভূত যে ৪টী রাজার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহারা বিজিগীষু, অরি, মধ্যম ও উদাসীন। দশটী রাজমণ্ডলের অন্তর্গত বিজিগীষু ও শত্রু এই দুইটি এবং মধ্যম ও উদাসীন এই দুইটি এই ৪টি রাজা, রাজমণ্ডলের মূল প্রকৃতি—আর ১। মিত্র, ২। অরিমিত্র, ৩। মিত্র-মিত্র এবং ৪। অরিমিত্র মিত্র এই ৪টি এবং ১। পার্ষ্ণিগ্রাহ, ২। আক্রন্দ, ৩। পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও ৪। আক্রান্দাসার এই ৪টি মিলিত ভাবে ৮টি, প্রকৃতিভূত রাজমণ্ডলের অঙ্গ—সুতরাং অঙ্গ ও অঙ্গী মিলিতভাবে ১২টি রাজা। এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল বরগোষ্ঠীন্যায়ে কখনও প্রকৃতি বা অঙ্গী ও কখনও অঙ্গ হইয়া থাকে। শত্রুরাজ্য ও বিজিগীষু রাজ্যের অব্যবহিত এবং পার্শ্বভাগে অবস্থিত যুদ্ধনিরত অথবা কৃতসন্ধি, শত্রু ও বিজিগীষু উভয় রাজার অনুগ্রহে সমর্থ, এইরূপ রাজাকে মধ্যম রাজা বলে। সুতরাং মধ্যম রাজা, বিজিগীষু ও শত্রুর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী রাজা। শত্রুর ও বিজিগীষুর সম্মুখবর্ত্তী ও পৃষ্ঠবর্ত্তী রাজগণের পরিচয় বলা হইয়াছে। অরি, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন—এই চারিটি মূল প্রকৃতিভূত রাজার তিনটির পরিচয় বলা হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা উদাসীন রাজার পরিচয় প্রদান করিব। এই তিনটি মূলপ্রকৃতি রাজার রাজ্যের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এবং মধ্যম রাজা হইতেও বলবান্ অর্থাৎ অধিক কোষ দণ্ডাদি সমন্বিত এবং এই তিনটি রাজারই মিলিত অবস্থায় বা যুদ্ধরত অবস্থায় অনুগ্রহ প্রদানে সমর্থ এবং ইহারা যুদ্ধরত হইলে তিনটি রাজার যে কোনও একটিকে নিগ্রহ করিতেও সমর্থ—এইরূপ রাজাকে উদাসীন রাজা বলে। মূলপ্রকৃতিভূত অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম এই ত্রিবিধ রাজপ্রকৃতি হইতে বহির্দেশে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে উদাসীন বলে। এই উদাসীনরাজ্য, অরি বিজিগীষু ও মধ্যম রাজ্যের সহিত সংলগ্ন নহে।

বিজিগীষু অরি, মধ্যম ও উদাসীন এই চারিটি রাজাকে মূলপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। এবং এই চারিটির প্রত্যেকটির ১৮টি অবয়বযুক্ত এক একটি মণ্ডল আছে, যেমন— ১। বিজিগীষু, ২। বিজিগীষুর মিত্র ও ৩। তাহার মিত্রের মিত্র—এই তিনটি রাজা হইবে এই তিনটি রাজাকে প্রকৃতি রাজা বলা হয়। মূল প্রকৃতি বিজিগীষু এবং তাহার মিত্র ও তাহার মিত্রের মিত্র মূল প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি বলা হয়। এই তিনটি রাজার প্রত্যেকটির অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ ও সৈন্য (দণ্ড) এই ৫টি অঙ্গ আছে। এজন্য বিজিগীষু রাজা ও তাহার অমাত্যাদি ৫টি অঙ্গ মিলিতভাবে ৬টি হইল। এইরূপ বিজিগীষুর মিত্র ও তাহার অমাত্যাদি ৫টি অঙ্গ মিলিতভাবে ৬টি হইল এবং বিজিগীষুর মিত্রের মিত্র ও তাহার অমাত্যাদি ৫টি অঙ্গ মিলিতভাবে ৬টি হইল। এইরূপে ১৮টি অবয়বযুক্ত বিজিগীষুর সহিত সম্বদ্ধ একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ ১। অরি, ২। তাহার মিত্র ও ৩। তাহার মিত্রের মিত্র এই তিনটি প্রকৃতিরাজার মূলপ্রকৃতি অরি এবং প্রত্যেকটি রাজারই অমাত্যাদি ৫টি করিয়া অঙ্গ আছে—এজন্য এই ৫টি অঙ্গের সহিত মিলিত অরি এবং ৫টি অঙ্গের সহিত মিলিত অরির মিত্র ও ৫টি অঙ্গের সহিত মিলিত অরির মিত্রের মিত্র এইরূপে ১৮টি অবয়ব যুক্ত অরির সহিত সংবদ্ধ একটি মণ্ডল হইবে। এইরূপ মধ্যম রাজার সহিত সংবদ্ধ ১৮টি অবয়বযুক্ত একটি মণ্ডল, এইরূপ উদাসীন রাজার সহিত সংবদ্ধ ১৮টি অবয়বযুক্ত একটি চতুর্থ মণ্ডল হইবে।

এইরূপে চারিটি মণ্ডলে ১২টি রাজা হইবে—ইহাদিগকেই দ্বাদশরাজ প্রকৃতি বলা হয়। আর এই ১২টি রাজার প্রত্যেকের অমাত্যাদি ৫টি করিয়া অঙ্গ আছে বলিয়া দ্বাদশ রাজার ৬০টি অঙ্গকে ৬০টি দ্রব্য প্রকৃতি বলা হয়। ১২টি রাজপ্রকৃতি ও ৬০টি দ্রব্য প্রকৃতি মিলিতভাবে ৭২টি হইল। এই ৭২টির প্রত্যেকটির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, সম্পদ ও বিপদ এই পৈতামহ তন্ত্রে আলোচিত হইয়াছে।

আর এই কথাগুলি মনু ৭ম অধ্যায়ে ১৫৫-১৫৬ ও ১৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। পৈতামহতন্ত্রেও যাহা বলা হইয়াছিল মনুসংহিতাতেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে যে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাতেও ইহাই বলা হইয়াছে। ইহা বস্তুর স্বভাব এজন্য এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল বর্ত্তমানেও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকিবে। বস্তুর স্বভাব কালভেদে বদলাইয়া যায় না।

এই প্রদর্শিত দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এই ষাড়্গুণ্যের চিন্তাকে দ্বাদশ রাজিক মণ্ডলের চিন্তা বলা হয়—ইহা পৈতামহ তন্ত্রে বলা হইয়াছে, এবং প্রধান পুরুষগণের শরীররক্ষার্থ সংবাহন, অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, অনুলেপনাদি কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই তন্ত্রে দেশধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম এবং নানাবিধ কুলধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থ এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থলাভের নানাবিধ উপায় এই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

চাতুর্ব্বর্ণ্য সমন্বিত মনুষ্য সমাজের রক্ষার জন্য, অত্যন্ত অধার্ম্মিক শত্রুরাজ্য বা জনগণ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ মনুষ্য বিধ্বংসী আপদসমূহ হইতে অন্য কোন প্রকারে মনুষ্যসমাজ রক্ষার উপায় না থকিলে "মূল কর্ম্মক্রিয়া" করিবার উপদেশ এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই মূলকর্ম্ম দ্বারা অত্যন্ত অধার্ম্মিক শত্রুগণের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। নানাবিধ অত্যুৎকট বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ দ্রব্যদ্বারা শত্রুরাজ্যের জল দূষিত করা যায়। এই সমস্ত বিষাক্ত দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম রাশিদ্বারা বায়ূলমণ্ডল দূষিত করা যায় এবং বিষাক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে শত্রুরাজ্যে ব্যবহার্য্য অন্ন ও বস্ত্র বিষাক্ত করা যায় এবং পশুগণের ব্যবহার্য্য ঘাস প্রভৃতি বিষাক্ত করা যায়। উৎকট বিষাক্ত উদ্ভিজ্জাদির সাহায্যে জল বায়ু প্রভৃতি দূষিত করিয়া অতিনৃশংস অধার্ম্মিক শত্রুর বিনাশের ব্যবস্থা এই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, অধার্ম্মিক শত্রুর বিনাশের জন্য নানা উপায়ে

বিষাক্ত উদ্ভিজ্জাদির প্রয়োগকেই মূলকর্ম্ম বলে। এই মূলকর্ম্ম যদি সাধারণ লোকের প্রতি প্রযুক্ত হয় তবে তাহা গুরুতর অধর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

মনু ৯ম অধ্যায়ে ২৯০ শ্লোকে মূলকর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর গুরুতর রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ বশীকরণাদি কর্ম্মকারীরও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু পৈতামহতন্ত্রে যে মূলকর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে তাহা অধর্ম্ম নহে। নিরাপরাধ বহু লোকের রক্ষার জন্য অতিশয় দুর্দ্দান্ত অধার্ম্মিকের বিনাশ, রাজ্যরক্ষার উপযোগী বলিয়া তাহা ধর্ম্মই বটে। যেমন বহুনরহন্তা দস্যুর হত্যা ধর্ম্মই বটে। বহু নিরপরাধের রক্ষার জন্য সাপরাধ ব্যক্তির বিনাশ পরম ধর্ম্ম। যাঁহারা হিংসা মাত্রকেই অধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন তাঁহারা হিংসার ভয়ে দুর্বৃত্ত জনের হিংসা হইতে বিরত হইয়া, দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক সাধুজনের হিংসার অনুমোদনই করিয়া থাকেন। গোযূথে প্রবিষ্ট ব্যাঘ্রাদির অহিংসা দ্বারা বস্তুত গোযূথেরই হিংসা করা হয়। এজন্য মহাভারতের রাজ-ধর্ম্ম প্রকরণের ১৫শ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "অহিংসা সাধুহিংসেতি শ্রেয়ান্ ধর্ম্মপরিগ্রহঃ" ইহার অভিপ্রায় যাহারা সর্ব্বত্র একান্ত অহিংসারই পক্ষপাতী, তাঁহারা সাধুজনের হিংসার সমর্থক।

সাধুজনের রক্ষার জন্য দুর্বৃত্তের হিংসা ধর্ম্মই বটে। মনু ৫ম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য অহিংস্র প্রাণীগণকে বধ করে, সে জীবিতাবস্থায় ও পরলোকে কোন স্থানেই সুখলাভ করিতে পারে না। এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন—মনু শ্লোকে অহিংস্র প্রাণীর বধ নিষিদ্ধ হওয়ায় সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণীসমূহের বধ নিষিদ্ধ হয় নাই—সুতরাং অহিংস্র প্রাণীর প্রতিই অহিংসা প্রযুক্ত হইবে হিংস্র প্রাণীর প্রতি নহে। এই মূলকর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ আলোচনা, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধিকরণে বলা হইয়াছে। পৈতামহ তন্ত্রে শত্রু রাজগণকে বশীভূত করিবার জন্য নানাবিধ মায়াযোগ বর্ণিত হইয়াছে এবং শত্রুরাজ্যের নদীসমূহের জল দূষিত করিবার জন্য নানাবিধ ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং শত্রুরাজ্যের নদী সমূহের জল দূষিত করিবার জন্য নানাবিধ মায়াযোগ বর্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ আর্য্যজনোচিত পথ হইতে বিচলিত না হইয়া সৎপথে দৃঢ় থাকে সে সমস্ত উপায়ই এই পৈতামহ তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈশালাক্ষতন্ত্র

পৈতামহ তন্ত্রের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক ভগবান্ উমাপতিশঙ্কর যে তন্ত্র প্রণয়ন করেন তাহার নাম বৈশালাক্ষতন্ত্র। ভগবান্ শঙ্করই নীতিশাস্ত্রে বিশালাক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছেন এজন্য বিশালাক্ষশঙ্কর প্রণীত গ্রন্থ বৈশালাক্ষতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা অতঃপর বৈশালাক্ষতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব—ভগবান্ আদি শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎশিষ্য বিশ্বরূপাচার্য্য— যিনি সুরেশ্বরাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই বিশ্বরূপাচার্য্য—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির "বালক্রীড়া" নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই টীকা রচিত হইবার বহুপরে ভগবৎপাদ বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির "মিতাক্ষরা" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মিতাক্ষরাকার, যাজ্ঞবল্ক্য আচার অধ্যায়ের ৮১ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিশ্বরূপাচার্য্যের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন এবং টীকার প্রারম্ভেও বিশ্বরূপ প্রণীত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বরূপাচার্য্য বালক্রীড়া টীকাতে বৈশালাক্ষতন্ত্র হইতে একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় বিশ্বরূপাচার্য্যের সময়ে বৈশালাক্ষতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৈশালাক্ষতন্ত্র কোথাও আছে কিনা ইহা নিরূপণ করা অসম্ভব।

বিজিগীষু রাজা রাত্রির চতুর্থ যামে তুর্য্য ঘোষাদির দ্বারা জাগ্রত হইয়া বিগত ক্লান্তি হইয়া স্বকীয় নিপুণ প্রজ্ঞার দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য বিষয় নিরূপণ করিবেন। নিপুণ ভাবে রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কারক নীতির নিরূপণ করিয়া

স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে চারসমূহ প্রেরণ করিবেন। রাজা স্বীয় নীতি চাতুর্য্যদ্বারা শত্রুরাজ্যের যে সমস্ত সচিববর্গকে শত্রুরাজ্যের প্রতি বিরক্ত ও বিজিগীষু রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত করিতে পারিয়াছেন, শত্রুরাজ্যের সচিবসমূহে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন—তাহাদের নিকটেও তাহাদের প্রতি অতিসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক চারবর্গ প্রেরণ করিবেন—এবং আটবিক রাজমণ্ডলের নিকট এবং স্বমণ্ডল গত রাজ মণ্ডলের নিকট চার বর্গ পাঠাইবেন—এই কথা ভগবান বিশালাক্ষ তাঁহার দণ্ডনীতি শাস্ত্রে বলিয়াছেন। দীর্ঘ দূরদর্শী বিজিগীষু রাজা, আটবিক রাজসমূহের নিকটে বন্যপ্রদেশে বিচরণশীল চারবর্গকে প্রেরণ করিবেন এবং স্বমণ্ডলস্থিত ও শত্রু মণ্ডলস্থিত রাজগণের নিকটে সেই সেই মণ্ডলে বিচরণশীল চার বর্গকে প্রেরণ করিবেন এবং যাহাদের নিকট চার বর্গ প্রেরিত হইবে—তাহাদের প্রতি সৎকার অর্থাৎ বহুমান প্রদর্শন করিবেন। "বন্যান্ বনগতৈ র্নিত্যং মণ্ডলস্থাং স্তথাবিধৈঃ। চারৈরালোচ্য সৎকুর্য্যাজ্জিগীষু র্দীর্ঘদূরদৃক্" বিশালাক্ষ সূত্র, যাজ্ঞবল্ক্য বালক্রীড়া আচারাধ্যায় ৩২৮ শ্লোক।

বার্হস্পত্যতন্ত্র

যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায় ৩০৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা বালক্রীড়াতে বিশ্বরূপাচার্য্য বার্হস্পত্যতন্ত্র হইতে কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ৩২৩ শ্লোকের টীকাতেও বার্হস্পত্য তন্ত্র হইতে একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৩০৭ শ্লোকের টাকাতে বিশ্বরূপাচার্য্য বার্হস্পত্যতন্ত্র হইতে সেনাপতির লক্ষণ, প্রতিহারের লক্ষণ, গজাধ্যক্ষের লক্ষণ, অশ্বাধ্যক্ষের লক্ষণ, দূতের লক্ষণ, মন্ত্রীর লক্ষণ ও উপরিকের লক্ষণ বলিয়াছেন।

১। সেনাপতি—স্বধর্ম্মবিৎ, রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত, উপধাশুদ্ধ, অনুদ্ধত, অদাম্ভিক, উৎসাহী, দেশবিদ্, দণ্ডনীতিবিদ্, বেদ ইতিহাস কুশল, কামজ ক্রোধজ ব্যসনরহিত, শান্তস্বভাব, অর্থশাস্ত্রোক্ত নীতি প্রয়োগে নিপুণ, হস্তী অশ্ব পদাতিসমূহের আচার ও আহারাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে নিশ্চিত বুদ্ধি অর্থাৎ কত সময়ে কত পথ অতিক্রম করিতে পারে তাহাতে অভিজ্ঞ, স্বপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ চতুরঙ্গিণী সেনার অধিনায়ক সেনাপতি হইবে।

২। প্রতিহার—সৎকূল সম্ভূত, উৎসাহশীল, শান্তপ্রকৃতি, গম্ভীরাশয়, সময়চিত্ত, (যুদ্ধে উৎসুক) বীর, রাজার প্রতি অনুরক্ত এবং শত্রুগণের অভেদ্য সৈন্যসমাবেশে বিশেষজ্ঞ এবং ইঙ্গিতাকার কুশল প্রতিহার হইবে।

৩। গজাধ্যক্ষ—হস্তিবন হস্তীর জাতিবিশেষ ও হস্তীর অনুকূল ও প্রতিকূল কালের বিশেষজ্ঞ, হস্তীর অনুকূল আহারাদির বিশেষজ্ঞ, হস্তীর গুণ বয়স স্বভাব ও আয়ু বিষয়ে অভিজ্ঞ, অরণ্য হইতে হস্তী সংগ্রহে কুশল, হস্তীচালনাতে সুদক্ষ, নির্ভীক, রাজার বিজয়ে আগ্রহ সম্পন্ন ব্যক্তি গজাধ্যক্ষ হইবে।

৪। অশ্বাধ্যক্ষ—অশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ, অর্থাৎ কোন দেশে ভাল ঘোড়া জন্মে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, অশ্বের জাতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, অশ্বের অনুকূল ও প্রতিকূল আহার বিষয়ে অভিজ্ঞ, অশ্বের গুণ, লক্ষণ ও তাহার চালন বিষয়ে অভিজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্, অত্যন্ত অভ্যাসী, উপধাশুদ্ধ এবং অনুদ্ধত, রাজার অনুকূল ব্যক্তি অশ্বাধ্যক্ষ হইবে।

৫। দূত—শত্রুভাবাপন্ন রাজগণের সন্ধিস্থাপনে অভিজ্ঞ এবং পরস্পর মিলিত রাজগণের সন্ধি ভেদনে অভিজ্ঞ এবং কিরূপ ক্ষেত্রে সন্ধি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহাতে অভিজ্ঞ, রাজার প্রতি অনুরক্ত, উপধাশুদ্ধ, দক্ষ, অবিস্মরণশীল, দেশ কাল অভিজ্ঞ, দর্শনীয় প্রকৃতি, নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বাগ্মী দূত হইবে।

৬। মন্ত্রী—যাহার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধবুদ্ধি, মানবঅর্থশাস্ত্র, বার্হস্পত্য-অর্থশাস্ত্র ও ঔশনস অর্থশাস্ত্রকুশল, দণ্ডনীতি প্রয়োগ কূশল, শাঠ্য ও কৌটিল্য রহিত, সম্মান অসম্মানে অবিকৃত বুদ্ধি, নির্ভীক, অনুষ্ঠেয় ও অননুষ্ঠেয় কার্য্য নিরূপণে অপ্রতিহত বুদ্ধি, শত্রুগণের কুচক্রে যাহার বুদ্ধি বিমুগ্ধ হয় না, যে কোনও অবস্থায়ই শত্রুপক্ষে যোগ দেয় না, ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা, এই চতুর্ব্বিধ উপধা বিশুদ্ধ এবং কোন অবস্থাতেই যে মন্ত্রণাকে প্রকাশ করে না, এতাদৃশ গূঢ়মন্ত্র ব্যক্তি মন্ত্রী হইবে।

৭। উপরিক—সমস্ত অবস্থায় অবিকৃত বুদ্ধি, অবিকল ইন্দ্রিয়, প্রতাপবান্, সুন্দরমূর্ত্তি, প্রসন্ন মুখ, অকৃপণ, অপ্রমাদী, কার্য্যদক্ষ, অনুকূল বুদ্ধিসম্পন্ন, চরিত্রবান্ এবং বিভিন্ন সংদিগ্ধ বিষয়ের নির্ণয়কর্ত্তা, উপরিকপদে অধিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক বিভাগে কৃতাকৃত দর্শনকারী পুরুষকে উপরিক বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায়ে ৩২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বিশ্বরূপাচার্য্য আরও একটি সূত্র বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা রাত্রির ৪র্থ যামে বেদধ্বনি শঙ্খ শব্দ, স্তুতি পাঠক বন্দিমাগধ প্রভৃতির স্তুতি শব্দে পুণ্যাহশব্দে নিদ্রাত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক অথবা দেবগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে মনে মনে প্রণাম করিয়া, উপধাশুদ্ধ অবঞ্চক গৃহীতশস্ত্র, অতিশয় বিশ্বস্ত, আসন্ন পরিচর পুরুষগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাষ্ট্রের আয় ব্যয় দর্শন করিবেন।

বালক্রীড়া টীকাতে অতি প্রাচীন বৈশালাক্ষতন্ত্র ও বার্হস্পত্য তন্ত্র হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বালক্রীড়ার পরবর্ত্তী টীকাকারগণ, প্রাচীন রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে কোন কথা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। মনে হয় তাঁহাদের সময়ে এই তন্ত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃত সিরিজ্ হইতে প্রকাশিত বালক্রীড়া টীকার সম্পাদন করিয়াছেন।

মঃ মঃ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে—বালক্রীড়া টীকাতে প্রাচীন বৈশালাক্ষতন্ত্রের অংশ বিশেষ ও বার্হস্পত্য তন্ত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইলেও, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র হইতে কোন অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয় নাই। কৌটিল্য, যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির তাৎপর্য্য বর্ণন করিবার জন্য, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের উক্তির উল্লেখ করা বালক্রীড়া টীকাকার সঙ্গত মনে করেন নাই। কৌটিল্যের উক্তির অনুদ্ধরণ টাকাকারের সঙ্গতই হইয়াছে।

মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ের ১৮২ পৃষ্ঠাতে বালক্রীড়াকার কৌটিল্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ে ৩০৪ শ্লোক হইতে ৩০৬ শ্লোক পর্য্যন্ত তিনটি শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্য বিজিগীষু নরপতির যে গুণগুলি বলিয়াছেন, এই গুণগুলি বিজিগীষু নরপতির শত্রু রাজারও যদি থাকে তবে তাদৃশ শত্রু নরপতি, অতি কষ্টোচ্ছেদ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকে উচ্ছেদ করা যায় না। কিন্তু বিজিগীষু নরপতির গুণের বিপরীত গুণ সম্পন্ন যদি বিজিগীষুর শত্রু রাজা হয় তবে তাদৃশ শত্রু রাজা সুখোচ্ছেদ্য হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মগুলি থাকিলে শত্রু রাজা সুখোচ্ছেদ্য হয় সেই ধর্ম্মগুলিকে নীতিশাস্ত্রে শত্রুসম্পদ বলা হইয়াছে। এই শত্রু সম্পদ প্রদর্শন করিবার জন্য বালক্রীড়া টীকাকার, কৌটিল্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বাক্যের অর্থ—"শত্রু রাজা যদি রাজবংশীয় পুরুষ না হন, এবং লোভ পরতন্ত্র হন, এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের লোকগুলি যদি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন বা দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন হয়, রাজার অমাত্যাদি যদি রাজার প্রতি বিরক্ত থাকে, এবং শত্রু রাজা যদি অন্যায়কারী হন অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান না করেন, এবং উত্থানশীল না হন, এবং কামজ ক্রোধজ ব্যসনযুক্ত হন, এবং যদি উৎসাহশূন্য এবং বিবেচনা করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, এবং শত্রু রাজার বিপৎকালে যদি তাহার কোন বিশেষ আশ্রয় না থাকে অর্থাৎ

তাহার বিশিষ্ট দুর্গাদি না থাকে—অথবা তাঁহার কোন শ্রেষ্ঠ নরপতি মিত্র না থাকে, এবং তিনি যদি প্রজাপীড়ক হন, তবে এতাদৃশ শত্রু সম্পদযুক্ত নরপতি, বিজিগীষু রাজা দ্বারা অনায়াসে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

এই বাক্যটি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধিকরণের ১ম অধ্যায়ে আছে এবং বালক্রীড়াকার তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌটিল্যের বাক্য হইতে মাত্র ২টি পদ বালক্রীড়া টীকাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ইহা লেখকের প্রমাদের জন্যই এইরূপ হইয়াছে। এই আচারাধ্যায়ে ৩৪৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও বালক্রীড়াকার একটি কৌটিল্যের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বাক্যটি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ৭ম অধিকরণের ৫ম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। এই বাক্যটির অভিপ্রায় এই যে—মন্ত্রশক্তি প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তিযুক্ত বিজিগীষু রাজা, যাতব্য নরপতি ও চিরশত্রু নরপতি এই উভয়েই যদি তুল্য ব্যসন যুক্ত হয় তবে বিজিগীষু রাজা প্রথমতঃ যাতব্য নরপতির উচ্ছেদে প্রবৃত্ত না হইয়া, চিরশত্রু নরপতির উচ্ছেদেই প্রবৃত্ত হইবেন, এবং শত্রুরাজার উচ্ছেদ করিয়া পরে যাতব্য রাজার উচ্ছেদ করিবেন। এস্থলে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের বাক্যটি বালক্রীড়া টীকাতে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে, তাহার কারণ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের অপরিজ্ঞান। লেখক ও পাঠকগণ কৌটিল্যঅর্থশাস্ত্র অনুশীলন করেন নাই বলিয়া কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের বাক্যটি বালক্রীড়া টীকাতে কিঞ্চিৎবিকৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কৌটিল্য যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী বলিয়া কৌটিল্যের বাক্য দ্বারা বালক্রীড়াকার ব্যাখ্যা করেন নাই, এইরূপ যাহা গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। অমরকোষাদির বাক্য দ্বারা টীকাকার গণ অতি প্রাচীন গ্রন্থেরও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন সুতরাং পরবর্ত্তী গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে এরূপ বলা যায় না।

বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র হইতে বহুবাক্য কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা বালক্রীড়াতেও বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের নিকট সম্পূর্ণ বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র উপলব্ধ না থাকিলেও এই শাস্ত্র যে বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতে প্রচলিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কয়েকটি স্থানেও বার্হস্পত্য নীতি শাস্ত্র হইতে যে বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, এস্থলে আমরা সেই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রের পরিচয় প্রদান করিব। এস্থলে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের একজন প্রধান আচার্য্য ভগবান্ ভরদ্বাজ, বৃহস্পতিরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, এই কথা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ৩০ অধ্যায় ২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"তমুবাচ ভরোদ্বাজো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বৃহস্পতেঃ"। সুতরাং বৃহস্পতি ও তাঁহার পুত্র ভরদ্বাজ দুই জনই দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেও ভরদ্বাজ প্রণীত দণ্ডনীতি শাস্ত্র হইতে বহুবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

শান্তিপর্ব্ব ২৩ অধ্যায় ১৪-১৫ শ্লোকে বার্হস্পত্যনীতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে অপর রাজগণের সহিত বিরোধে অনিচ্ছুক-রাজা এবং প্রবাস গমনে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই পৃথিবী গ্রাস করিয়া থাকে—যেমন সর্প, গর্ত্তনিবাসী মূষিকাদি প্রাণী ভক্ষণ করিয়া থাকে। শান্তিপর্ব্ব ৫৬ অধ্যায় ৩৮ শ্লোকে বার্হস্পত্যনীতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে রাজা যদি কেবল ক্ষমাশীলই হন, দণ্ড প্রয়োগে সামর্থ্য না থাকে তবে নীচ ব্যক্তিরাও তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করে, যেমন হস্তীপক হস্তীর মস্তকে আরোহণ করিয়া থাকে এজন্য রাজা অতি মৃদু বা অতি তীক্ষ্ণ হইবেন না কিন্তু বসন্তকালীন সূর্য্যের মত মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। বসন্তকালীন সূর্য্য শীতকালীন সূর্য্যের মত অতি মৃদুও নহে এবং গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের মত অতি তীক্ষ্ণও নহে।

শান্তি পর্ব্ব ৫৮ অধ্যায়ের ১২ হইতে ১৮ শ্লোকেও বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন "রাজা সর্ব্বদা উত্থান পরায়ণ হইবেন অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যে উদ্যোগ সম্পন্ন হইবেন অলস হইবেন না, উত্থানই রাজধর্ম্মের মূল। ইহার দৃষ্টান্তরূপে বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে—দেবতাগণ উত্থান সম্পন্ন বলিয়াই অমৃত লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উত্থান সম্পন্ন বলিয়াই তাঁহারা অসুরগণকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন এবং উত্থান সম্পন্ন বলিয়াই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল বাক্যবীর তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট পুরুষ, যাঁহারা উত্থানবীর তাঁহারাই উৎকৃষ্ট পুরুষ। বাক্‌বীরগণ উত্থানবীরের স্তুতি পাঠদ্বারা তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। বিষরহিত সর্প যেমন অনায়াসে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এইরূপ রাজা বুদ্ধিমান হইয়াও উত্থানহীন হইলে শত্রুগণ দ্বারা ধর্ষিত হইয়া থাকেন।

অতি বলশালী বিজিগীষু রাজা, দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করিবেন না। দুর্ব্বল শত্রুও অতিশয় অনিষ্ট করিতে পারে, অল্প অগ্নিও গ্রাম নগর অরণ্যাদিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, অল্প বিষও প্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। দুর্ব্বল শত্রুও যদি কোনরূপে কিঞ্চিৎ বল লাভ করিতে পারে অথবা দুর্গ আশ্রয় করিতে পারে, তবে রাজার রাজ্যকেও ধ্বংস করিতে পারে। শান্তি পর্ব্ব ৬৮ অধ্যায়ে বার্হস্পত্য তন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া বহুকথা বলা হইয়াছে। কোশলরাজ "বসুমনাকে" বৃহস্পতি যে রাষ্ট্রনীতির উপদেশ করিয়াছিলেন সেই উপদেশগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন রাষ্ট্রবাসী সমস্ত জনগণের কল্যাণের মূল রাজা। রাষ্ট্রনিবাসী প্রজাগণ কেবলমাত্র রাজদণ্ড ভয়েই পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। রাজাই সমস্ত লোককে প্রসাদ যুক্ত করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিদ্যা ও ধনাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। রাজা স্বীয় রাজ্যকে সমৃদ্ধ করিয়া নিজেও সমৃদ্ধভাবে বিরাজমান থাকেন, রাজা না থাকিলে রাজ্যের সমস্ত প্রজাই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ না থাকিলে সমস্ত প্রাণীগণ পরস্পর অবলোকন করিতে না পারিয়া ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকে—যেমন অল্পজল পঙ্কিল তড়াগাদিতে মৎস্য সমূহ স্বেচ্ছানুসারে পঙ্কস্থিত মৎস্য সমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে। রাজা না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পর আক্রমণ ও ধর্ষণ করিয়া অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রক্ষক বিহীন পশুগণ যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয় এইরূপ অরাজক রাজ্যের প্রজারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজশূন্য রাজ্যে বলবান্ প্রজাগণ দুর্ব্বল প্রজাগণের ধন শ্রী বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া থাকে। যদি দুর্ব্বল তাহাতে বাধা প্রদান করে তবে তাহারা প্রবল প্রজাগণ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে রাজাই একমাত্র প্রজাগণের রক্ষক। রাজা না থাকিলে প্রজাগণের কোনও বস্তুতেই স্বত্ব থাকিতে পারে না। এই ধন, এই ক্ষেত্র, এই বাড়ী, আমার—ইহা আর কেহই বলিতে পারে না। স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতি কিছুতেই মানুষের অধিকার থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের পরিচালক রাজা না থাকিলে সমস্ত মর্য্যাদাই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়—প্রজাগণের নানাবিধ যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং নানাবিধ রত্নসমূহ, দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়া থাকে, রাষ্ট্রের ধার্ম্মিকগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচার এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে যদি রক্ষক রাজা না থাকে। মাতা, পিতা, আচার্য্য, বৃদ্ধ, অতিথি, গুরু প্রভৃতি নানারূপে ক্লিষ্ট ও হিংসিত হইত, যদি রাষ্ট্ররক্ষক রাজা না থাকিত। ধনিগণ বধবন্ধনাদি নানাবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইত, যদি রাজা রক্ষা না করিত। রাষ্ট্রের সমস্ত লোক দস্যুর কবলে পতিত হইত—মৃত্যু অকালে রাজ্যবাসীকে গ্রাস করিত—রাষ্ট্র ঘোর নরকে পরিণত হইত, যদি রাজা পালন না করিত। দুর্বৃত্তগণ নির্ব্বাধে নারী-ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইত—কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি উচ্ছিন্ন হইত। ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও বেদের বিলোপ হইয়া যাইত—যদি রাজা পালন না করিত। যজ্ঞাদি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্ছেদ হইত—বিবাহ সমাজ প্রভৃতি বিলুপ্ত হইত, যদি রাজা পালন না করিত। সমস্ত পশুপাল্য উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, বৃষ সমূহ আর ভূমি কর্ষণে নিযুক্ত হইত না—দুগ্ধ দধি ঘৃত প্রভৃতিও থাকিত না। সমস্ত রাষ্ট্র ত্রস্ত উদ্বিগ্ন ও হাহাকারে পরিব্যাপ্ত হইত এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত

হইত, যদি রাজা পালন না করিত। দীর্ঘসময় সাধ্য বহু দক্ষিণা যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তপস্বী ব্রাহ্মণগণ আর বেদ সমূহ অধ্যয়ন করিত না। আর বিদ্যাস্নাতক ও ব্রতস্নাতক কেহই থাকিত না—ধর্ম্মের নাম উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। লোক সমূহ অকারণ বিনাশ প্রাপ্ত হইত এবং লোকহত্যাকারীরা নির্ভয়ে বিচরণ করিত, যদি রাজা পালন না করিত। দস্যুগণ বলপূর্ব্বক অন্যের ধন হরণ করিত এবং দস্যুগণের মধ্যেও পরস্পর বলপূর্ব্বক একে অন্যের ধন হরণ করিত, যদি রাজা পালন না করিত। সমস্ত মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইত, ভয়ার্ত্ত হইয়া লোক চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইত—সমস্ত দুর্নীতি নির্ব্বাধ গতিতে চলিতে থাকিত, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইত, ঘোর দুর্ভিক্ষ রাজ্যকে গ্রাস করিত যদি রাষ্ট্রের পরিপালক না থাকিত।

রাষ্ট্র রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে—রাষ্ট্রবাসী জনগণ গৃহের সমস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যায়—যদি রাজা রাজ্য পরিপালন করেন। রাজরক্ষিত রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কাহাকেও অপরের অধিক্ষেপ সহ্য করিতে হয় না। একে অন্যের ধন অপহরণ করিতে পারে না। সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত রমণীগণ রক্ষক পুরুষ বর্জ্জিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে—যদি রাজা রাষ্ট্রের রক্ষক থাকেন। রাজরক্ষিত রাষ্ট্রে ধর্ম্মের বৃদ্ধি, সমস্ত হিংসার নিবৃত্তি এবং পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। রাজরক্ষিত রাষ্ট্রে মহাযজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান এবং সর্ব্ববিধ বিদ্যার নির্ব্বাধ অধ্যয়ন প্রবৃত্ত থাকে। কৃষি বাণিজ্য পশুপালন প্রভৃতি অর্থোৎপাদক বার্ত্তা কর্ম্ম যাহা দ্বারা এই লোক রক্ষিত হইয়া থাকে—তাহা সমস্ত নির্ব্বাধে প্রবৃত্ত থাকে—যদি রাজা রক্ষক থাকেন। রাজ্য রক্ষার জন্য রাজা যখন দত্তচিত্ত থাকেন—রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সমস্ত আয়োজন রাজা যখন পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করেন, তখন রাষ্ট্রের প্রজাকূল অত্যন্ত প্রসন্ন মনে সেই রাজ্যে বাস করে। যাহার অভাবে সমস্তের অভাব এবং যে থাকিলে সমস্ত কিছুই অক্ষুণ্ন থাকে তেমন রাজার প্রতি কাহার না শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে? রাজা রাষ্ট্রের যে ভয়াবহ গুরুভার বহন করেন, সেই রাজার প্রিয় ও হিতকার্য্যের অনুষ্ঠাতা ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকেন। রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত রাজ্যের যে ব্যক্তি এইরূপ রাজার অনিষ্ট মনেও চিন্তা করে—তাহার ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে। রাজাকে মনুষ্য বোধে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। কোন মহতী দেবতাই মনুষ্যরূপে রাজাসনে উপবিষ্ট আছেন মনে করিবে।

এই কথাটি মনুসংহিতারও ৭ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রের রক্ষক রাজা প্রয়োজনানুসারে পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কখনও অগ্নি, কখনও সূর্য্য, কখনও মৃত্যু, কখনও বৈশ্রবণ, কখনও যম। যে সময়ে রাজা উগ্রতেজযুক্ত হইয়া পাপিষ্ঠগণের দণ্ডবিধান করেন তখন—রাজার অগ্নিমূর্ত্তি বলা হয়। যখন রাজা চার মণ্ডল দ্বারা সমস্ত রাষ্ট্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করেন এবং অবলোকন করিয়া রাষ্ট্রের নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—তখন রাজার সূর্য্যমূর্ত্তি বলা হয়। যখন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপিষ্ঠজনের উচ্ছেদসাধন করিয়া থাকেন তখন রাজার অন্তক মূর্ত্তি বলা হয়।

যখন রাজা সমদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অধার্ম্মিকগণকে তীক্ষ্ণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সৎকর্ম্মকারিগণকে অনুগ্রহ করেন তখন রাজার যমমূর্ত্তি বলা হয়। যখন রাজা ধনদ্বারা রাষ্ট্রবাসিগণকে অনুগৃহীত করেন এবং দুষ্কর্ম্মকারিগণের ধনরাশি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন তখন রাজার বৈশ্রবণ মূর্ত্তি বলা হয়; এই রাজাই সৎকর্ম্মকারীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া সৎকর্ম্মকারীকে নানাবিধ শ্রীদ্বারা ভূষিত করেন এবং দুষ্কর্ম্মকারীর সর্ব্ববিধশ্রীর ধ্বংস করেন তখন এই রাজাকে বৈশ্রবণ মূর্ত্তি বলা হয়। এই কথাগুলি মনু ৭|৭ শ্লোকে বলা হইয়াছেএবং বেদেও এই কথাগুলি অতিবিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার আচারাধ্যায়ে ৩৫০ শ্লোকের টীকা বালক্রীড়াতে এই শ্রুতিবাক্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাদৃশ রাজার বিরোধ করা রাষ্ট্রবাসী কাহারও সঙ্গত নহে।

রাজবিরোধী ব্যক্তি কখনও সুখী হইতে পারে না রাজার পুত্র ভ্রাতা বয়স্য প্রভৃতি যে কেহ হউক না কেন, কেহই রাজার অনিষ্ট করিয়া—সুখে অবস্থান করিতে পারে না। রাজবিরোধী ব্যক্তির পরিণাম বড় দুঃখময়। কোন অবস্থাতেই রাজার ধন অপহরণ করিবে না। মৃগ যেমন কূটযন্ত্র স্পর্শে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এইরূপ রাজস্ব হরণকারীও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রাজ্যবাসী প্রত্যেক প্রজা যেমন নিজের ধন রক্ষা করিবে সেইরূপ রাজস্বও রক্ষা করিবে। রাজস্বাপহারী ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। প্রজাগণকে রঞ্জিত করেন বলিয়া নরপতি "রাজা" নামে—প্রজাগণকে নানাবিধ সুখভোগের অধিকারী করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে—"ভোজ" নামে—বিবিধরূপে বিরাজমান থাকেন বলিয়া—"বিরাট" নামে—এবং অত্যন্ত শ্রীমান বলিয়া তাঁহাকে—"সম্রাট্" নামে—বিপদ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া "ক্ষত্রিয়" নামে—এবং পৃথিবীর সর্ব্ববিধ কল্যাণ করেন বলিয়া তাঁহাকে "পৃথিবীপতি" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। দণ্ডনীতিশাস্ত্রের এই সমস্ত কথা—বৃহস্পতি, কোশলরাজ "বসুমানকে" বলিয়াছিলেন। মহাঃ শান্তিপর্ব্ব ৬৮ অধ্যায় বৃহস্পতি নীতি।

শান্তি পর্ব্বের ১০৩ অধ্যায়ে ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে শত্রুগণের সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব।

শত্রুগণের সম্পূর্ণ বিনাশ না করিয়া কিরূপে আমি তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব? যুদ্ধদ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ করা যায় বটে, কিন্তু সেন্যবাহিনীর সাহায্যে যে যুদ্ধ, তাহাতে একান্ত জয়ের আশা নাই। সুতরাং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আমার প্রতাপ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত থাকিবে তাহা বলুন। ইন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে রাজধর্ম্মবিদ্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"হে দেবরাজ! কেবলমাত্র যুদ্ধদ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিতে প্রয়াস করিবে না—শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অসহিষ্ণুচিত্তে শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত বালকোচিত কার্য্য। যে শত্রুর বধও আকাঙ্ক্ষিত, তাহাকেও প্রকাশ্যভাবে শত্রুরূপে নির্দ্দেশ করিবে না। শত্রুর প্রতি ক্রোধ, শত্রুর প্রতাপে ভয়, এবং শত্রুর বিনাশে হর্ষ, এই তিনটিকেই নিজের মধ্যে অতি সংযতভাবে রক্ষা করিবে। কোনমতেই ক্রোধাদির প্রকাশ করিবে না। প্রয়োজনবশতঃ শত্রুর প্রতিও প্রকাশ্যভাবে আনুগত্য প্রকাশ করিবে। হৃদয়ে শত্রুর প্রতি ঘোর অবিশ্বাস রাখিয়াও বিশ্বস্তের মত ব্যবহার করিবে। শত্রুকেও নিত্য প্রিয় বাক্য বলিবে—তাহার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করিবে না। কোনস্থলেই শুষ্কবৈর করিবে না। যে শত্রুতায় লাভ নাই কেবল ক্রোধ মাত্রের শান্তি হয় তাহাকেই শুষ্কবৈর বলে।

শত্রুর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া কখনও ক্রোধের শান্তি করিবার প্রয়াস করিবে না। যাহারা পক্ষী বন্ধন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে অর্থাৎ ব্যাধজাতীয় ব্যক্তি, তাহাদিগকে "বৈতংশিক" বলে। এই বৈতংশিকগণ যখন যে পক্ষীকে ধরিতে প্রয়াস করে—তখন সেই পক্ষীর মত শব্দ করে—পক্ষীশব্দের সমানজাতীয় শব্দ করিয়া পক্ষীকে বৈতংশিক নিজের প্রতি বিশ্বস্ত করে—পক্ষী বৈতংশিকের প্রতি বিশ্বস্ত হইলে বৈতংশিক অনায়াসে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া থাকে—মহীপতিও এই বৈতংশিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে বশীভূত করিবেন ও তাহাদের বিনাশ সাধন করিবেন। বৃহস্পতি আরও বলিয়াছিলেন যে শত্রুকে পরাজিত করিয়াও শত্রুর জেতা যেন কখনও নিশ্চিন্ত না থাকেন—কারণ শত্রুপরাজিত হইলেও তাহার প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে। শত্রু প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত অবস্থিত থাকিয়া সুযোগের অপেক্ষা করে ও সুযোগ পাইলেই প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। শত্রুর প্রতি ক্রোধ আছে বলিয়াই সহসা তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। যুদ্ধে সর্ব্বত্রই ঐকান্তিক জয় হয় না। এইজন্য শত্রুকে নিজের প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন করাইয়া ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিবে। শত্রু বশীভূত হইলে—মন্ত্রণাকুশল শ্রেষ্ঠ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাবধারণ করিবে। শত্রুকর্ত্তৃক উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত হইলেও রাজা কখনও হৃদয়ে পরাজিত হইবেন না—অপরাজেয় দুর্ব্বার বল, হৃদয়ে ধারণ করিবেন

এবং শত্রুর কোনও দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিলেই অর্থাৎ শত্রু কোন সময়ে বিপন্ন হইলেই তাহাকে আক্রমণ করিবেন। রাজা শত্রুর সহিত ব্যবহারে সর্ব্বদা অবিহিত থাকিবেন। অতিশয় বিশ্বাসী গুপ্তপুরুষগণ দ্বারা শত্রুরাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করিবেন। এইরূপে শত্রুরাষ্ট্রে অতি গুপ্তভাবে রাজা কার্য্য করিবেন। এবং গুপ্তকার্য্যে আদি মধ্য ও পরিসমাপ্তির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। শত্রুসৈন্যগণকে নানাবিধ উপায়ে শত্রু রাজার প্রতি বিরক্ত করিয়া তুলিবেন,—শত্রু সেনাগণের মধ্যে উৎকোচ প্রদান দ্বারা সৈন্যগণের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিবেন, এবং নানাবিধ ঔপনিষদিক প্রকরণোক্ত ঔষধাদির দ্বারা তাহাদিগকে যুদ্ধ কার্য্যে অনুপযুক্ত করিয়া তুলিবেন,—এই ঔপনিষদিক-প্রকরণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১৪শ অধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে।

বিজিগীষু রাজা সহসাই শত্রু রাজার প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। প্রদর্শিতরূপে শত্রুকে দুর্ব্বল করিতে যদি দীর্ঘ সময়ও অপেক্ষা করিতে হয়, বিজিগীষু রাজা তাহাও করিবেন। শত্রু রাজা যতকাল পর্য্যন্ত বিজিগীষু রাজার প্রতি বিশ্বস্ত না হয়, ততকাল অপেক্ষা করিবেন। কখনও তাড়াতাড়ি করিয়া শত্রুকে প্রকাশ্য আক্রমণ করিবেন না। যে রাজা নিশ্চিত জয়ে অভিলাস রাখেন তাঁহার কখনও তাড়াতাড়ি করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত নহে। শত্রু রাজার বৈমনস্য সৃষ্টি কারক কোন কাজ করিবেন না এবং দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিবেন না। বিজিগীষু রাজা নিজের সম্পূর্ণতা ও শত্রুর অসম্পূর্ণতা যখন বুঝিতে পারিবেন, তখন কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার উচ্ছেদ করিবেন—এমনভাবে উচ্ছেদ করিবেন যে সে যেন পুনর্ব্বার শত্রু হইয়া উঠিতে না পারে। শত্রু রাজাকে আক্রমণ করিবার কাল সর্ব্বদা থাকে না। কালাকাঙ্ক্ষী রাজা শত্রুর উচ্ছেদের কাল প্রাপ্ত হইয়াও যদি সেই সময় শত্রুর উচ্ছেদ না করেন, তবে আর তিনি শত্রুর উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। শত্রুর উচ্ছেদ যোগ্যকাল পুনঃ পুনঃ আসে না। শত্রুকে আক্রমণের অযোগ্যকালে বিজিগীষু রাজা নিজের মিত্র সংগ্রহে যত্নবান থাকিবেন, কিন্তু শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিবেন না। বিজিগীষু রাজা স্বীয় কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন। শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কার্য্যে রাজা কখনও উদ্যম রহিত হইবেন না। কেবল মৃদুতা, কেবল উগ্রতা, নিতান্ত অলসতা ও অসাবধানতা এই চারিটি মহাদোষ, অবিচক্ষণ নরপতিকে বিনাশ করিয়া থাকে। এই চারিটি মহাদোষ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ নরপতি শত্রুকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

গুপ্ত মন্ত্রণা সমস্ত মন্ত্রিগণের সহিত করা নিষিদ্ধ। যাহার সহিত যে বিষয়ের গুপ্তমন্ত্রণায় কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, মাত্র তাহার সহিতই সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করা উচিত। অনেকের সহিত গুপ্তমন্ত্রণা করিলে সে গুপ্ত মন্ত্রণা, অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—এবং এই মন্ত্রবিপ্লবই ঘোর অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে অন্য মন্ত্রিগণের সম্মতিগ্রহণ না করিলে তাহারাই এই গুপ্ত মন্ত্রের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে—তবে তাহাদের সম্মতিও লইতে হইবে। অতি গুপ্ত শত্রুর প্রতি অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মদণ্ড এবং প্রকাশ শত্রুর প্রতি চতুরঙ্গিনী সেনার দ্বারা প্রকাশ্যে দণ্ডের বিধান করিবে। গুপ্তভাবে শত্রুর রাজ্যে ভেদ উৎপাদন করা বিজিগীষু রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। পররাষ্ট্রে ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, অপমানিত ও ভীত পুরুষগণই বিজিগীষু রাজার ভেদপ্রয়োগের স্থান—এইজন্য ক্রুদ্ধাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষগণকে কৃত্যবর্গ বলা হয়। ক্রুদ্ধকে ক্রোধের প্রশমন দ্বারা, লুব্ধকে ধন দান দ্বারা, ভীতকে অভয় প্রদান দ্বারা, এবং অপমানিতকে সম্মান প্রদর্শন দ্বারা, শত্রুরাজা হইতে ভেদিত করা যায়, এইজন্য বিজিগীষু রাজা প্রথমতই এই কৃত্যবর্গে ভেদ প্রয়োগ করিবেন এবং এই ভেদ প্রয়োগ অতি গোপনে করিবেন।

মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, ও সেনাপতি—ইহারা ভেদিত হইলে শত্রুরাজা অনায়াসে উচ্ছেদযোগ্য হইয়া থাকে। এইজন্য রাজা ইহাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য অতি গুপ্তভাবে প্রয়াস করিবেন। ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত

ও অপমানিত এই চতুর্ব্বিধ পাত্রই ভেদের যোগ্য, পররাষ্ট্রে অমাত্য প্রভৃতি, কোন কারণবশতঃ ক্রোধ, লোভ, ভয় ও অপমান যুক্ত হইলে—সেই সময় তাহাদের মধ্যে ভেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আর ইহাই ভেদ প্রয়োগের কাল। শত্রু প্রবল হইলে—তাহার প্রতি দণ্ড প্রয়োগ সম্ভাবিত নহে বলিয়া প্রথমতঃ ভেদ প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে দুর্ব্বল করিতে হইবে। শত্রুরাষ্ট্রের অমাত্য প্রভৃতিকে ভেদ প্রয়োগ দ্বারা স্বপক্ষে আনিয়া পরে বিজিগীষু রাজা সেই শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন। শত্রুর উচ্ছেদে রাজা সর্ব্বদা প্রণিহিত থাকিবেন—কখনও অনবহিত হইবেন না,—শত্রু যখন অনবহিত থাকিবে—তখনই শত্রুর বধকাল—ইহা বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শত্রু প্রবল হইলে—বিজিগীষু রাজা তাহার নিকট আনত হইবেন—নানাবিধ দানে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস করিবেন ও তাহার প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন এইরূপে শত্রুরাজাকে সেবা করিতে বিজিগীষু রাজা কখনও দ্বিধাবোধ করিবেন না।

যে সমস্ত কার্য্য করিলে শত্রুরাজার মনে শঙ্কা হইতে পারে এইরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। শত্রুরাজার প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। শত্রু কখনও নিদ্রিত নহে—ইহা বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। নানা বিষয়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাহার পরিপালন অপেক্ষা দুষ্কর কার্য্য আর কিছুই নাই—এই ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই নানা বিঘ্ন হইয়া থাকে, এজন্য রাজা নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র নিরূপণ করিবেন। সমস্ত প্রকার মানুষবিঘ্নই শত্রুপক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজা একান্তই মৃদু হইলে সর্ব্বত্রই তাহাকে অবমানিত হইতে হয় এবং অতিতীক্ষ্ণ হইলে জনগণ রাজার নিকট হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে—এজন্য রাজা সর্ব্বদা মৃদু বা সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ হইবেন না—প্রয়োজনবশতঃ কোন সময়ে মৃদু কখনও তীক্ষ্ণ হইবেন।

বহুজল যুক্ত বেগবতী নদীর তীরভূমির যেমন সর্ব্বদাই বিনাশ শঙ্কা থাকে—এইরূপ প্রমাদী রাজার রাজ্যেরও সর্ব্বদা বিনাশ শঙ্কা থাকে। এজন্য রাজা রাজ্যরক্ষাতে কখনও প্রমাদী হইবেন না। বিজিগীষু রাজা কখনও এক সময়ে বহুশত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। কোন শত্রুর প্রতি সাম—কাহারও প্রতি দান, কাহারও প্রতি ভেদ প্রয়োগ করিবেন এবং কাহারও সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন।

দণ্ডদ্বারা এক একটি শত্রুর উচ্ছেদ করিয়া ক্রমে অপর শত্রুগুলিরও ক্রমশঃ দণ্ডদ্বারা উচ্ছেদ করিবেন। একটি শত্রুকে দণ্ডদ্বারা উচ্ছেদ করিবার সময়ে অপর শত্রুগণ যাহাতে বিক্ষুব্ধ না হয়, তাহার প্রতি রাজা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রচুরকোষ দণ্ডযুক্ত হইয়াও বিজিগীষু রাজা, বহু শত্রুর বিনাশে সমর্থ হইলেও বুদ্ধিমান বিজিগীষু রাজা, কখনও বহু শত্রুর সহিত যুগপৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না। বিজিগীষু রাজা যখন দেখিবেন হস্তী, অশ্ব, রথ ও গজাদি সৈন্য তাঁহার বহু সংগৃহীত হইয়াছে, মহতী সেনা যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত রহিয়াছে এবং যুদ্ধের উপযোগী নানাবিধ স্থির ও চল যন্ত্রের সুব্যবস্থা রহিয়াছে কোষ পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং যুদ্ধোপযোগী দেশ অনুকূল রহিয়াছে,—প্রচুর মিত্রাদি সংগৃহীত রহিয়াছে চতুরঙ্গিনী সেনা, সেনানায়ক ও অমাত্যবর্গ অনুরক্ত রহিয়াছে—বিজিগীষু রাজা নিজের এইরূপ বৃদ্ধি অবধারণ করিয়া এবং শত্রুপক্ষের এই বৃদ্ধি নাই—ইহা নিশ্চিত জানিয়া শত্রুর প্রতি প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া দস্যুগণের বিনাশ সাধন করিবেন। এই বার্হস্পত্য নীতির সারমর্ম্ম এই যে, প্রবল শত্রুর নিকটে সাম বাক্য ব্যর্থ জানিয়া তাহার প্রতি রহস্যদণ্ডের প্রয়োগ করিবেন—প্রবল শত্রুর প্রতি কখনও প্রকাশ্য ভাবে শত্রুর মত ব্যবহার করিবেন না কিন্তু নানাবিধ ছল উদ্ভাবন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয়ের ক্ষয় সাধন করিবেন। শত্রুর প্রতি একান্ত মৃদুতা ও যুদ্ধদ্বারা একান্ত তীক্ষ্ণতা কখনও প্রকাশ করিবেন না, এজন্য প্রচ্ছন্ন ভাবে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে দুর্ব্বল করিবেন।

বিজিগীষু রাজা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া শত্রুরাজগণকে পরস্পরের উচ্ছেদকামী করিয়া তুলিবেন। শত্রুর বল বিনাশের জন্য, তাহার নানাবিধ বৃদ্ধির প্রতিরোধের জন্য কপট নীতি প্রয়োগ করিবেন, বিজিগীষু রাজা

এমনভাবে নীতিপ্রয়োগ করিবেন যাহাতে তাঁহার প্রতি লোকের অবিশ্বাস বা সন্দেহ উৎপন্ন হইতে না পারে। অত্যন্ত বিশ্বাসী চারবর্গকে শত্রুরাজ্যে ও শত্রুর নগরে এমন ভাবে বিচরণ করাইবেন যাহাতে শত্রুরাষ্ট্রের সমস্ত ছিদ্র—বিজিগীষু রাজা জানিতে পারেন এবং তদনুসারে শত্রুর অবসাদের জন্য নানারূপ ব্যবস্থাও প্রচ্ছন্নভাবে অবলম্বন করিতে পারেন এবং বিজিগীষু রাজা স্বরাষ্ট্রমণ্ডলেও অত্যন্ত বিশ্বস্ত চারবর্গকে সর্ব্বদা বিচরণ করাইয়া স্বরাষ্ট্রের ছিদ্রসমূহ জানিবেন ও অতি দ্রুত তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

নানাবিধ উপায়ে শত্রুরাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে সমর্থ বুদ্ধিমান্ এবং অতিবিশ্বস্ত স্বরাষ্ট্রবাসী বিশেষপুরুষদিগকে নানাবিধ অপরাধে অপরাধী এইরূপ মিথ্যা অপরাধ কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া শত্রুর রাজ্যসমূহে ও শত্রুর নগরীসমূহে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। প্রকাশ্যভাবে ইহাদিগের ধন সম্পত্তি রাজা কাড়িয়া লইয়া গুপ্তভাবে বহুধন ইহাদিগকে প্রদান করিবেন।

নীতিজ্ঞ বিজিগীষু রাজা এইরূপে শত্রুরাজ্যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নীতি প্রয়োগ নিপুণ পুরুষগণকে প্রবেশ করাইয়া যেরূপে শত্রুরাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া থাকেন তাহার একটি বিবরণ দশকুমার চরিত কাব্যের ৮ম উচ্ছ্বাসে মহাকবি দণ্ডী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথমে তাহার আভাস দিয়াছি।

এইরূপে শত্রুপক্ষীয় রাজাও বিজিগীষুরাজমণ্ডলে যাহাতে এইরূপ গুপ্তশত্রুগণকে প্রবেশ করাইতে না পারে তাহার প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছে, যাহার চিত্ত বিরক্ত হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষ নিরূপণ করিবার উপায় কি? এমন কি চিহ্ন আছে যাহাদ্বারা দুষ্টভাবাপন্ন পুরুষকে বুঝিতে পারা যায়? এতদুত্তরে বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন যে দুষ্টভাবাপন্ন পুরুষ যে যাহার প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছে সে তাহার পরোক্ষে তাহার দোষ কীর্ত্তন করিবে, তাহার গুণ থাকিলেও তাহাতে নানারূপ কলঙ্ক আরোপ করিবে, অন্যেরাও যদি তাহার সদ্‌গুণ বলে তবে সে অধোমুখ হইয়া চুপ করিয়া থাকিবে, সে চুপ করিয়া থাকিলেও তাহার মধ্যে বহু বিকার লক্ষ্য করা যাইবে। সে পুনঃ পুনঃ নিজের ওষ্ঠ দংশন শিরকম্পন প্রভৃতি করিবে—তাহাতে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও সে অসংবদ্ধ বলিবে—অসাক্ষাতে অনুকূল কার্য্য করিবে না—সম্মুখেও ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু বলিবে না, পৃথক্‌ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিবে। একত্র ভোজনাদি করিবে না, শোয়া বসা প্রভৃতিতে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা যাইবে। দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী ইহাই মিত্রের লক্ষণ—ইহার বিপরীতই শত্রুর লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা অনায়াসে শত্রুমিত্র বুঝিতে পারা যাইবে। বৃহস্পতির এই সমস্ত নীতিবাক্য শ্রবণ করিয়া—শত্রুহন্তা ইন্দ্র যথাযথভাবে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং শত্রুগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমরা সূত্রাধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যে বার্হস্পত্য তন্ত্রের কথা বলিয়াছিলাম সেই সম্পূর্ণাঙ্গতন্ত্র সম্প্রতি উপলব্ধ না হইলেও ঐ তন্ত্রের কতিপয় সূত্র, যাহা বালক্রীড়া টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে—আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি, এবং মহাভারতেরও যে যে স্থলে বার্হস্পত্যতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে—তাহারও আমরা আভাস প্রদান করিয়াছি। এই তন্ত্র কি আকারে রচিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। মহাভারতে বার্হস্পত্যনীতি শ্লোকবদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—কিন্তু বালক্রীড়া টীকাতে সূত্রনিবদ্ধভাবে বার্হস্পত্যতন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতের রাজধর্ম্ম ২৩ অধ্যায় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বৃহস্পতি যে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্লোকনিবদ্ধ বাক্যও ছিল। আমরা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেও সূত্ররূপ ও শ্লোকরূপ বাক্য দেখিতে পাই, বার্হস্পত্যতন্ত্রও কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের মত সূত্রাত্মক ও শ্লোকাত্মক ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন গ্রন্থের নীতি অনুসারে ইহাই মনে হয় যে গদ্যাত্মক সূত্রবাক্য দ্বারা যে অধ্যায়টি রচিত হইয়া থাকে অধ্যায়ের

শেষে সেই অধ্যায়ের সারসঙ্কলনের জন্য কতিপয় শ্লোকও রচিত হইয়া থাকে। এই রীতি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে আছে এবং চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেও আছে—বেদের ব্রাহ্মণভাগেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারদ্বাজ নীতি

আমরা পূর্ব্বে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র ভরদ্বাজের কথা বলিয়াছি—বৃহস্পতি যেমন নীতিশাস্ত্রের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য, এইরূপ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজও নীতিশাস্ত্রের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য ছিলেন। মহাভারতের আপদ্‌ধর্ম্মের ১৪০ অধ্যায়ে এই ভারদ্বাজ নীতির আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারতের এই অধ্যায়ে নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য্যকে ভারদ্বাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজবংশোৎপন্ন এই জন্য ভারদ্বাজনীতি বার্হস্পত্যনীতিরই একটি শাখা।

যদিও আপদ্‌ধর্ম্মের ১৪০ অধ্যায়ে ভারদ্বাজপ্রোক্তনীতি বলা হইয়াছে তথাপি ভগবান্ ভরদ্বাজও নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন তাহা আমরা রাজধর্ম্ম পর্ব্বের ৫৮ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকের উক্তি অনুসারে প্রদর্শন করিয়াছি। এজন্য ভগবান্ ভরদ্বাজও বৃহস্পতির মত নীতিশাস্ত্রের প্রণেতা এবং ভরদ্বাজ প্রণীত শাস্ত্রও বার্হস্পত্য শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল ইহা বলা যাইতে পারে। আপদ্‌ধর্ম্মের ১৪০ অধ্যায়ে যে ভারদ্বাজনীতি বলা হইয়াছে ইহার অনুরূপ আর একটি অধ্যায় আদিপর্ব্বে আছে—আদিপর্ব্বের ১৪০ অধ্যায়ে যে "কণিকনীতি" বর্ণিত হইয়াছে—তাহাও এই ভারদ্বাজনীতিরই অনুরূপ, আমরা কণিকনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার বিশ্লেষণ করিব।

সৌবীররাজ শত্রুঞ্জয় একসময়ে ভারদ্বাজের নিকটে রাজনীতি জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন। রাজা শত্রুঞ্জয় ভারদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাজা কিরূপে অলব্ধ পৃথিব্যাদির লাভ এবং লব্ধের বিবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধিতের পরিপালন এবং পরিপালিত বস্তু, যোগ্য পাত্রে প্রদান করিবেন। ঠিক এইরূপ একটি কথা মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ৯৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে, এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ে ৩১৭ শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে। কামন্দক নীতিশাস্ত্রেও প্রথম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে অর্জ্জন, রক্ষণ, বর্দ্ধন ও দান এই চারিটি সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের মূল কথা—"এত চ্চতুর্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থপ্রয়োজনম্" এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে মহীপতি কখনও ব্রাহ্মণের মত লব্ধ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা অলব্ধ বস্তুর অর্জ্জন ও রক্ষণে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন, কোনও ব্যক্তি এরূপ মনে করে না যে, আমার যাহা ধন আছে ইহার আর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, আমার যাহা বিদ্যা আছে তাহার আর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, আমার যাহা স্বাস্থ্য আছে ইহার আর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, আমার যে আয়ু ভোগ করিয়াছি তাহার আর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই অনধিগত ধন ও বিদ্যাদির লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে, এইরূপ রাজাও অনধিগত মিত্র ভূমি ও ধনাদির অর্জ্জনে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন। যিনি নিজের বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করেন তাঁহার বৃদ্ধি না হইলেও অন্ততঃ লব্ধবস্তু রক্ষিত থাকে। আর যিনি বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করেন না, দেখা যাইবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার অনেক লব্ধবস্তুও হস্তচ্যুত হইয়াছে। বৃদ্ধির প্রয়াস যাঁহার নাই তাঁহার স্বভাবতঃই কৃতার্থম্মন্যতা আসিবে ও তাহাতে আলস্য ও ব্যসন অনিবার্য্যভাবে আসিবে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকারগণ সকলেই একবাক্যে ব্রাহ্মণের মত লব্ধ বস্তুতেই সন্তোষ, মহীপতির মহাদোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যাহা হউক সৌবীররাজ শত্রুঞ্জয়ের প্রশ্নের উত্তরে ভারদ্বাজ বলিয়াছিলেন যে রাজা সর্ব্বদা উদ্যতদণ্ড থাকিবেন অর্থাৎ উদ্‌যুক্ত থাকিবেন। হস্তী অশ্বাদি বলকেই দণ্ড বলে—রাজা সর্ব্বদা এই চতুরঙ্গ সেনার নানাবিধ

শিক্ষা বাহন-দমনাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া এই চতুরঙ্গিণী সেনাকে কার্য্যযোগ্য রাখিবেন, এবং হস্তী, অশ্ব পদাতি প্রভৃতির বস্ত্র উপকরণাদির নিত্য সঞ্চয় করিবেন। এইরূপে যিনি চতুরঙ্গিণী সেনাকে সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণাঙ্গ রাখিতে চেষ্টা করেন সেইরূপ মহীপতিকেই উদ্যতদণ্ড বলা হয়। উদ্যতদণ্ড কথার অর্থ এইরূপ নহে যে রাজা সর্ব্বদা লাঠি হস্তে করিয়া বসে থাকিবেন। সুশিক্ষিত চতুর্ব্বিধ সেনাকে যুদ্ধোপকরণযুক্ত রাখার নামই উদ্যতদণ্ডতা। রাজা সর্ব্বদা নিজের পৌরুষ প্রকাশ করিবেন। রাজ্যের সীমা রক্ষার জন্য প্রান্তপাল, প্রান্তস্থিত পর্ব্বত অরণ্যাদির রক্ষার জন্য অধিকৃত পুরুষগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত সন্নদ্ধ পুরুষগণকে জাগ্রত অবস্থায় রক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখিবেন। সর্ব্বদা পৌরুষ প্রকাশ করার অর্থ মুখে দাম্ভিক্য প্রকাশ করা নহে। মহাভারতের এই শ্লোকটীর অভিপ্রায় মনুর সপ্তম অধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে বলা হইয়াছে। রাজা সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষী হইবেন এবং নিজের ছিদ্রের আবরণ করিবেন। রাজার কোন বিষয় অরক্ষিত বা অন্যথা রক্ষিত, তাহাকেই রাজার ছিদ্র বলে। যেমন দুর্গের সংস্কার না করা, সেতু, বণিক্‌পথ প্রভৃতি না থাকা, কোষদণ্ডাদির অল্পতা প্রভৃতি সেই রাজ্যের ছিদ্র।

রাজা যেমন সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষী হইবেন এইরূপ রাজা নিত্য উদ্যত দণ্ড থাকিবেন। যেহেতু উদ্যতদণ্ড রাজার নিকট সকলেই ভীত হয়, এজন্য রাজা দণ্ড দ্বারাই সমস্তকে আত্মসাৎ করিবেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে দণ্ডই প্রধান। রাজার এই দণ্ড বিনষ্ট হইলে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। রাজা ও তাহার সমৃদ্ধি সমস্তেরই মূল দণ্ড। যাহার দণ্ড নাই তাহার কিছুই নাই। মূল ছিন্ন হইলে যেমন বৃক্ষ আর থাকিতে পারে না সেইরূপ দণ্ডের বিনাশেও রাজার কিছুই থাকিতে পারে না। রাজা শত্রুরাজার মূল ছেদনে যত্নবান্ হইবেন। অনন্তর শত্রুর মিত্রপক্ষীয় নরপতিদের উচ্ছেদে যত্নবান্ হইবেন। বিজিগীষু রাজা যেমন সুমন্ত্রণাপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাবধারণ করিবেন তদনুসারে বিক্রমপ্রদর্শন করিবেন এবং বিক্রমানুসারে যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইবেন। যে স্থলে যুদ্ধে জয়ের আশা নাই জানিবেন সে স্থলে নিজের সৈন্যসম্ভার ক্ষয় না করিয়া যুদ্ধভূমি হইতে অপসরণ করিবেন।

সম্পদ্‌কালে বিজিগীষু রাজার সুযুদ্ধ যেমন করণীয়, আপৎকালে পলায়নও সেইরূপ করণীয়, ইহাতে বিজিগীষু রাজা কখনও সন্দিহান হইবেন না। বিজিগীষু রাজা প্রবল শত্রুর নিকটেও বাক্যমাত্র দ্বারাই বিনীত থাকিবেন, কিন্তু বিজিগীষু রাজার হৃদয় শানিত ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার থাকিবে।

শত্রুর প্রতিও মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন। সাধারণ ব্যবহারে কখনও ক্রোধ বা কামের বশীভূত হইবেন না। বিজিগীষু রাজা প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিতও সন্ধি করিবেন। কিন্তু সন্ধি করিয়াছি বলিয়া কখনও শত্রুকে বিশ্বাস করিবেন না। এবং বিজিগীষু রাজা যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা সুসিদ্ধ হইলেই সেই সন্ধিবন্ধন অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া দিবেন। বিজিগীষু রাজা শত্রুর সহিতও বাহ্যতঃ মিত্ররূপে ব্যবহার করিবেন এবং শত্রুর উদ্বেগজনক কোন কথা বলিবেন না। বিজিগীষু শত্রুর প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াও সর্ব্বদা শত্রু হইতে উদ্বিগ্ন থাকিবেন, যেমন সর্পযুক্তগৃহে লোক উদ্বিগ্ন থাকে। শত্রুর বুদ্ধি যাহাতে বিভ্রষ্ট হয় এজন্য কোন শত্রুকে অতীত ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশ্বস্তবৎ রক্ষা করিবেন। দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন শত্রুকে ভাবী দুষ্পরিণতির কথা বুঝাইয়া দিবেন—পণ্ডিত শত্রুকে বর্ত্তমান বিষয়ের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া শান্ত রাখিবেন.

বিজিগীষু শত্রুর নিকটে অঞ্জলিবন্ধন করিতে, শপথ করিতে, শত্রুর হৃদয় তোষণ সামবাক্য প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইবেন না—এমন কি শত্রুর নিকটে প্রণত হইয়াও তাহাকে স্তুতি করিবেন, শত্রুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবেন। উদয়াকাঙ্ক্ষী রাজা এসমস্ত কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হইবেন না। প্রয়োজন হইলে শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেন—যাবৎ অনুকূল অবস্থা তাঁহার না আসে তাবৎ শত্রুর প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিবেন। অনুকূল অবস্থা পাইলেই স্কন্ধস্থিত শত্রুকেও বেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিবেন—যেমন স্কন্ধস্থিত মৃৎকুম্ভকে

ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বিরক্ত কুম্ভবাহক ধ্বংস করে। ভারদ্বাজ শত্রুঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন হে মহারাজ! চিরজীবন তুষাগ্নির মত জ্বালা বিবর্জ্জিত হইয়া ধূমায়মান হইয়া কোনমতে জীবিত থাকা বিজিগীষু রাজার কাম্য হইতে পারে না।

ধূমায়মান দীর্ঘ জীবন অপেক্ষা তিন্দুককাষ্ঠের মত প্রজ্জলিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল জীবিত থাকাও বাঞ্ছনীয়। গাবকে তিন্দুক বলে গাবকাঠ যখন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তাহা হইতে বহু বহ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে এবং তাহা হইতে বহু চট্‌চট্ শব্দ হয়। বহু প্রয়োজনবান্ পুরুষও কৃতঘ্নের সহিত অর্থ সম্বন্ধ করিবে না। প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলে কেহ অনুগত থাকে না। প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য লোক প্রয়োজনসাধকের সম্মান করিয়া থাকে বটে—কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির পরে তাহাকে উপেক্ষাই করে। এজন্য প্রার্থী ব্যক্তির কোন কার্য্যই নিরবশেষরূপে সম্পন্ন করিবে না—যতদিন তাহার প্রয়োজন থাকিবে ততদিনই সে অনুগত থাকিবে। রাজা কোকিলের, বরাহের, শূন্যগৃহের, নটের ও ভক্তিমিত্রের স্বভাব অবলম্বন করিবেন।

কোকিল যেমন স্বীয় পোষ্যকে পরের দ্বারা পোষণ করাইয়া থাকে এইরূপ রাজা স্বীয়কার্য্য বিশেষ অন্যের দ্বারা করাইয়া লইবেন। বরাহ যেমন মূলের উৎখাত করিয়া থাকে এইরূপ রাজাও শত্রুর মূলোৎখাত করিবেন। মেরুর স্বভাব অচঞ্চলতা ও অনুল্লঙ্ঘনীয়তা রাজাও এই মেরুর স্বভাব অবলম্বন করিবেন। রাজাও মেরুর মত অচঞ্চল ও অনুল্লঙ্ঘনীয় হইবেন। শূন্যগৃহে যেমন নিরাশ্রয় প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে এইরূপ রাজাও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইবেন। নটের স্বভাব নানারূপ গ্রহণ করা, রাজাও প্রয়োজনবশতঃ কখনও প্রসন্ন এবং কখনও ক্ষুব্ধ হইবেন। ভক্তিমিত্র যেমন স্বীয় আরাধ্য পুরুষের বৃদ্ধি কামনা করে এইরূপ রাজা স্বীয় প্রতিপাল্যগণের বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিবেন। বিজিগীষু দুর্ব্বল রাজাও উদয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রবল শত্রুর অনুবর্ত্তন করিবেন।

যে পর্য্যন্ত তিনি সমর্থ হইতে না পারিবেন সেই পর্য্যন্তই শত্রু অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। যাহারা অলস, ক্লীব, অভিমানী, ও লোকের সমালোচনায় ভীত এবং সর্ব্বদাই যাহারা কালের প্রতীক্ষা করে, তাহারা কখনও অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা এইরূপ ব্যবস্থা রাখিবেন—যাহাতে শত্রু তাঁহার কোষবলাদির ন্যূনতারূপছিদ্র জানিতে না পারে।

বিজিগীষু রাজার কোনও দুর্ব্বলতা যেন শত্রু জানিতে না পারে এবং শত্রুর সমস্ত ন্যূনতাই যেন বিজিগীষু রাজা জানিতে পারেন। রাজা স্বমণ্ডলে—ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত ও অপমানিত প্রকৃতিবর্গকে চার দ্বারা জানিয়া, দান মানাদি দ্বারা তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন—যেমন কচ্ছপ নিজের মুখ চরণাদি অঙ্গসকলকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয় সেইরূপ রাজা রাজ্যের ক্রুদ্ধ, লুব্ধ প্রভৃতি প্রকৃতিবর্গকে দানমানাদিদ্বারা আত্মসাৎ করিবেন। অমাত্যাদি প্রকৃতির কোন বিরোধের কারণ ঘটিলে রাজা অতিশীঘ্র তাহার সমতা বিধান করিবেন। এই বাক্যগুলি মনু সপ্তমাধ্যায় ১০৫ শ্লোকেও পঠিত হইয়াছে। বিজিগীষু রাজা কোন কার্য্যের অসিদ্ধিতে নির্ব্বিন্ন হইবেন না, যেমন অতি দুর্গম জলস্থিত মৎস্য সমূহকে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হইলেও বক মৎস্যগ্রহণোপায় ধ্যানযোগ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ রাজাও চিন্তাতিশয় যোগে দুষ্প্রাপ্য অর্থও লাভ করিয়া থাকেন। হস্তী হইতে কৃশ সিংহ যেমন প্রবল অতিস্থূল হস্তীসমূহকে আক্রমণ করিয়া থাকে এরূপ রাজা অল্পবল হইলেও সর্ব্বশক্তি দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। পশুপালকের অনবধানতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নেকেড় বাঘ যেমন পশুর সংহার করে এইরূপ দুর্গাদিতে অবস্থিত রিপুরও কোন প্রমাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। শশক যেমন অস্ত্রসজ্জিত ব্যাধগণের মধ্য হইতেও কুটিল গতি অবলম্বন করিয়া পলায়ন করে এইরূপ দুর্ব্বল বিজিগীষু রাজা শত্রু পরিবৃত হইলেও শত্রুদিগকে নানা উপায়ে ব্যামুগ্ধ করিয়া শত্রু পরিবেষ্টনী হইতে বিমুক্ত হইবেন। এই বাক্যগুলি মনু—৭-১০৬ শ্লোকে পঠিত হইয়াছে।

মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীবিলাস, মৃগয়া ও গীতবাদ্য প্রভৃতি পরিমিত ভাবে রাজা সেবা করিবেন—কিন্তু এই সমস্ত ব্যসনে আসক্ত হইলে রাজা বিনষ্ট হইবেন। বিজিগীষু রাজা প্রবল শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিবেন এবং কোন সুযোগ পাইলেই শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিবেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে হস্তস্থিত অস্ত্রও পরিত্যাগ করিবেন—ব্যাধ যেমন মৃগ মারণের জন্য অরণ্য ভূমিতে মৃতবৎ শয়ান থাকিয়া সমীপাগত মৃগকে অকস্মাৎ বধ করে এইরূপ বিজিগীষু রাজাও মৃগশায়িকা অবলম্বন করিবেন। প্রতিকূল অবস্থায় শত্রুর দুর্নীতি দেখিয়াও অন্ধের মত দেখিবেন না—এবং শুনিয়াও বধিরের মত শুনিবেন না, কিন্তু অনুকূল দেশ ও কাল পাওয়া মাত্র অতিবিক্রমের সহিত শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। অদেশে ও অকালে বিক্রম নিস্ফল হইয়া থাকে। যেমন জলে স্থলচর পশুর বিক্রম এবং রাত্রিতে রাত্র্যন্ধ কাকাদি প্রাণীর বিক্রম নিস্ফল হইয়া থাকে।

বিজিগীষু রাজার যাহা উপযোগী কাল তাহা শত্রু রাজার অনুপযোগী কাল এবং বিজিগীষু রাজার যাহা উপযোগী দেশ—শত্রু রাজার তাহা অনুপযোগী দেশ। বিজিগীষু রাজার যখন বলপূর্ণতা আছে—সেই সময় শত্রু রাজার যদি বলসম্পত্তি না থাকে তবে বিজিগীষু রাজা শত্রুর বিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দণ্ডদ্বারা উপনত শত্রুকে যে রাজা বিনাশ করেন না, তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। বিজিগীষু রাজা কখনও শত্রু রাজার সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন না। শত্রুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হইলেও শত্রুর প্রতি কখনও হৃদয়ে অনুগত হইবেন না। শত্রুর কার্য্য সিদ্ধির জন্য সুসজ্জিত হইয়াও অনবহিত থাকিবেন—ফলবান্ হইয়াও ফল গ্রহণের অযোগ্য হইয়া থাকিবেন। অপক্ব অবস্থায় থাকিয়াই পক্বৎ ভাসমান হইবেন, কোন অবস্থায়ই শত্রু দ্বারা গৃহীত হইবেন না। নানা উপায়ে শত্রুর কালক্ষেপ করিবেন এবং নিজে কোষ দণ্ডাদি সঞ্চয়ে মনোযোগী থাকিবেন। ভেদ্যবর্গকে নানাবিধ আশা প্রদর্শন করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবেন। কিন্তু সহসাই তাহাদের আশা পূর্ণ করিবেন না। কালে আশা পূর্ণ হইবে এইরূপ প্রকাশ করিবেন। কাল উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইবেন এবং বিঘ্নেরও নানা কারণ বর্ণনা করিবেন। কিন্তু ভেদ্যবর্গের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিবেন না। বিজিগীষু রাজা কখনও শত্রু হইতে নির্ভয়ে থাকিবেন না এবং শত্রু হইতে ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভীকভাবে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। অনায়াসে কোন শ্রেয়ঃই লাভ হইতে পারে না। শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন অবশ্যই হইতে হইবে এবং বিপদের সম্মুখীন হইয়া জীবিত থাকিলে তবেই তাহার শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। যে রাজা শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বিশ্বস্তভাবে সুখে নিদ্রিত থাকে, সে বৃক্ষাগ্রসুপ্ত ব্যক্তি যেমন ভূতলে নিপতিত হইয়া জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এইরূপ সেই রাজা মৃত্যুর পূর্ব্বেই জাগ্রত হইবে। বিজিগীষু রাজা কোন বিপদেই অবসাদগ্রস্ত হইবেন না মৃদু বা দারুণ যেকোন কর্ম্মদ্বারা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্থ অবস্থায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। শত্রুপক্ষের যাহারা শত্রু তাহাদের সহিত বিজিগীষু রাজা মিত্রতা রক্ষা করিবেন এবং রাজা স্বকীয়মণ্ডলে শত্রুপ্রেরিত চারবর্গেরও সংবাদ রাখিবেন—গুপ্ত চারবর্গকে রাজা সর্ব্বদা স্বমণ্ডলে ও শত্রু মণ্ডলে বিচরণ করাইবেন। কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহক ব্যঞ্জন ও তাপস ব্যঞ্জন এই পঞ্চবিধ চার বর্গকে শত্রু রাজ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করাইবেন।

১। কাপটিক—পরমর্ম্মজ্ঞ, প্রগল্ভ, বৃত্তিকামী ছাত্রকে কপট ব্যবহারে নিযুক্ত করা হয় বলিয়া তাহাকে কাপটিক বলা হয়। এই কাপটিক ছাত্রকে রাজা স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া তাহাকে এইরূপ বলিবেন যে তুমি যাহার দুরাচার দেখিবে তাহা তৎক্ষণাৎ আমার গোচর করাইবে।

২। উদাস্থিত—ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকে উদাস্থিত বলে। সন্ন্যাস ভ্রষ্ট হইয়াও যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম, লোকব্যবহার বেত্তা, সেই ভ্রষ্ট সন্নাসী যদি বৃত্তিকামী হয় তবে তাহাকে রাজা স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের মত বলিয়া বহু ধনযুক্ত মঠে স্থাপন করিবেন এবং বহু শস্যযুক্ত ভূমি তাহাকে দিবেন, এই পরিমাণ ভূমি দিবেন,

যাহাতে সেই ভূমির শস্যাদির দ্বারা অন্যান্য সন্ন্যাসীদেরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। এই সন্ন্যাসী শত্রু রাজ্যে সন্ন্যাসী বেশে বিচরণ করিবে।

৩। গৃহপতিব্যঞ্জন—যে কৃষক ক্ষীণ বৃত্তি, বুদ্ধিমান্ এবং ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ তাদৃশ কৃষক বৃত্তিকামী হইলে রাজা তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের মত বলিবেন ও নিজের রাজ্যে তাহাকে কৃষিকার্য্য করাইবেন। কৃষকগণের মধ্যে যে সব দুর্নীতি দেখিবে এই ব্যক্তি তাহা রাজার গোচরে আনিবে।

৪। বৈদেহক ব্যঞ্জন—ক্ষীণবৃত্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, বৃত্তিকামী হইলে রাজা তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের মত বলিবেন এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহাকে স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে বিচরণ করাইবেন।

৫। তাপসব্যঞ্জন—ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী বা তাপসী, প্রজ্ঞাদি যুক্ত অথচ বৃত্তিকামী হইলে রাজা তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বের মত বলিবেন এবং সমৃদ্ধ গ্রামের বা নগরের নিকটে এই তাপসব্যঞ্জন, কপটশিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবে এবং কপট শিষ্যগণ এই তাপস ব্যঞ্জনের মহিমা সকলের নিকট প্রচার করিবে। তিনি দিনে কিছুই আহার করিবেন না—রাত্রিতে গুপ্তভাবে প্রচুর আহার করিবেন এবং মাস দুই মাস পরে প্রকাশ্যভাবে একমুষ্টি যব বা তণ্ডুল আহার করিবেন। তাঁহার কপট শিষ্যগণ তাহাদের গুরুর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান আছে এইরূপ প্রচার করিবে—তাহাতে ইঁহার নিকটে বহুজনসমাবেশ ঘটিবে—তখন এই তাপসব্যঞ্জন অনায়াসে সকলের নিকট হইতে সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই পঞ্চবিধ চারের বিবরণ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ১ম অধিকরণ ৭ম প্রকরণে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই প্রকরণের নাম "গূঢ় পুরুষোৎপত্তিঃ"। রাজ্যের কণ্টকবর্গ—চোর তস্করাদি প্রায়শঃ যে সমস্ত স্থানে বিচরণ করে রাজা সেই সমস্ত স্থানে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ও সেই সবস্থানে ধৃত চোর ব্যক্তির দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। যেমন উদ্যান ভূমিসমূহ, বিহার ভূমিসমূহ, জলসত্রসমূহ, ধর্ম্মশালাসমূহ, পানাগার, তীর্থভূমি, সভা, এই সমস্ত স্থানে স্বভাবতঃই বহুলোকের সমাবেশ হয় এবং লোককণ্টক তস্করসমূহও এই সব স্থানে বহু বিচরণ করে। রাজা অবিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করিবেন না—এবং বিশ্বস্তের প্রতিও অতিবিশ্বাস করিবেন না। রাজা যে যে স্থলে বিশ্বাস করিবেন সেই স্থল হইতেই ভয় উৎপন্ন হইবে। এজন্য রাজা বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কোন স্থলেই বিশ্বাস করিবেন না। নানাবিধ উপায়ে রাজার প্রতি শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া, শত্রুর অরক্ষিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শত্রুর প্রতি আঘাত করিবেন। অশঙ্কনীয় মিত্রাদি হইতেও রাজা শঙ্কিত থাকিবেন। মিত্ররাজাও ছিদ্র পাইলে অনিষ্ট করিতে পারে, এজন্য মিত্রাদি হইতে শঙ্কিত থাকিবেন—এবং শঙ্কনীয়শত্রু হইতে অতিমাত্র শঙ্কিত থাকিবেন—শত্রু যেকোনও সময়ে যেকোনও অনিষ্ট করিতে পারে। রাজা মিত্র হইতেও অশঙ্কিত থাকিবেন না।

অশঙ্কিত স্থান হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিকার অসম্ভব বলিয়া রাজার মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিজিগীষু রাজা নানাবিধ ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া এমন কি গৈরিকবস্ত্র জটা প্রভৃতি ধারণ করিয়া শত্রুরাজাকে নিজের প্রতি বিশ্বস্ত করাইবেন, এবং শত্রু কোন্ কোন্ বিষয়ে অপ্রণিহিত সর্ব্বদা তাহা লক্ষ্য করিবেন এবং শত্রুর অপ্রণিধান লক্ষ্য করিয়া, পশুপালকের অপ্রণিধান লক্ষ্য করিয়া নেকড়ে বাঘ যেমন পশু অপহরণ করে এইরূপ বিজিগীষু রাজাও শত্রুর বিনাশসাধন করিবেন।

পুত্র, ভ্রাতা, পিতা অথবা সুহৃদ্ যে কেহ রাজ্যের অনিষ্টকারী হইলে রাজা তাহার উচ্ছেদ করিবেন। রাজ্যবিরোধী যে কোন ব্যক্তি রাজার দণ্ডার্হ। এমন কি গুরুও যদি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উৎপথগামী হন তবে রাজা তাঁহার উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা করিবেন। তীক্ষ্ণ চঞ্চুপক্ষী পুষ্পিত ফলিত বৃক্ষের প্রতিটি পুষ্প, ফলকে

তীক্ষ্ণচঞ্চু দ্বারা আঘাত করিয়া বিনাশ করে—এইরূপ বিজিগীষু রাজাও কখন শত্রুর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান কখনও মৃদু হইয়া শত্রুকে অভিবাদন, কখনও শত্রুকে অর্থাদি প্রদান প্রভৃতি মৃদু উপায় দ্বারা বৃক্ষের পুষ্প ফলসদৃশ শত্রুর পুরুষার্থসাধন বস্তুসমূহের বিনাশ করিবেন। পরের মর্ম্ম ছেদ না করিয়া, দারুন নিষ্ঠুর কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, এবং শত্রুর বিনাশ সাধন না করিয়া কেহই মহাশ্রী লাভ করিতে পারে না। মৎস্যঘাতী যেমন মৎস্যের বিনাশে দ্বিধাবোধ করে না এইরূপ বিজিগীষু রাজাও শত্রুর বধে কখনও দ্বিধাবোধ করিবেন না।

শত্রু ও মিত্রের কোন জাতিভেদ নাই—প্রয়োজনবশতঃ যে শত্রু, সেই মিত্র হইতে পারে এবং যে মিত্র সেও শত্রু হইতে পারে। শত্রু বিপন্ন হইয়া বহু কাতরোক্তি করিলেও বিজিগীষু রাজা কখনও তাহাতে আর্ত্ত হইবেন না এবং পূর্ব্বাপকারী শত্রুকে অবশ্যই বধ করিবেন। রাজা সর্ব্বদা মিত্র সংগ্রহে—সংগৃহীত মিত্রের অনুগ্রহে ও শত্রুর নিগ্রহে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেন। বধযোগ্য শত্রুকেও রাজা প্রিয়কথা বলিবেন এবং প্রহার কালেও তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য বলিবেন—অসিদ্বারা শত্রুর শিরচ্ছেদ করিয়াও শত্রুর জন্য শোকপ্রকাশ করিবেন ও রোদন করিবেন। প্রিয়বাক্য, উপপ্রদান, এবং সম্মান প্রদর্শন এবং তিতিক্ষা দ্বারা জনসমূহকে রাজা নিজের প্রতি অনুরক্ত রাখিবেন।

রাজা কখনও শুষ্কবৈর অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন শত্রুতা করিবেন না। যে শত্রুতাতে কোন পুরুষার্থ সিদ্ধি নাই তাদৃশবৈর গোশৃঙ্গ চর্ব্বনের মত নিতান্ত অকল্যাণকর। যে গোশৃঙ্গ চর্ব্বণে প্রয়াসী তাহার দন্তসমূহ বিনষ্ট হয়, এবং চর্ব্বিত শৃঙ্গ হইতেও কোন রস লাভ হয় না। এজন্য গোশৃঙ্গ চর্ব্বনের মত শুষ্কবৈর কখনও করিবেন না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যে কোনটি অধিক সেবিত হইলে ত্রিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অধিক সেবিত হইলে ধর্ম্মের দ্বারা অর্থের পীড়া হয়—অর্থ অধিক সেবিত হইলে ধর্ম্ম পীড়িত হয়—এবং কাম অধিক সেবিত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই পীড়িত হয়—এজন্য ত্রিবর্গের এরূপ সেবা করিতে হইবে যে—একটি দ্বারা অপরটির পীড়া না হয়। ত্রিবর্গের প্রত্যেকটি সেবিত হইবে—কিন্তু অতিসেবা দ্বারা কোনটিকে পীড়িত করিবেন না। ঋণ, অগ্নি ও শত্রু এই তিনটিকে কথঞ্চিত প্রশমিত করিলেও পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—এজন্য এই তিনটিরই নিরবশেষ ভাবে উচ্ছেদ করিবে উহাদের অবশেষ রাখিবে না। ঋণ পরিশোধিত হইয়াও যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে—তবে তাহা কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঋণকর্ত্তার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে—এইরূপ পরাভূত শত্রু উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে অতিশয় ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। এইরূপ কথঞ্চিৎ উপশান্তব্যধি উপেক্ষিত হইলে এই ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। বিজিগীষু কোন সময়েই প্রমাদী হইবেন না অর্থাৎ অনবহিত চিত্ত হইবেন না। কোন কার্য্যই আংশিকভাবে করিয়া ফেলিয়া রাখিবেন না।

গাত্রবিদ্ধ কণ্টকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত হইলেও তাহাতে যেমন যন্ত্রণার শান্তি হয় না বরং নানারূপ বিকারেরই হেতু হইয়া থাকে, এইরূপ অর্দ্ধানুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারাও কোন ফল হয় না। শত্রুর উচ্ছেদে অসমর্থ হইলে—শত্রুর অপচয় অথবা শত্রুর পীড়ন এবং কর্ষণ করিবে। উচ্ছেদ অপচয়, কর্ষণ ও পীড়ন ও শত্রুর প্রতি এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকিবেন। শত্রুরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও সেনাপতির বধরূপ পীড়নে—শত্রুরাষ্ট্রের অন্তর্গত গৃহাদির বিনাশ করিয়া বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদা শত্রুর কর্ষণে নিযুক্ত থাকিবেন। শত্রুকে রাজচ্যুত করাকে শত্রুর উচ্ছেদ বলে—রাজ্যাংশ হইতে উচ্ছেদ করাকে শত্রুর অপচয় বলে—শত্রুর প্রধান পুরুষের বধকে পীড়ন বলে—এবং শত্রুর কোষ দণ্ডাদির বিনাশকে কর্ষণ বলে। বিজিগীষু রাজা শত্রুরাজ্যের এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিবেন।

বিজিগীষু রাজা গৃধ্রের মত দূরদর্শী হইবেন—বকের মত স্থিরভাবে ধ্যানশীল হইবেন—কুকুরের মত জাগরূক স্বভাব হইবেন এবং কুকুরের মত শত্রুর অনুসন্ধানরত হইবেন এবং সিংহের মত বিক্রমশীল ও অনুদ্বিগ্ন

হইবেন। কাক যেমন পরের ইঙ্গিতমাত্রে বুঝিতে পারে, রাজাও তদ্রূপ হইবেন এবং সর্পের মত অকস্মাৎ পরদুর্গাদিতে প্রবেশশীল হইবেন। বিজিগীষু রাজা প্রবল শত্রুর নিকটে আনত থাকিবেন—ভীরুর প্রতি ভেদ প্রয়োগ দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিবেন। লুব্ধকে অর্থপ্রদান দ্বারা নিরস্ত করিবেন, সমশক্তির প্রতি বিগ্রহ প্রয়োগ করিবেন। বিজিগীষু রাজা স্বরাষ্ট্রস্থিত শ্রেণীমুখ্যগণকে শত্রুপক্ষীয় চারগণ যাহাতে বিজিগীষু রাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট করিতে না পারে—তাহার প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিবেন এবং রাজার মিত্রবর্গকে শত্রুপক্ষীয় নৃপতিগণ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিজিগীষুর অমাত্যগণ, শত্রুপক্ষীয় চারগণ কর্ত্তৃক যাহাতে বিজিগীষু রাজার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন না হন তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন এবং বিজিগীষুর অমাত্যগণ যাহাতে পরস্পর বিদ্বিষ্ট না হন অথবা অমাত্যগণ একীভূত হইয়া বিজিগীষুর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন না হন এদিকে রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। রাজা কেবলমাত্র মৃদুস্বভাব হইলে অমাত্যাদি দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন এবং একান্ত তীক্ষ্নস্বভাব হইলে সকলের উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকেন—এজন্য রাজা প্রয়োজনানুসারে কখনও মৃদু কখনও তীক্ষ্ণ হইবেন।

অমাত্যবর্গ যদি রাজার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে তবে এই অমাত্যবর্গদ্বারা রাজা সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বুদ্ধিমান শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া আমি দূরে আছি—এই বলিয়া কখনও আশ্বস্ত থাকিবেন না, যে হেতু বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতিদীর্ঘ এজন্য বুদ্ধি প্রভাবেই দূরস্থ শত্রুর বিনাশ করিতে পারে। তাদৃশবিষয় পার হইতে চেষ্টা করিবে না যাহার পরপারে যাওয়া যাইবে না। তাদৃশ ধন কখনও অপহরণ করিবে না—যাহা শত্রু বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে—এবং তাদৃশশত্রুর উৎখাতের জন্য প্রয়াস করিবে না যাহার মূলোৎখাত সম্ভাবিত হইবে না এবং তাদৃশ শত্রুর বধে উদ্যুক্ত হইবে না যাহার শিরশ্ছেদ করা যাইবে না।

ভগবান্ ভারদ্বাজ রাজা শত্রুঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ! আমি অনেক ক্রুর ও নৃশংসকার্য্যের উপদেশ করিলাম—ইহার অভিপ্রায় এই যে রাজা আপৎকালে এই সমস্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং স্বস্থকালেও যদি কোন শত্রুরাজা প্রতিকূলতার জন্য এই সমস্ত কূটনীতির অনুসরণ করে তবে তাহা রাজা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ও তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। সুস্থকালে পরকৃত কূটনীতির প্রতিবিধানের জন্য এবং আপৎকালে স্বয়ং অনুষ্ঠানের জন্য এই সমস্ত উপদেশ বুঝিতে হইবে। কিন্তু সুস্থকালে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কখনও কূটনীতির অনুষ্ঠান করিবে না।

সরল ও কূট এই দ্বিবিধ নীতিই অবগত থাকা আবশ্যক। কূটনীতির পরিজ্ঞান না থাকিলে শত্রুর দ্বারা অনুষ্ঠিত কূটনীতির প্রতিবিধান সম্ভাবিত হয় না।

ভগবান্ ভারদ্বাজের নীতি অনুসারে সৌবীররাজ শত্রুঞ্জয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুবিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

ঔশনস তন্ত্র

আমরা এই প্রবন্ধের ভারতীয় দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আচার্য্যগণের পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাতে পিতামহ, বিশালাক্ষ, বৃহস্পতি প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন তাহা বলিয়াছি। দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রণেতৃ আচার্য্যগণের মধ্যে বৃহস্পতি ও উশনা অতি প্রসিদ্ধ। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের যেকোন স্থানে দণ্ডনীতি শস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহস্পতি ও উশনার উল্লেখ করা হইয়াছে যেমন শান্তিপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—ভীষ্ম যে সমস্ত আচার্য্যগণের নিকট হইতে নানাবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন

তাহাতে বৃহস্পতি ও উশনার নিকট হইতে রাজনীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "বৃহস্পতিপুরোগাংস্তু—দেবর্ষীনসকৃৎ প্রভুঃ। তোষয়িত্বোপচরেণ রাজনীতি মধীতবান্॥ উশনাবেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ দেবগুরুর্দ্বিজঃ। যচ্চ ধর্ম্মং সবৈয়াখ্যং প্রাপ্তবান্ কুরুসত্তমঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে ভীষ্ম নানাবিধ উপচারে পরিতুষ্ট করিয়া বৃহস্পতি প্রমুখ দেবর্ষিগণের নিকট হইতে রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উশনা যে নীতিশাস্ত্র অবগত আছেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতি যে নীতিশাস্ত্র অবগত আছেন ব্যাখ্যার সহিত সেই সমস্ত নীতিশাস্ত্র ভীষ্ম অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৯৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে—কুশ ও লব যখন বাল্মীকির নিকটে রামায়ণ অধ্যয়ন করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে অশ্বিনীকুমারযুগল যেমন শুক্রচার্য্যের নিকট হইতে অত্যন্ত আদরের সহিত নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—এইরূপ কুশ ও লব বাল্মীকির নিকট হইতে অত্যন্ত আদরের সহিত রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (১৯ শ্লোক)। এইরূপ মহাভারত বনপর্ব্বের ৩২ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে—আমার পিতা মহারাজ দ্রুপদ আমার ভ্রাতৃগণের রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য অতিবিচক্ষণ এক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই ব্রাহ্মণ আমার ভ্রাতৃগণকে বৃহস্পতি প্রোক্ত রাজনীতিশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন (৬০-৬১ শ্লোক)। এইরূপ যে কোন স্থলে রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা বৃহস্পতি ও উশনার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। উশনা প্রণীত নীতিশাস্ত্রের নাম বহু স্থলে কীর্ত্তিত হইলেও এই গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। শুক্রনীতিসার নামক যে নীতিগ্রন্থখানি বর্ত্তমান সময়ে উপলব্ধ আছে তাহা সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য প্রণীত না হইলেও ইহা যে নীতিশাস্ত্রের অতি উপাদেয় গ্রন্থ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে তোপ ও বন্দুকের বর্ণনা আছে এবং তাহার ব্যবহারের রীতিও বর্ণিত হইয়াছে এবং বারুদের ব্যবহার ও তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, শুক্রনীতিসার গ্রন্থে ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে ক্ষুদ্র নালিক ও বৃহন্নালিক অস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। বৃহন্নালিক তোপ ও ক্ষুদ্রনালিক বন্দুক।

"নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ-ক্ষুদ্র-বিভেদতঃ" ইত্যাদি। শুক্রনীতিসার গ্রন্থ আলোচনা করিলে ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রের বহু মূল্যবান্ উপদেশ জানিতে পারা যায়।

মহাভারত শান্তিপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে ঔশনসতন্ত্র হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাতে বলা হইয়াছে—বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণও যদি অস্ত্র উদ্যত করিয়া রণভূমিতে আগমন করেন তবে ধার্ম্মিক নরপতি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তাহাকেও নিগৃহীত করিবেন—বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না।

আততায়ীর নিগ্রহই ধর্ম্ম—আততায়ীকে নিগ্রহ না করিলেই অধর্ম্ম হইবে—আততায়ীর নিগ্রহরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া আততায়ী ব্রাহ্মণের নিগ্রহ কর্ত্তা ক্ষত্রিয়ও ধর্ম্মরক্ষকই হইবেন কিন্তু ধর্ম্মঘাতী হইবেন না। শান্তিপর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে এই ঔশনসতন্ত্র হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে উশনা তাহার নীতিশাস্ত্রে এই কথা বলিয়াছেন—সর্প যেমন গর্ত্তবাসী মুষিকাদি প্রাণীকে গ্রাস করিয়া থাকে এইরূপ পৃথিবীও দুইটি পুরুষকে গ্রাস করিয়া থাকেন। (১) একটি পুরুষ অবিরোদ্ধা রাজা ও (২) দ্বিতীয় পুরুষ অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ। যে রাজা শত্রুরাজগণের সহিত বিরোধে অসমর্থ ভীরু কাপুরুষ—সে রাজা স্বয়ংই বিলীন হইয়া যাইবে। আর অপ্রবাসী ব্রাহ্মণও বিদ্যার্জ্জন করিতে না পারিয়া মূর্খ হইবেন—মূর্খ ব্রাহ্মণের কোন গতি নাই।

শান্তিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—অঙ্গদেশের রাজা "বসুহোম" রাজ্য পালনের পরে যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই সময় রাজর্ষি "মান্ধাতা" সেই বসুহোমের নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজনীতিশাস্ত্র জানিতে চাহিয়াছিলেন। মান্ধাতা বলিয়াছিলেন—আপনি বৃহস্পতি প্রণীত সমস্ত রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এইরূপ ঔশনসশাস্ত্রও আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন—এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে রাজনীতি জানিতে ইচ্ছা করি। শান্তি পর্ব্বের ১৩৯ অধ্যায়ে ৭১ ও ৭২ শ্লোকে ঔশনসতন্ত্র হইতে দুইটি

গাথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ভগবান্ উশনা অসুররাজ প্রহ্লাদকে এই দুইটি গাথা উপদেশ করিয়াছিলেন যে—যাহারা শত্রুর ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন করে—শত্রুর বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে—সেই বাক্য সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক শত্রুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি কেহ শত্রু প্রদর্শিত মধুলাভে অগ্রসর হয় তবে সে নিশ্চয়ই মধুলাভের জন্য ধাবিত হইয়া শুষ্ক তৃণসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন কোন প্রপাতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইবে। যাহাদের সহিত বহু দুঃখপ্রদ দীর্ঘবৈর ঘটিয়াছে তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবে না এবং এই বৈর কখনও প্রশমিত হইবে না, তাহার কারণ এই যে শত্রুগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি শান্তি প্রয়াসী হইলেও সেই শত্রুবংশীয় অপর ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব বৈরকে প্রজ্জলিত করিয়াই দিবে। পূর্ব্ববৈরের আখ্যাতা পুরুষের অভাব কখনও শত্রু কুলে হইবে না। শত্রুবংশে এমন লোক থাকিয়াই যাইবে যাহারা পূর্ব্ববৈরের আখ্যানপূর্ব্বক শত্রুতাকে প্রদীপ্ত করিয়া দিবে।

মুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ১৫৪ শ্লোকে রাজার অষ্টবিধ কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই অষ্টবিধ কর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য ভাষ্যকার মেধাতিথি ঔশনসতন্ত্র হইতে ২টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোক ২টীর অর্থ এই যে—আটটি কার্য্যের প্রতি রাজার মনোযোগ অত্যাবশ্যক। (১) প্রজাবৃন্দ হইতে করাদি গ্রহণ। (২) ভৃত্য প্রভৃতিকে ধনদান। (৩) নানাবিধ কার্য্যে অমাত্যাদির প্রতি আদেশ। (৪) দৃষ্টবিরুদ্ধ ও অদৃষ্টবিরুদ্ধ কর্ম্মে অমাত্যাদি ও প্রজাগণের প্রবৃত্তির প্রতিষেধ। (৫) সন্দিগ্ধ বিষয়ে কর্ত্তব্যের অবধারণ। (৬) ব্যবহার স্থাপন। (৭) স্থাপিত ব্যবহারানুসারে অর্থাদি দণ্ডের ব্যবস্থা। (৮) কুকার্য্যরত পুরুষগণের শুদ্ধির ব্যবস্থা। যে রাজা এই আটটি কর্ম্মে নিরত থাকেন তিনি শত্রুগণদ্বারাও পূজিত হইয়া থাকেন এবং দেহাবসানে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। মেধাতিথি এই ৮টি কর্ম্মের অনুরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

শুক্রনীতিসারের ১ম অধ্যায়েও (১২৪-১২৫ শ্লোকে) রাজার ৮টি কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু এই ৮টি কর্ত্তব্যকর্ম্ম যাহা ঔশনসনীতি হইতে মেধাতিথি বলিয়াছেন তাহা নহে।

শুক্রনীতিসারে বলা হইয়াছে যে—(১) দুষ্টের নিগ্রহ। (২) পাত্রে দান। (৩) প্রজাপরিপালন। (৪) রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। (৫) রাজকোষের পরিবর্দ্ধন। (৬) শত্রুরাজগণের করদীকরণ। (৭) কর্ষণ ও পীড়নাদির দ্বারা শত্রুরাষ্ট্রের পরিমর্দ্দন। (৮) সাম্রাজ্যের পরিবর্দ্ধন। আমরা মনুসংহিতাতে যাহা পাই তাহাতে রাজার অষ্টবিধ কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু এই ৮টি কর্ম্ম কি তাহা মনু বলেন নাই। রাজনীতিশাস্ত্রে এই আটটি কর্ম্ম অতি সুপ্রসিদ্ধ বলিয়াই মনু এই ৮টি কর্ম্মের পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন নাই। ভাষ্যকার মোধাতিথি ঔশনস নীতি হইতে এই ৮টি কর্ম্মের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় শুক্রনীতিসারকার মনুপ্রক্ত অষ্টবিধ কর্ম্মের ব্যাখ্যারূপে পৃথক ৮টি কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেধাতিথি ও শুক্রনীতিসারকার উভয়েই রাজার বিশেষ কর্ম্মের সংখ্যা আট ইহাস্থির রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মগুলি কি তাহাতে মতভেদ ঘটিয়াছে।

মহাভারতে বনপর্ব্বে রামোপাখ্যানে যে রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাবণ উশনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বানর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রামচন্দ্র বার্হস্পত্য বিধি অনুসারে প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। (২৮৫ অধ্যায় ৬-৭ শ্লোক)। এইরূপ আরও শাস্ত্রান্তর অনুসন্ধান করিলে ঔশনস তন্ত্রের সংবাদ জানা যাইবে। আমরা যে

শুক্রনীতিসারে তোপের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছি—অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কিন্তু বনপর্ব্বের ২৮৩ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যে "শতঘ্নী নামক" অস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে তাহা তোপেরই অনুরূপ কোন অস্ত্র বলিয়া মনে হয়। শ্লোকটি এই যে—

"পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপূর্ভুজবেগেন লঙ্কা মধ্যে মহাস্বনাঃ।"

শম্বরনীতি

বৃহস্পতি যেমন দেবতাদের গুরু ছিলেন এইরূপ শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের গুরু ছিলেন। বৃহস্পতিদ্বারাই বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র দেবতাদিগের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং শুক্রাচার্য্য হইতে ঔশনসনীতি অসুরদিগের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল। মহাভারতের অনেক স্থলেই "শম্বরাসুরের" নীতি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শম্বর অতিমায়াবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। শান্তিপর্ব্ব ১০২ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বিজিগীষু রাজা যদি তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন তবে তাহাতে বিজিগীষু রাজার যশ বর্দ্ধিত হয় এবং শত্রুরাও বিজিগীষু রাজার প্রতি বিশ্বস্ত হয়। রাজনীতিবিৎ শম্বর বলিয়াছেন যে—শত্রুকে পরাজিত না করিয়া তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত নহে। কর্ষণাদিদ্বারা শত্রুকে আনত করিয়া পরে তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। শত্রুকে পীড়িত না করিয়া প্রথমতঃই যদি শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা যায় অর্থাৎ কর্ষণাদি দ্বারা শত্রুকে আনত না করিয়া কেবলমাত্র সামদানাদি দ্বারা সাময়িকভাবে আনত শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে—এই শত্রু কখনও শত্রুভাব পরিত্যাগ করিবে না। যেমন কাষ্ঠ বেত্রাদি অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া যদি আনত করা যায় তবে কাষ্ঠ বেত্রাদির সেই আনতি স্থায়ী হইয়া থাকে—কিন্তু অগ্নি সন্তপ্ত না করিয়া কাষ্ঠ বেত্রাদি আনত করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহারা আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এজন্য শত্রুকে এরূপ সন্তপ্ত করিতে হইবে যে—শত্রু যেন আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না পারে। শান্তিপর্ব্ব ১৩০ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—কোষ, দণ্ড, বল ও মিত্র প্রভৃতি রাজা কখনও হস্তচ্যুত হইতে দিবেন না—ইহারাই রাজ্যের মূল, ইহারা হস্তচ্যুত হইলে রাজাই বিনষ্ট হইবেন। অন্যের জন্য কখনও বীজশস্য নষ্ট করিবে না। মহামায়াবী শম্বরও ইহাই বলিয়াছেন। শম্বর বলিয়াছেন যে—যে রাজ্যের প্রজা বৃত্তির অভাবে অবসাদ গ্রস্ত হইয়া থাকে সেই রাজ্যের রাজাকে ধিক্ (৩৩ শ্লোক)।

উদ্যোগপর্ব্বের ৭২ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা পাপীয়সী বৃত্তি আর হইতে পারে না যে—প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়াই খাদ্যবস্তুর অভাবে ক্লিষ্ট হইতে হয়। প্রাতঃকালীন ভোজনেরও ব্যবস্থা নাই—দিনের ভোজনেরও ব্যবস্থা নাই। প্রতিদিন গাত্রথান করিয়াই ভোজ্যবস্তুর অভাবে ভোজনের দুশ্চিন্তার মত পাপিষ্ঠ অবস্থা ভারতীয় সভ্যতাতে হইতেই পারে না এজন্য শম্বরাসুরের এই উক্তি উদ্যোগপর্ব্বের ১৩৪ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে পুনর্ব্বার কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহাতেও শম্বরাসুরের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মাতঙ্গনীতি

উদ্যোগপর্ব্বের ১২৭ অধ্যায়ে মহর্ষি মতঙ্গের নীতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় মাতঙ্গও একজন নীতিশাস্ত্রকার ছিলেন। হস্তিনা নগরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুপক্ষের সহিত পাণ্ডবপক্ষের সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন মহারাজ দুর্য্যোধন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী কোন নরপতিরই ভয়প্রযুক্ত কাহারও নিকট নত হওয়া উচিত নহে।

সদ্‌বৃত্ত পুরুষের নিকট অবশ্যই প্রণত হওয়া উচিত। মহীপতি সর্ব্বদাই উদ্যমশীল থাকিবেন—কখনও শত্রুর নিকট আনত হইবেন না। ভগবান্ মাতঙ্গ ইহাই বলিয়াছেন যে—বরং বিনাশও ভাল তথাপি শত্রুর নিকট আনত হওয়া ভাল নয়। আত্মহিতেচ্ছু নরপতিগণ ভগবান্ মাতঙ্গের এই নীতিরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন (১৯-২০ শ্লোক)।

কালকবৃক্ষীয় নীতি

শান্তিপর্ব্বে ৮২ অধ্যায়ে এবং ১০৪ অধ্যায় হইতে ১০৬ অধ্যায়ে কালকবৃক্ষীয় মুনি কর্ত্তৃক রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোশল দেশের রাজা ক্ষেমদর্শীর নিকটে এই মুনি রাজধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে কোশল রাজ্যে রাজা ক্ষেমদর্শীর অমাত্যবৃন্দ অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি হইয়া সমস্ত রাজকোষ অপহরণে লিপ্ত হইয়াছিল। এই রাজার অমাত্যবর্গ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল—সে সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই রাজগ্রাহ্য ধনসমুহ আত্মসাৎ করিয়া রাজার ও রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধনে লিপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কালকবৃক্ষীয় মুনি রাজ্যের দুর্নীতি অবগত হইয়া তাহার সমাধানের জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ একটি কাক লইয়া বায়সীবিদ্যা প্রচারের ছলে রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের অমাত্যবর্গ তাঁহাকে কোন অস্বস্থচিত্ত ব্রাহ্মণ মনে করিয়া মুনির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে যাহার কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। মুনি নিজের অভিপ্রায় প্রচ্ছাদনের জন্যই পিঞ্জরাবদ্ধ কাক লইয়া রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। আর ইহাতে তিনি সমস্ত অমাত্যবর্গের কার্য্য নির্ব্বাধে পরিদর্শন করিবার সুবিধাও পাইয়াছিলেন। এই সব দুষ্ট অমাত্যবর্গ কিভাবে রাজকোষের বিনাশ করিতেছে তাহা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া মুনি কাকটি সঙ্গে লইয়াই রাজা ক্ষেমদর্শীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে এই কাকের মহিমাতেই তিনি সমস্ত কিছু জানিতে পারেন। এই কাকের মহিমাতেই তিনি সর্ব্বজ্ঞ একথা তিনি রাজসভায় বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রখ্যাপনের জন্য রাজসভায় উপস্থিত কয়েকটি অমাত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই অমাত্য, এইভাবে রাজকোষ অপহরণ করিয়া অমুক গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছে, তাহাই কাক আমাকে জানাইয়া দিতেছে। কাকের এই নির্দ্দেশের সত্যতা অবধারণের জন্য এখনই সেই স্থানে যাইয়া অনুসন্ধান করুন। এইরূপে মুনি আরো দুই চারিটি রাজকোষ অপহরণকারী অমাত্যকে কাকের কথা অনুসারে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। মুনি যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহার একটিও মিথ্যা হয় নাই—অনুসন্ধানে সমস্তই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

ইহাতে রাজকোষ অপহরণকারী অমাত্যবর্গ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া এই পিঞ্জরাবদ্ধ কাকটিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এবং রাত্রিকালে কোন গুপ্তলোক দ্বারা বাণ বিদ্ধ করিয়া কাকটিকে হত্যা করিয়াছিল। অমাত্যবর্গ বুঝিয়াছিল যে এই কাকই অপহৃত রজকোষের সন্ধান বলিয়া দেয়। কাকের মহিমাতেই ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বলেন ইহাই প্রচারিত করা কালকবৃক্ষীয় মুনিরও অভিপ্রায় ছিল। তখন মুনি রাজার নিকটে আসিয়া গোপনে রাজার নিকট রাজ্যের সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন—এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে এই দুষ্ট অমাত্যবর্গ

যেমন কাককে বিনাশ করিয়াছে এইরূপ আমাকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে। এই রাজ্যের অবস্থা এতই ভয়াবহ যে এই দুষ্ট অমাত্যবর্গকে কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না।

মুনি স্থানান্তরে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং রাজাকেও বলিয়াছিলেন যে বহু বিষধর সর্প পরিবৃত কূপ যেমন সকলেরই ভীতি উৎপাদক—এইরূপ দুষ্ট অমাত্যগণ পরিবৃত রাজাও সকলেরই ভীতির কারণ হইয়া থাকে। দুষ্ট অমাত্য পরিবৃত রাজার যে অতি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা মুনি রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন এই দুষ্ট অমাত্যগণের পরিশোধন অতি সত্বরই আবশ্যক। এই অমাত্যগণ এতই দুর্বৃত্ত যে ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পদে তুমিই নিযুক্ত করিয়াছ এবং তুমিই ইহাদের সর্ব্বতোভাবে পরিপালন করিয়া থাক—অথচ ইহারা তোমারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। সর্পযুক্ত গৃহে বাস যেমন উদ্বেগজনক—এরূপ তোমার রাজ্যে বাসও উদ্বেগজনক—আমি এই রাজ্যের রাজার এবং অমাত্যগণের কার্য্য বিশেষভাবে জানিবার জন্যই আসিয়াছিলাম। আমার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল যে এই রাজ্যের রাজা জিতেন্দ্রিয় কিনা—অমাত্যবর্গ রাজার বশীভূত কি না? এই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ রাজার প্রতি অনুরক্ত কি না? এবং রাজাও প্রজাগণের প্রিয় কি না? কিন্তু আমি যাহা জানিলাম তাহাতে এই রাজ্য দুষ্ট অমাত্যগণের দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়াছে। যাহা হউক আমি আর তোমার রাজ্যে থাকিতে ইচ্ছা করি না। তোমার রাজ্যে আমার উপস্থিতি, তোমার অমাত্যবর্গের নিতান্তই অনভিপ্রেত।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিয়াছিলেন যে আপনাকে আমি বহু সৎকারে সৎকৃত করিতেছি। আপনি আমার রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করুন। আপনার অবস্থান যাহারা চায় না আমিও তাহাদিগকে আমার রাজ্যে রাখিব না। আপনি বলুন অতঃপর আমার করণীয় কি? যেরূপ কার্য্য করিলে রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়—সেইরূপ কার্য্যে আমায় প্রেরিত করুন।

এতদুত্তরে মুনি বলিয়াছিলেন যে হে মহারাজ!—তুমি অমাত্যবর্গের দোষ বিশেষভাবে অবগত হইয়াছ কিন্তু এইসব অমাত্যবর্গের দোষ প্রখ্যাপন পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিলে এই দুষ্ট অমাত্যবর্গ, পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তোমার রাষ্ট্রের বিনাশের কারণ হইবে। এই জন্য কোন দোষ প্রখ্যাপন না করিয়াই ক্রমশঃ একটি একটি করিয়া অমাত্যবর্গকে হীন শক্তি কর। ইহারা হীন শক্তি হইলে পরে ইহাদের দোষ সম্পূর্ণভাবে প্রখ্যাপন পূর্ব্বক ইহাদের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা কর। ইহারা সকলেই চোর—একজাতীয় দোষযুক্ত বহু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মও সম্পাদন করিতে পারে। আমি অতি গুপ্তভাবে এই সব কথা বলিলাম—ইহা যেন কেহই লেশতঃ জানিতে না পারে। এই সমস্ত কথা বলিয়া পরে মুনি বলিয়াছিলেন যে—হে মহারাজ! আমার নাম "কালকবৃক্ষীয়" আমি তোমার পিতার বান্ধব ছিলাম—তোমার পিতা স্বর্গস্থ হওয়ায় তোমার দুষ্ট অমাত্যগণ দ্বারা তোমার কোশল রাজ্য বিপন্ন হইয়াছে। আমি তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃই এই ক্লেশ স্বীকার করিয়া তোমার রাজ্যের অভ্যন্তর অবস্থা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। আমি সমস্ত কাম্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

তোমাকে আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে অমাত্যগণের হস্তে সমস্ত অধিকার ন্যস্ত করিয়া আর যেন এরূপ বিভ্রান্ত হইও না। অমাত্যগণ ব্যতীত রাজ্য পরিচালিত হইতে পারে না—কিন্তু অমাত্যগণের রক্ষণে উদাসীন হইলে ঘোর অনিষ্ট হইবে। অমাত্যগণের হস্তে অধিকার অর্পণ করিয়া তাহার কোন সংবাদই তুমি রাখ না।

মুনি কালকবৃক্ষীয়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন। মুনি কালকবৃক্ষীয়ের নীতিতে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে,

ইনি কেবল উপদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজে সমস্ত রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা নিজে অবগত হইয়া তাহার সমাধানের জন্য রাজাকে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন। এই মুনি মহাতপস্বী, কোন কাম্য বস্তুরই অপেক্ষা রাখেন না তথাপি একটি সমৃদ্ধ রাজ্য, অমাত্যবর্গের দুর্নীতিতে ধ্বংশ হইবে ইহা ভারতীয় মুনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি তপস্যা করেন বলিয়াই যে রাজনীতি জানেন না তাহা নহে—ইনি যে রাজনীতি জানেন তাহা রাজনীতির বুলি আওড়ান নহে, এই নীতির প্রয়োগ করিতে মহাক্লেশ স্বীকার করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। কেমন করিয়া নীতি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা তিনি ভাল ভাবেই জানেন। ইঁহারই উপদেশের ফলে রাজা ক্ষেমদর্শী পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এজাতীয় মুনি ঋষির কল্পনা ভারতীয় হিন্দু জনতার হৃদয় হইতে চির দিনের জন্যই যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় হইতে এই আদর্শ মুছিয়া গিয়াছিল না।

এই কালকবৃক্ষীয় মুনির দ্বারা উপদিষ্ট রাজনীতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি যেমন সরল রাজনীতি জানিতেন এইরূপ বক্রনীতিতেও তিনি নিষ্ণাত ছিলেন। আমরা ইতঃপর এই মুনিপ্রণীত রাজনীতির আলোচনাতে দেখাইব যে ঋজু ও বক্র এই দ্বিবিধ নীতিতেই তিনি নিষ্ণাত ছিলেন।

শান্তিপর্ব্ব ১০০ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—রাজা দ্বিবিধনীতি অবগত থাকিবেন। একটি সরলনীতি অপরটী কূটনীতি অর্থাৎ বক্রনীতি। রাজা বক্রনীতি অবগত থাকিবেন বলিয়াই যে সর্ব্বত্র বক্রনীতিরই প্রয়োগ করিবেন তাহা নহে। কিন্তু বক্রনীতি অবগত হইয়া সাধারণ ভাবে তাহার প্রয়োগ করিবেন না। যদি কোন দুষ্টদস্যুপ্রকৃতিক রাজা এই বক্রনীতির প্রয়োগ করে তবে বক্রনীতিবিদ্ রাজা সেই বক্রনীতির প্রশমনে সমর্থ হইবেন। যিনি বক্রনীতি অবগত নহেন—তিনি অন্যের প্রযুক্ত বক্রনীতির সমাধানও করিতে পারিবেন না—এজন্য রাজা উভয়বিধ নীতিই অবগত হইবেন।

শান্তিপর্ব্ব ১০৫ অধ্যায়ে কালকবৃক্ষীয় মুনি কুটনীতির উপদেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের পূর্ব্বঅধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—এক সময়ে কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী হীনবল হইয়া মুনি কালকবৃক্ষীয়ের নিকটে হৃতরাজ্য নরপতির করণীয় কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে মুনি বলিয়াছিলেন যে হৃতরাজ্য রাজা যদি পৌরুষহীন হন তবে তাঁহার পক্ষে রাজ্যলাভের প্রয়াস ব্যর্থ হইবে—তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক শমপ্রধান হইয়া নিবৃত্তিপথের অনুষ্ঠান করাই উচিত। এইরূপ বলিয়া পরে ১০৫ অধ্যায়ে মুনি পুনর্ব্বার বলিয়াছেন—নরপতি হৃতরাজ্য হইয়াও যদি পৌরুষ সম্পন্ন হন, তবে নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যপ্রাপ্তির প্রয়াস করা উচিত।

রাজা যদি নীতিশাস্ত্রানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা নিজের আছে বলিয়া মনে করেন—তবে তাঁহার পূর্ণসমৃদ্ধিলাভের জন্য নীতিশাস্ত্র অনুসারে কর্ম্ম করা উচিত। ইহাতে রাজা ক্ষেমদর্শী বলিয়াছিলেন যে—আপনার উপদেশ অনুসারে আমি সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ আছি—আপনি আমাকে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ করুন।

ইহাতে মুনি বলিয়াছিলেন যে—তুমি সমৃদ্ধিলাভের জন্য সদ্‌গুণ ভূষিত কোন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির আশ্রয় গ্রহণ কর। দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর অনুবর্ত্তন কর। তোমার উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা, অপ্রতারণা প্রভৃতি গুণদ্বারা তোমার আশ্রয় দাতা প্রবল নরপতির সন্তোষ ও বিশ্বাস উৎপাদন কর—এবং উৎসাহশীল সহায় সংগ্রহে যত্নপরায়ণ হও। সেই সমস্ত ব্যক্তিই যথার্থ সহায় হইতে পারে যাহারা কামজ ক্রোধজ ব্যসন শূন্য এবং শত্রুদ্বারা অভেদ্য। তুমি নিজে নীতিশাস্ত্র অনুসারে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। অন্য প্রবল ও যোগ্য নরপতিদ্বারা তুমি সৎকৃত হইলে তোমার মিত্র সংগ্রহ অনায়াসে হইবে আর তাহাতে তুমি নিজের উদ্ধারেও সমর্থ হইবে—এইরূপে সুহৃদ্‌বল লাভ করিয়া

সুমন্ত্রণাপূর্ব্বক তোমার শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণের মধ্যে অমাত্য প্রভৃতি আন্তর-প্রকৃতিদ্বারা পরস্পরের ভেদ উৎপাদন করিয়া শত্রুগণকে দুর্ব্বল কর—যেমন একটি বিল্বফলদ্বারা অপর একটি বিল্বফলকে জোরে আঘাত করিলে দুইটি বিল্বফলই ভাঙ্গিয়া যায়—এইরূপ শত্রুদ্বারা শত্রুর বিনাশে প্রয়াসী হও। যে সমস্ত নরপতি তোমার শত্রুপক্ষীয় নরপতির শত্রু নহে অর্থাৎ উদাসীন এমন নরপতিগণের সহিত গুপ্তসন্ধি করিয়া তোমার শত্রুগণের বিরোধে তাহাদিগকে উত্থাপিত করা এবং গুপ্তচারগণদ্বারা তাহাদের মন্ত্রী প্রভৃতি আন্তরপ্রকৃতিবর্গের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন কর। তোমার শত্রুনরপতিগণকে চার প্রভৃতির সাহায্যে নানাবিধ কামজব্যসনে আসক্ত করিবে—নানাবিধ ভোগে লিপ্ত করিবে। ভোগ লিপ্সু ও ব্যসনযুক্ত শত্রু, স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। শত্রু বিনাশের ইহাই মৃদু উপায়। এমনভাবে ভোগ ও ব্যসনাদিতে শত্রুকে লিপ্ত করিবে যাহাতে শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এমনভাবে শত্রুর সহিত ব্যবহার করিবে—যাহাতে শত্রু কিছুতেই যেন শত্রু বলিয়া বুঝিতে না পারে। কপট গাঢ়মিত্ররূপে শত্রুকে অকার্য্যে লিপ্ত করিবে। শত্রুরাজ্যেও অবস্থান করিয়া শ্বেতকাকীয়বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুর বিনাশে উদ্যত থাকিবে।

শ্বেতকাকীয়বৃত্তি শব্দের অর্থ এই যে—শ্বা, এত, কাক = এই ত্রিতয়ের বৃত্তি। শ্বা শব্দের অর্থ কুকুর। এত শব্দের অর্থ মৃগ। কাক শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। কুকুরের বৃত্তি জাগরূকত্ব—মৃগের বৃত্তি ভয়চকিতত্ব—এবং কাকের বৃত্তি ইঙ্গিতাভিজ্ঞত্ব। এই ত্রিবিধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শত্রুরাজ্যে বাস করিবে। কপটভাবে গাঢ় মিত্রতা প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুকে বহুব্যয়সাধ্য এবং এবং দীর্ঘদিনসাধ্য নানাবিধ কর্ম্মে উৎসাহিত করিবে। বলবান্ শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ বিরোধিতাতে কখনও প্রবৃত্ত হইবে না। নদী যেমন তাহার গতিবিরোধি-পর্ব্বতাদিকে আঘাত করে তুমি তাহা করিও না। নানাবিধ ভোগব্যসনে শত্রুকে অতিশয় আসক্ত করিয়া তাহার কোষ ক্ষীণ করিয়া দাও—নানাবিধ পারলৌকিক কর্ম্মের গুণ বর্ণনা করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বিবিধ মহাযজ্ঞ ও দানাদিতে শত্রুকে উদ্‌যুক্ত কর—তাহাতে শত্রুর কোষক্ষয় হইবে এবং শত্রুকোষপুষ্ট ব্রাহ্মণাদি, তোমার প্রতি তুষ্ট হইবে।

ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠাতা পুণ্যশীল পুরুষ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন—স্বর্গে পুণ্যতম স্থান লাভ হয়—এই সমস্ত কথা বলিয়া শত্রুকে কোষক্ষয়কারক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইবে—কোষক্ষয় হইলে ক্ষীণকোষ শত্রু স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইবে। অতিমাত্র ভোগপ্রসক্তিরূপ অধর্ম্মদ্বারা এবং মহাযজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা শত্রু দুর্ব্বলকোষ হইয়া পড়িবে।

এইরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মদ্বারা শত্রুর কোষ বিনাশে যত্নবান্ হইবে। ক্ষীণকোষ শত্রু আর বিরোধিতা করিতে সমর্থ হইবে না। অর্থবল বিনষ্ট হইলে শত্রু স্বভাবতঃই আনত হইবে। শত্রুর নিকটে সর্ব্বদা দৈববলের প্রশংসা করিবে—পুরুষকার দৈববলের নিকট অকিঞ্চিৎকর এজন্য পুরুষকার অবলম্বন বুদ্ধিমানের কাজ নহে—দৈবের প্রতি নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এইরূপ প্ররোচনাদ্বারা শত্রুর পুরুষকার পরিত্যাগ করাইয়া দৈবপরায়ণ করাইলে স্বভাবতঃই শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বিশ্বজিৎ প্রভৃতি সর্ব্বস্বদক্ষিণকযজ্ঞে শত্রুকে প্রবৃত্ত করাইবে—আর তাহাতে শত্রু সর্ব্বথা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হীনবল হইবে। শত্রু হীনবল হইলে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। শত্রুর রাষ্ট্রে নানাবিধ দুঃখদুর্দ্দশার কথা শত্রুর নিকট বলিবে ও তাহার প্রতিকারের জন্য শত্রুর অর্থব্যয় করাইবে। নানাবিধ পুণ্যজনক কর্ম্মের কথা বলিবে—সমস্ত দিকে ইহাই লক্ষ্য রাখিবে যে যাহাতে শত্রুর কোষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরমমিত্ররূপে অবস্থান করিয়া শত্রুদ্বারা সেই সমস্ত কোষক্ষয়কারক কর্ম্ম করাইবে। নানাবিধ কপটপুরুষদ্বারা সিদ্ধঔষধ প্রয়োগ করিয়া শত্রুর হস্তী অশ্ব ও পদাতিসৈন্য বিনাশ করাইবে। এইরূপ আরও অনেকপ্রকার দম্ভযোগদ্বারা বুদ্ধিমান্ পুরুষ প্রবল শত্রুকেও নিপীড়িত করিতে পারেন।

এই সমস্ত উপদেশ কালকবৃক্ষীয় মুনি কোশলরাজ ক্ষেদর্শীকে করিয়াছিলেন। মুনি দ্বারা উপদিষ্ট এই সমস্ত কূটনীতি গ্রহণে রাজা ক্ষেমদর্শী অসম্মত হইলে মুনি রাজার সাধুতা, দীর্ঘদর্শিতা এবং উৎসাহশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া—কোশলরাজের শত্রু বিদেহরাজাকে কোশল রাজের সহিত মিত্রভাবে সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে—এই উৎসাহী কোশলরাজ একান্ত নিপীড়িত হইলে শত্রুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইবেন। কোশলরাজ উৎসাহী, নীতিজ্ঞ, দৃঢ়বুদ্ধি, যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত—কিন্তু যুদ্ধে নানাবিধ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী এজন্য কোশলরাজের সহিত সন্ধি করাই উচিত। মুনির কথা অনুসারে বিদেহরাজও কোশলরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

প্রাচেতস মনুর নীতি

আমরা পূর্ব্বে ভগবান্ প্রাচেতস মনুকে রাজধর্ম্মের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই প্রাচেতস মনু প্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র এখন উপলব্ধ না থাকিলেও প্রাচেতস মনু প্রণীত নীতিশাস্ত্র হইতে দুইচারিটি কথা মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমরা এখানে দেখাইতেছি।

শান্তি পর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে প্রাচেতস মনু প্রণীত নীতির কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন হে মহারাজ! প্রাচেতসমনু তাঁহার রাজধর্ম্মে বলিয়াছেন যে ছয় প্রকার লোককে মানুষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আচার্য্য যদি প্রবক্তা না হন, ঋত্বিক্ যদি বেদাধ্যায়নসম্পন্ন না হন, রাজা যদি প্রজাগণকে রক্ষা করিতে না পারেন, ভার্য্যা যদি প্রতিকূলবাদিনী হয়, গবাদিপশুর পালক যদি গ্রামবাসে অভিলাষী হয়, আর নাপিত যদি অরণ্যবাসে অভিলাষী হয়, তবে এই ছয়টি পুরুষই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শান্তিপর্ব্ব ১১২ অধ্যায়ে প্রাচেতস মনুর নীতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে—মন্ত্রণাই বিজয়ের মূল—এজন্য মনু, বুদ্ধিদ্বারা বিজয়কেই শ্রেষ্ঠ বিজয় বলিয়াছেন—যুদ্ধাদিদ্বারা বিজয়কে নিকৃষ্ট-বিজয় বলিয়াছেন।

কণিক নীতি

আমরা পূর্ব্বে যে ভারদ্বাজনীতি বলিয়াছি তাহা এই কণিক নীতিরই অনুরূপ। ভারদ্বাজনীতিরই বহু শ্লোক কণিক নীতিতে বলা হইয়াছে অথবা কণিকনীতিরই বহুশ্লোক ভারদ্বাজনীতিতে উক্ত হইয়াছে। কণিক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কূট মন্ত্রী ছিলেন—এজন্য কণিক ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্যগণের মধ্যেই একজন অমাত্য। ইনি ব্রাহ্মণ এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য। মহাভারতে এই কণিককে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আদি পর্ব্বে ১৪০ অধ্যায়ে এই নীতি বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বৃদ্ধি এবং পাণ্ডবগণের প্রতি রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণের অনুরাগ দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইতঃপর পাণ্ডবগণই রাজা হইবে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন রাজা হইতে পারিবেন না। পাণ্ডবেরা অধিকতর গুণশালী বলিয়া রাষ্ট্রবাসিজনগণ তাহাদের প্রতিই অনুরক্ত দুর্য্যোধনের প্রতি অনুরক্ত নহে। দুর্য্যোধনের রাজ্যলাভ ঘটিবে না—ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহার মন্ত্রী কণিকের নিকট হইতে মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শদান প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহাই কণিকনীতি নামে প্রসিদ্ধ। কণিকের নীতি শ্রবণ করিয়াই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য জতুগৃহদাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মন্ত্রী কণিকের নিকট ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার ভীতি, ও উদ্বেগের বিষয় প্রকাশ করিয়া ভয় প্রশমনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মন্ত্রী কণিক বলিয়াছিলেন যে—আমি তোমার নিকটে রাজনীতি শাস্ত্রের রহস্য বলিব কিন্তু রাজনীতিশাস্ত্রের অর্থ তীক্ষ্ণ, মধুর নহে। এই তীক্ষ্ণশাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি কোনও অসূয়া প্রদর্শন করিও

না। তুমি মনে করিতে পার কণিক ব্রাহ্মণ হইয়াও অতি তীক্ষ্ণ উপায়ের উপদেশ করিতেছে এজন্য আমার প্রতি তোমার অসূয়া আসিতে পারে—কিন্তু তুমি ইহা মনে রাখিবে—আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা আমার কোন ব্যক্তিগত মত নহে—রাজনীতি শাস্ত্রের যাহা নির্দ্দেশ মাত্র তাহাই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। ভারদ্বাজনীতিতে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে কণিকনীতিতেও প্রায় তাহাই বলা হইয়াছে। যে সমস্ত কথা ভারদ্বাজনীতিতে বলা হয় নাই কেবল কণিকনীতিতেই বলা হইয়াছে—তাহাই আমরা এস্থলে বলিব।

কণিক বলিয়াছেন মহারাজ! মৃতশত্রু ভয় উৎপাদন করিতে পারে না। এইজন্য শত্রুর বিনাশে শত্রুকৃত উদ্বেগেরও অবসান হইয়া থাকে। শত্রু যে কোন অবস্থায় জীবিত থাকিলেই শত্রু হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে—এজন্য শত্রু শরণাগত হইলেও শত্রুর প্রতি দয়া কর্ত্তব্য নহে—কিন্তু তাহার বিনাশই কর্ত্তব্য। রাজা সর্ব্বদা রাষ্ট্রের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বকীয় রাষ্ট্রের সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক শত্রুর ছিদ্রদর্শী হইবেন। রাজা শত্রুর প্রতি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবেন—কখনও বিশ্বস্ত থাকিবেন না। নানা উপায়ে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সমূলে শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন। শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে কখনও বিজিগীষু রাজা অগ্ন্যাধান, নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান—গৈরিক বস্ত্র ধারণ—জটা অজিন প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া লোকের নিকট অতি ধার্ম্মিকরূপে প্রখ্যাত হইয়া অনবহিত শত্রুর বিনাশসাধন করিবেন। যেমন পশুপালক অনবহিত হইলে বৃক (নেকড়েবাঘ) অতি দ্রুত পশুপালকের পশু বিনাশ করে এইরূপ রাজাও অনবহিত শত্রুর বিনাশ করিবেন। কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিয়া রাজা স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন। ধর্ম্মাচরণদ্বারা লোক বিশ্বস্ত হইয়া থাকে এইজন্য ধার্ম্মিকতার বিজ্ঞাপন শত্রু ও মিত্র উভয়েরই আকর্ষক হইয়া থাকে। লোক যেমন আক্সীদ্বারা বৃক্ষশাখা আনত করিয়া তাহা হইতে পক্বফল গ্রহণ করে এইরূপ কপটভাবে ধর্ম্মাচরণও আক্শীর মত লোকচিত্তের আকর্ষক হইয়া থাকে। লোক আকৃষ্ট হইয়া আনত হইলে কপটধর্ম্মাচারী অনায়াসে আনত লোকদিগের নিকট হইতে স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন। শত্রুর উচ্ছেদের জন্য নীতিশাস্ত্রে নানাবিধ কর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে।

যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুর উচ্ছেদ হইতে পারে বিজিগীষু রাজা সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। বিজিগীষু রাজা কালাপেক্ষী হইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজন হইলে শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করিবেন—এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র স্কন্ধস্থিত শত্রুর বিনাশ করিবেন। শত্রুকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য বিজিগীষু রাজা কখনও শত্রুর প্রতি সান্ত্ব প্রয়োগ করিবেন অর্থাৎ সামবাক্য প্রয়োগ করিবেন। শত্রুকে অনুকূল করিবার জন্য সান্ত্ব প্রয়োগ, মনু সপ্তম অধ্যায় ১৭২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—এস্থলেও কণিক সান্ত্ব প্রয়োগ দ্বারা শত্রুকে অনুকূল করিতে বলিয়াছেন। সান্ত্ব প্রয়োগে শত্রু অনুকূল না হইলে—পর্য্যাপ্ত দানদ্বারা শত্রুকে অনুকূলে আনিয়া তাহার উচ্ছেদ করিবে—এইরূপ কোনস্থলে ভেদ ও কোনস্থলে দণ্ডদ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ করিবে। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে সান্ত্ব, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? এতদুত্তরে কণিক একটি উপাখ্যানদ্বারা সান্ত্বাদি প্রয়োগে শত্রুর উচ্ছেদের বর্ণনা করিয়াছিলেন। কণিক বলিয়াছিলেন কোন অরণ্যে ব্যাঘ্র, মূষিক, বৃক (নেকড়েবাঘ), নেউল ও শৃগাল বাস করিত। এই পাঁচটি প্রাণী একটি পরিপুষ্ট মৃগের বধে উদ্যত হইয়া অসমর্থ হইলে শৃগাল তাহাদিগকে বলিয়াছিল—মৃগ সুপ্ত হইলে এই মূষিক তাহার পায়ের ক্ষুরগুলি ভক্ষণ করুক—তাহাতে মৃগ আর পূর্ব্বের মত দৌড়াইতে পারিবে না—এবং অনায়াসে ব্যাঘ্রের বধ্য হইবে। শৃগালের এই পরামর্শ অনুসারে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক মৃগ হত হইলে শৃগাল একাকী মৃগের সমস্ত মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া ব্যাঘ্রাদি পশুগণকে বলিয়াছিল তোমরা সকলে স্নান করিয়াআইস আমি মৃগশরীর রক্ষা করিতেছি।

শৃগালের বচনানুসারে তাহারা সকলে স্নান করিতে গেলে শৃগাল চিন্তাকুল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র আসিয়া শৃগালের চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শৃগাল বলিল—হে পশুরাজ! মূষিক বলিয়াছে যে এই ব্যাঘ্রের বলে ধিক্—ব্যাঘ্র বলশালী হইয়াও আজ আমার দ্বারা উপার্জ্জিত মৃগ মাংসই ভক্ষণ করিবে। বস্তুতঃ আমিই ত মৃগকে বধ করিয়াছি।

মূষিকের এরূপ আস্ফালনে আমি অতিশয় ব্যথিত ও শোকাকুল হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল যে আমি মূষিকের উপার্জ্জিত মাংস ভক্ষণ করিতে চাই না। আমি অন্যপশু বধ করিয়া ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া ব্যাঘ্র দূর অরণ্যপ্রদেশে চলিয়া গেল—তখন মূষিক আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃগাল মূষিককে বলিল যে নকুল বলিয়াছে মৃগমাংস অতি বিরস তাহা খাইতে আমার ইচ্ছা নাই। মূষিকের মাংস খাইতেই আমার ইচ্ছা—তুমি অনুমতি করিলে আমি এই মূষিককেই ভক্ষণ করিব, মূষিক এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র ভয় বিহ্বল হইয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বৃক আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃককে দেখিয়া শৃগাল বলিল মৃগরাজ ব্যাঘ্র তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ইহাতে তোমার ঘোর অকল্যাণ হইবে। মৃগরাজ সত্বরই তাঁহার স্ত্রীর সহিত এখানে আগমন করিবেন। অতঃপর তোমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হয় কর। শৃগালের এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃক তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর নকুল উপস্থিত হইল। তখন শৃগাল নকুলকে বলিল শোন নকুল! আমি ব্যাঘ্র বৃকাদি সকলকেই নিজের বাহুবলে পরাস্ত করিয়াছি—তোমার যদি শক্তি থাকে তবে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মাংস ভক্ষণ কর। তখন নকুল বলিল—ব্যাঘ্র বৃক এবং বুদ্ধিমান মূষিক সকলেই তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছে সুতরাং তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বীর—তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য আমার নাই—এই বলিয়া নকুল প্রস্থান করিল—তখন শৃগাল অত্যন্ত প্রসন্ন মনে সমস্ত মৃগ মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল।

শৃগাল স্বীয় মন্ত্রণা শক্তির প্রভাবেই এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিজিগীষু রাজাও এইরূপ মন্ত্রণা শক্তির প্রভাবে একাকী ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভীরুকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, বীরপুরুষকে স্তুতি অভিবাদনাদি দ্বারা, লুব্ধকে অর্থ প্রদান দ্বারা, সম বল বা অল্প বল ব্যক্তিকে নিজের শক্তি দ্বারা বশীভূত করিবেন। যে কোন উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করিতে বিজিগীষু পরাঙ্মুখ হইবেন না। কখনও শপথ বাক্য উচ্চারণ দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিয়া শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন—কখনও অর্থ প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন—কখনও বা বিষপ্রয়োগ বা নানাবিধ মায়াযোগদ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন।

বিজিগীষু রাজা শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও অক্রুদ্ধ রূপে থাকিবেন—অর্থাৎ ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। প্রত্যুত সহাস্য বদনে শত্রুর সহিত আলাপাদি করিবেন। এমন কি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর নিন্দা পর্য্যন্তও করিবেন না। সুযোগ উপস্থিত হইলে শত্রুর সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন। শত্রুর বধ স্থির করিয়াও তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবেন—শত্রু হত হইলে পরে শত্রুর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবেন। নিহত শত্রুর জন্য নানাবিধ শোক করিবেন এমন কি রোদন পর্য্যন্ত করিবেন। বিজিগীষু রাজা সব সময়েই শত্রুকে নিজের প্রতি বিশ্বস্ত রাখিবেন—যেন তাঁহার প্রতি শত্রুর কোনরূপ অবিশ্বাস না আসিতে পারে তাহার প্রতি সযত্ন থাকিবেন।

শত্রুর প্রতি সান্ত্ব প্রয়োগ করিবেন, শত্রুর নিকট ধর্ম্মকথা বলিবেন, প্রয়োজন হইলে অর্থও দিবেন শত্রুর ছিদ্র পাইলেই তাহাকে প্রহার করিবেন ও তাহার উচ্ছেদ—সাধন করিবেন। শত্রুর উচ্ছেদের জন্য বিজিগীষুরাজা ঘোরতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিবেন, ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিলে তাঁহার অনুষ্ঠিত ঘোর অধর্ম্মও আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে, যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা সুবিশাল পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, এইরূপ কৃত্রিমধর্ম্মাচরণও বিজিগীষুরাজার ঘোর অপরাধকে প্রচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। শত্রুর নানাবিধ অপকার করিতে বিজিগীষু সর্ব্বদা উদ্যত থাকিবেন। বিজিগীষু রাজা নির্ধন ও চোর প্রভৃতিকে স্বরাষ্ট্রে বাস করাইবেন না।

শত্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন—শত্রুকে দর্শন করিয়া উত্থান ও আসনাদি দ্বারা শত্রুকে প্রসন্ন করিবেন এবং ধনাদিও প্রদান করিবেন, এইরূপে শত্রু অতিবিশ্বস্ত হইলে তাহাকে এমন প্রহার করিবেন যাহাতে সে আর কখনও শত্রু হইতে না পারে। বিজিগীষুরাজা সর্ব্বদা স্বকীয় রাজ্যে ও শত্রু রাজ্যে চার সমূহ নিযুক্ত করিয়া তাহার সমস্ত সংবাদ অবগত হইবেন। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুক বেশধারী চারগণ সর্ব্বদা শত্রু রাজ্যে ও স্বরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিবে। বিজিগীষুরাজা সর্ব্বদা বাক্যে অত্যন্ত বিনীত থাকিবেন এবং তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা শাণিতক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ থাকিবে। বিজিগীষু প্রয়োজন হইলে শত্রুর নিকট অঞ্জলিবন্ধন, শপথ, সান্ত্ব প্রয়োগ করিবেন এমন কি প্রয়োজন হইলে অবনত হইয়া শত্রুর পাদবন্দন এবং নানাবিধ প্রলোভন দেখাইবেন। সুসজ্জিত হইয়াও সুপুষ্পিত হইয়াও নিষ্ফল থাকিবেন। ফলবান্ হইয়াও দুরারোহ থাকিবেন। কাঁচা থাকিয়াও পাকার মত দেখাইবেন। বিজিগীষু রাজা কখনও গর্ব্বিত হইবেন না। সান্ত্ব (সাম এবং উপপ্রদান দ্বারা অনুকূলীকরণের নাম সান্ত্ব) প্রয়োগে নিপুণ হইবেন, অন্যের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবেন না। সর্ব্বদা স্বমণ্ডল ও পরমণ্ডল অবলোকন করিবেন এবং মন্ত্রণাকুশল ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন।

বিজিগীষু রাজা নিজের উদ্ধারের জন্য মৃদু ও দারুণ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পরাঙ্মুখ হইবেন না। দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিজের উদ্ধার করিয়া স্বস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। প্রাণ সঙ্কটের সম্মুখীন না হইয়া কেহই মহাশ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয় না—এজন্য প্রাণসংশয় কার্য্যে কখনও বিজিগীষু পশ্চাৎপদ হইবেন না। পরের মর্ম্মচ্ছেদ না করিয়া, দারুণ নিষ্ঠুর কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, এবং শত্রুকে বধ না করিয়া, কেহই মহাশ্রী লাভ করিতে পারে না। শত্রু সৈন্য যখন বিপন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, বিপদাপন্ন, অন্ন জল ও ঘাসের অভাবযুক্ত, এবং বিশ্বস্ত চিত্ত, সেই সময় অবশ্য আক্রমণ করিয়া শত্রুর উচ্ছেদ করিবে। ধন ও মিত্র সংগ্রহে এবং যুদ্ধে বিজিগীষু সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকিবেন এবং রাষ্ট্রের বৃদ্ধি কারক কর্ম্মে অত্যন্ত উৎসাহী থাকিবেন। বিজিগীষু রাজার মন্ত্রিত কোন কার্য্যই যেন শত্রুগণ জানিতে না পারে, কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইলে লোকে জানিতে পারিবে। দণ্ডদ্বারা উপনত শত্রুর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করে সে নিজেই নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে। বিজিগীষু অনাগত বর্ত্তমান সমস্ত কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই দৃষ্টির অভাব বশতঃ—সর্ব্বত্র প্রয়োজনের বিনাশ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করিবেন না। ক্ষুদ্র শত্রুও উপেক্ষিত হইলে তালবৃক্ষের মত অসংখ্য মূল বিস্তার করিয়া সুদৃঢ় হইয়া থাকে। অরণ্যে ক্ষুদ্রবহ্নি নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ যেমন মহান্ বহ্নিরূপে পরিণত হইয়া অরণ্যকে গ্রাস করে এইরূপ বিজিগীষু রাজা অরণ্যনিক্ষিপ্ত অগ্নির মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবেন। মন্ত্রী কণিক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদুলানুশাসন

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ১৩৩ অধ্যায় হইতে ১৩৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত চারিটি অধ্যায়ে বিদুলানুশাসন বিবৃত হইয়াছে। এই বিদুলানুশাসন কেবলমাত্র মহাভারতেরই নহে—কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বলতম রত্ন। সৌবীররাজ মহিষী বিদুলা, সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত স্বীয় একমাত্র পুত্র সঞ্জয়ের নিরুৎসাহ ও নিরমর্ষ দর্শন করিয়া তাহাকে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বিদুলানুশাসন নামে খ্যাত। সঞ্জয়কে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য মহারাণী বিদুলা যখন অনুশাসন করিয়াছিলেন তখন তিনি বিধবা। এই বিধবা রাজমহিষী নিজের একমাত্র পুত্র সঞ্জয়ের হৃদয়ে প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, শত্রুকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য, যে আবেগপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন—তাহাতে মহারাণীর দীর্ঘদর্শিতা, দুর্ব্বার ক্ষাত্রতেজ ও রাজনীতিকুশলতা তাঁহার প্রতি কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহারাণী অতি যশস্বিনী, সৎকুলসম্ভূতা, অতুলনীয় ক্ষাত্রতেজে দৃপ্তা, বিদুষী, রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞা এবং তদানীন্তন রাজসভাসমূহে প্রখ্যাতকীর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে অতিভীরু কাপুরুষের চিত্তও অতিশয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমরা এখানে মহারাণী বিদুলার অনুশাসন সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করিব।

ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে যাঁহারা সংস্কৃতবিদ্যার অভ্যাস করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই এই বিদুলার অনুশাসনের সংবাদ রাখেন। ইহা আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের ও জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক সৌবীররাজ্য আক্রান্ত হইলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৌবীররাজ সঞ্জয়, সিন্ধুরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুৎসাহী, মৃদু প্রকৃতি সৌবীররাজ সঞ্জয়—যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সৌবীররাজ্য সম্পূর্ণভাবে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিতান্ত দীন মনে স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহারাণী বিদুলা—পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে—রে কুপুত্র! তুমি মিত্রকুলের শোকবর্দ্ধক এবং শত্রুকুলের আনন্দবর্দ্ধক। তোমার মত হীন কাপুরুষ কখনও আমার গর্ভে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং স্বর্গত মহাবীর সৌবীররাজ কর্ত্তৃকও উৎপন্ন হইতে পারে না। তুমি কোথা হইতে আসিয়া এই শ্রেষ্ঠ রাজবংশে প্রবিষ্ট হইয়াছ? যে শত্রুকৃত তিরস্কার অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, শত্রুর উচ্ছেদের জন্য যাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় না তাদৃশপুরুষ, পুরুষজনসংখ্যায় গণনীয় হওয়া উচিত নহে। সে পুরুষ নহে—সে ক্লীব। তুমি আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছ তাহাতে তোমার ভবিষ্যৎজীবন অন্ধকারময় হইয়াছে। তুমি ক্লীবতা পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারের জন্য অতি উৎসাহের সহিত গাত্রোত্থান কর। পৈতৃক রাজ্যের গুরুভার বহনে যোগ্য হইয়া উত্থিত হও। অসমর্থ মনে করিয়া নিজেকে অপমানিত করিও না। অল্প সমৃদ্ধিতে কৃতার্থ হইও না। পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধাররূপ পরমকল্যাণ কার্য্যে মনকে দৃঢ় করিয়া নির্ভীকচিত্তে শত্রুর উচ্ছেদে যত্নবান হও। হে কাপুরুষ! অতি উৎসাহের সহিত উত্থিত হও—শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মৃতবৎ শয়ান থাকিও না। তোমার এই অবস্থা শত্রুকুলকে আনন্দিত করিতেছে এবং মিত্রকুলকে শোকে নিমগ্ন করিতেছে।

তোমার মর্য্যাদা উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কাপুরুষেরাই অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে—যেমন ক্ষুদ্র নদী অল্পজলে পূর্ণ হয় অল্পবস্তুতেই মূষিকের অঞ্জলি পূর্ণ হয়—অতিঘোর বিষধর সর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে যাইয়া যদি মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেষ্ঠ। তোমার এই ঘোর শত্রুর বিনাশের জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া তুমি যদি মৃত্যুকেও আলিঙ্গন কর তাহাও শ্রেষ্ঠ। শত্রুকে নির্ম্মূল করিতে যাইয়া তুমি নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হও—কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া জীবন রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শত্রুর উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেও দুর্ব্বার পরাক্রম প্রকাশ করিতে বিরত হইও না। তুমি শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হও। শ্যেনপক্ষী নির্ভীকচিত্তে আকাশপথে দ্রুত পরিক্রমণ করিয়া যেমন শত্রুকে গ্রহণ করে ও তাহাকে বিনাশ করে, তুমিও সেইরূপ ভয়লেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বা গুপ্তভাবে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ পূর্ব্বক শত্রুকে গ্রহণ কর ও তাহার বিনাশ কর। রে পুত্র! তুমি বজ্রাহত মৃত ব্যক্তির মত শয়ন করিয়া আছ কেন? রে কাপুরুষ! দুর্ব্বার উৎসাহের সহিত গাত্রোত্থান কর, শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিও না। তুমি দীন হইয়া জীবনের অবসান ঘটাইওনা নিজের অসাধারণ বিক্রমদ্বারা তুমি সর্ব্বত্র কীর্ত্তি মণ্ডিত হও। সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে সাম জঘন্য উপায় ভেদ মধ্যম উপায় এবং দান নীচ উপায়। তুমি জঘন্য মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ উপায় পরিত্যাগ করিয়া উত্তম উপায় দণ্ড অবলম্বন কর। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তোমার বীরগর্জ্জনে দেশ উদ্বুদ্ধ হউক। গাব (তিন্দুক) কাঠ যেমন স্ফুলিঙ্গসমূহ বিকীর্ণ করিতে করিতে সশব্দে মহাবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়, তুমি এইরূপ ক্ষণকালও প্রজ্জ্বলিত হও কিন্তু তুষাগ্নির মত শিখা বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ধূম উদ্‌গীরণ পূর্ব্বক দীর্ঘ জীবন ধারণ করিও না।

গৌরবমণ্ডিত অল্পকাল জীবনও শ্রেষ্ঠ কিন্তু গৌরবহীন দীর্ঘজীবন অতি তুচ্ছ। কোন ক্ষত্রিয়ের গৃহেই যেন তোমার মত মৃদুপরাক্রম গর্দ্দভ জন্ম গ্রহণ না করে। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করিয়া, যুদ্ধে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিকট অঋণ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়োচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে জয় অথবা মৃত্যু ইহার কোনটিতেই ক্ষত্রিয়ের শোকের কারণ নাই। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করিয়া যুদ্ধে জয়ে বা পরাজয়ে পণ্ডিতগণ অনুশোচনা করেন না।

যুদ্ধে জয় লাভের জন্য, শত্রু উচ্ছেদের জন্য, যাহা কিছু করণীয় তাহার অনুষ্ঠান কর। প্রাণকেই মহাধন বলিয়া মনে করিও না। প্রাণরক্ষা করাই বড় বৃহৎকর্ম্ম নহে। নিজের দুর্ব্বার বীর্য্য উদ্ভাবন কর অথবা যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। রে পুত্র! ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জন্য জীবিত রহিয়াছ? তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে—কীর্ত্তি তোমার বিনষ্ট হইয়াছে। ভোগমূলরাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে আর কিসের জন্য জীবিত রহিয়াছ? যুদ্ধে যে সময় নিজের মৃত্যুও জানিতে পারিবে নিজের পতনকাল জানিয়াও শত্রুর জঙ্ঘাদেশে দারুণ প্রহার করিয়া জীবনত্যাগ করিবে। কোন অবস্থাতেই শত্রুর বিনাশে শিথিল প্রযত্ন হইবে না। নিজের কোষ বল প্রভৃতির ক্ষয়েও কখনও বিষণ্ন হইবে না—সর্ব্ব অবস্থাতেই উৎসাহ অবলম্বন করিবে। অতিশয় উদ্যমের সহিত এই গুরুরাজ্যভার বহন কর। মনে রাখিবে সৎকুল সম্ভূত অশ্ব কখনও গুরুভারে বিষণ্ন হইয়া প্রপীড়িত হয় না। নিজের পৌরুষ অবগত হও, সত্ত্ব ও মানের বর্দ্ধন কর। তোমার জন্যই এই পবিত্র রাজবংশ নিমগ্ন হইয়াছে। ইহাকে নিজের পৌরুষ দ্বারা পুনরুত্থান কর।

মানুষ যাহার অদ্ভুত মহৎকার্য্যরাশির প্রশংসা করে না—যে জীবনে কখনও শ্রেষ্ঠকার্য্য করিতে পারে নাই সে কেবল মনুষ্যসংখ্যার বর্দ্ধকমাত্র—সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। দান, তপস্যা, শৌর্য্য প্রভৃতি কার্য্যে যাহার যশ দিঙ্‌মণ্ডলে উদ্‌ঘোষিত হয় নাই তাহাকে মাতৃদেহ নির্গত মলই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা, ধন ও বিক্রমদ্বারা জনসাধারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়—তাহাকেই পুরুষ বলা যায়। আজ তুমি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যে অতি দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছ, এই বৃত্তি অতি নৃশংস

অযশস্য ও অতি দুঃখদায়ক ও কাপুরুষোচিত। যে হীন দুর্ব্বল পুরুষকে দর্শন করিয়া শত্রুগণ আনন্দিত হইয়া থাকে, যে জগতের নিকট অবজ্ঞাত এবং গৃহ বস্ত্রাদিবিবর্জ্জিত এবং যে যৎকিঞ্চিৎ জীবনোপায়কেই মহালাভ বলিয়া মনে করে—তাদৃশ কাপুরুষকে লাভ করিয়া তাহার বন্ধুগণ কখনও সুখলাভ করিতে পারে না, আজ আমাদের কি দশা উপস্থিত হইয়াছে—আজ আমরা এই সৌবীর রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত হইব। আমাদের কোন সম্মান প্রতিপত্তি থাকিবে না—দীনহীনের মত আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। আমরা সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত হইব—আমরা স্থানভ্রষ্ট হইব এবং অতি তুচ্ছজনরূপে পরিগণিত হইব। তুমি এই বংশের নাশের জন্য, অকীর্ত্তি প্রখ্যাপনের জন্য, পুত্ররূপে কলি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। যাহার ক্রোধ নাই, উৎসাহ নাই, বীর্য্য নাই, যে শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধক এই সঞ্জয়ের মত তাদৃশ পুত্র যেন কোন রমণী প্রসব না করে। তুমি ধূমায়িত হইয়া অবস্থান করিও না প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠ।

শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ কর—মুহূর্ত্তকাল বা ক্ষণকাল মাত্রও শত্রুর শীর্ষদেশে প্রজ্জ্বলিত হও। পুরুষের ইহাই পুরুষত্ব যে সে ক্রোধসম্পন্ন এবং অপকারীর পূর্ণ প্রত্যপকার করিতে সমর্থ। যে ক্রোধবিবর্জিত ও নিতান্ত ক্ষমাবান্ সে স্ত্রীও নহে—পুরুষও নহে। সন্তোষ শ্রীবৃদ্ধির শত্রু। অত্যন্ত দয়া শ্রীবৃদ্ধির শত্রু। এইরূপ নিরুৎসাহ ও ভয়, শ্রীবৃদ্ধির বিরোধী। নিশ্চেষ্ট পুরুষ কখনও শ্রীলাভে সমর্থ হয় না। সন্তোষ, দয়া, অনুৎসাহ ও ভয় ইহারাই পরাজয়ের কারণ। ইহারাই ঘোর পাতক। ইহাদিগকে তুমি সত্বর পরিত্যাগ কর। হৃদয় লৌহময় করিয়া শ্রীলাভে যত্নবান্ হও। পুরুষপদের ইহাই অর্থ যে পর অর্থাৎ শত্রুকে যে সহন করিতে পারে—অভিভূত করিতে পারে তাহকেই পুরুষ বলে। যে শত্রুঘাতী সেই পুরুষ। পর—সহ অর্থাৎ শত্রুঘাতী, এস্থলে পকারের অকার উকার হইয়াছে—রকারের আকারও উকার হইয়াছে ও অন্তিম হকারের লোপ হইয়াছে এবং উকারের পরবর্ত্তী সকার ষকার হইয়াছে, ইহাই পুরুষ পদের নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্ত্রীর মত জীবন-যাপন করে—তাদৃশ পুরুষের পুরুষ নামই ব্যর্থ। যে ব্যক্তি মহাবলশালী, শূর, সিংহবিক্রমী, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও তাহার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ আনন্দিত হইয়া থাকে। যে রাজা নিজের প্রিয় ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীলাভে যত্নবান্ হয়—সে অচিরকাল মধ্যে স্বীয় প্রকৃতিপুঞ্জের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে।

এতদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছিলেন যে—মা! আমারই যদি মৃত্যু ঘটে—তবে সমগ্র পৃথিবী দ্বারাই বা তুমি কি করবে? তোমার ভোগ এবং জীবন সমস্তই ত বৃথা হইয়া যাইবে। এতদুত্তরে বিদুলা বলিয়াছিলেন যে—আমাদের শত্রুগণ কিমদ্যকগণের লোক লাভ করুক। যাহারা প্রতিদিন দারিদ্র্য বশতঃ অদ্য কি খাইব এই চিন্তায় বিহ্বল থাকে তাহাদিগকে কিমদ্যক বলে এবং যাহারা মনে করে শত্রুর উচ্ছেদে এত তাড়াতাড়ি কি? শত্রুর বিনাশের জন্য অদ্য ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ নাই—আগামী যে কোন সময়ে শত্রুর উচ্ছেদ করা যাইবে—এইরূপ দীর্ঘসূত্রীকেও কিমদ্যক বলে। বিদুলা এই দ্বিবিধ লোকেরই অতি শোচনীয় অবস্থা মনে করিয়া—শত্রুগণেরই এই কিমদ্যক লোক লাভ হউক এইরূপ বলিয়াছেন।

সঞ্জয় যেন কিমদ্যক অবস্থায় উপনীত না হয় ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত, সুহৃদ্‌গণ এই অবস্থা লাভ করুক। রাজা পরিভ্রষ্ট হইয়া, সমস্ত ভোগোপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পরপিণ্ডজীবী হইয়া, অতি দীন হইয়া, তুচ্ছ প্রাণের অন্তর্গত হইয়া, জীবন ধারণের মত দুঃখ আর নাই। হে পুত্র! তুমি এই বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। সমস্ত সুহৃদ্ ও বান্ধববৃন্দ এবং ব্রাহ্মণগণের তুমি আশ্রয়স্থানীয় হও তোমার আশ্রয়েই ইহারা সুখে অবস্থান করুন। দেবতারা যেমন ইন্দ্রের আশ্রয়ে সুখে অবস্থান করেন, প্রাণিবর্গ যেমন বর্ষণশীল মেঘের আশ্রয়ে জীবনযাপন করে। সমস্ত প্রাণিবর্গ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখে

জীবনধারণ করে তাহার জীবনই সার্থক। যেমন পক্বফলযুক্ত বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণ সুখে অবস্থান করে নিস্ফল বৃক্ষের জীবন ব্যর্থ।

ফলপূর্ণ বৃক্ষ সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় বলিয়া তাহার জীবনই সার্থক—যে শূর পুরুষের বিক্রমকে আশ্রয় করিয়া তাহার বান্ধববর্গ সুখে অবস্থান করে তাহার জীবন সার্থক যেমন ইন্দ্রের বিক্রম আশ্রয় করিয়া দেবতারা স্বর্গে সুখে বাস করেন। যে ব্যক্তি নিজের পরাক্রমকে আশ্রয় করিয়া শত্রুনির্য্যাতন পূর্ব্বক অবস্থিত থাকেন তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন।

শত্রুদ্বারা নির্জ্জিত পুরুষের ইহলোকে দুর্গতি ও পরলোকেও অশুভ গতি হয়। যে ক্ষত্রিয় অতি বিক্রম সহকারে নিজের তেজ প্রকাশ করে না, ভয়বশতঃ কেবল মাত্র জীবিতরক্ষা করার জন্য উদ্‌যুক্ত থাকে—তাহাকে চোর বলা হয়। মুমূর্ষূ ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান যেমন নিষ্ফল, ঔষধ মুমূর্ষূ ব্যক্তির প্রতি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপ তোমার মত কাপুরুষের নিকটেও গুণবৎ যুক্তিযুক্ত উপদেশ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

বিদুলা আরও বলিয়াছিলেন যে—সিন্ধুরাজ জয়লাভ করিলেও তাহার শাসনে অসন্তুষ্ট বহু ব্যক্তি সিন্ধুরাজের রাজ্যেই বাস করে। কেবল মাত্র সিন্ধুরাজের বিপৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এবং নিজেদের অসামর্থ্যবশতঃ তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে, তুমি সিন্ধুরাজের রাজ্যে যাহারা ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত ও অপমানিত তাহাদিগকে নিজের সহায় রূপে গ্রহণ কর। সিন্ধুরাষ্ট্রবাসী ক্রুদ্ধাদি চতুর্ব্বর্গ তোমার সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে পারিবে, যদি তুমি বিক্রম প্রকাশ কর। তোমার উৎসাহে সিন্ধুরাষ্ট্রবাসী ক্রুদ্ধাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষ উৎসাহিত হইলে সেই দেশবাসী অন্যলোকও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে, তুমি তাহাদের সহিত সংহত হইয়া গিরি দুর্গ আশ্রয় কর—যাহাতে শত্রু তোমার উচ্ছেদ করিতে না পারে এবং সিন্ধুরাজের ব্যসনকাল প্রতীক্ষা কর—সিন্ধুরাজ অজর অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহারও নানাবিধ বিপত্তি আছে। তুমি নামতঃ সঞ্জয় হইলেও শত্রু জয়ে তোমার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই এজন্য তোমার নামই ব্যর্থ হইয়াছে, তুমি নামের সার্থক্য সম্পাদন কর।

শত্রুদ্বারা নিপীড়িত হইয়াও আবার তুমি মহাঐশ্বর্য্য লাভ করিবে—ইহা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও বলিয়াছেন—দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তুমি আবার বিজয় লাভ করিবে। তোমার সমৃদ্ধিতে যাহারা অবশ্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তোমার অসমৃদ্ধিতে যাহাদের অসমৃদ্ধি ঘটিবে, তাহারা নীতি অনুসারেই তোমার পক্ষাবলম্বী হইবে। যুদ্ধে জয় ও পরাজয় পূর্ব্বরাজগণেরও হইয়াছিল তোমারও হইয়াছে—একবার পরাজয় হইয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার জয় হইবে না এরূপ মনে করিও না। তুমি কখনও যুদ্ধের উৎসাহ হইতে নিবৃত্ত হইও না। আজ আমরা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ইহা অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর হইতে পারে না। যাহার প্রতিদিন ভোজ্যবস্তুর চিন্তা করিতে হয় তাহা অপেক্ষা হীন অবস্থা আর নাই—ইহাই নীতিবিৎ শম্বর বলিয়াছেন। রাজ্যভ্রংশ—পতিবিনাশ ও পুত্রবিনাশ অপেক্ষাও দুঃখকর—এই দারিদ্র্য মরণেরই তুল্য। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মিনীর মত একটি হ্রদ হইতে আর একটি হ্রদে আগমন করিয়াছিলাম। আমার শ্বশুরকুলও অতি সুসমৃদ্ধ ছিল—আমার স্বর্গীয় স্বামী সৌবীররাজ আমাকে বহুমান্য করিয়াছেন। আমার ঐশ্বর্য্যের পার ছিল না।

আমাকে দেখিয়া আমার সুহৃদবর্গ আনন্দমগ্ন হইতেন। সঞ্জয়! তুমি প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইতেছ বটে কিন্তু যখন আমাকে ও তোমার পত্নীকে অতি দুর্গত অবস্থায় দর্শন করিবে—তখন জীবনধারণ করিতে তোমারও

আর ইচ্ছা থাকিবে না। যখন আমাদের দাসবর্গ, কর্ম্মকরবর্গ, ভৃত্যগণ, আচার্য্য ঋত্বিক্‌গণ, পুরোহিতগণ আমাদের নিকট হইতে বৃত্তি লাভে নিরাশ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা দেখিয়া তুমিও জীবনধারণে ইচ্ছা করিবে না। তুমি পরাক্রমশালী হইয়া শত্রুকে পরাজিত করিতে না পারিলে আমার হৃদয়ের কোন শান্তিই হইবে না। প্রার্থী ব্রাহ্মণকে যদি প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিতে না পারি তবে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমি এবং আমার স্বামী কখনও প্রার্থী ব্রাহ্মণকে বিমুখ করি নাই। আমরা সকলের আশ্রয়ই ছিলাম অন্যের আশ্রিত হইয়া কখনও তাহার আজ্ঞা পালন করি নাই। আজ যদি অন্যের আশ্রিত হইতে হয়, তবে জীবন ত্যাগ করিব। আজ আমরা এই রাজ্যবাসী সকলেই মৃত। তুমি আমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর। আমাদের এই অপার বিপদের অবসান ঘটাও, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হও। আমরা হৃত রাজ্য, আমাদিগকে রাজ্যে স্থাপিত কর। তুমি যদি প্রাণভয়ে অত্যধিক ভীত না হও, তবে তুমি সমস্ত শত্রুকে জয় করিতে পারিবে। তুমি যদি ক্লীববৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাক তবে তোমার এই দুর্গতির কখনও অবসান হইবে না। তুমি এই পাপবৃত্তি ত্যাগ কর। প্রবল একটি শত্রুকে বধ করিলেও মানুষ প্রখ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। ইন্দ্রও বৃত্রকে বধ করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছিলেন। বৃত্রকে বধ করিয়াই ইন্দ্র স্বর্গলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন ও মাহেন্দ্রসদন লাভ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে সন্নদ্ধ শত্রুগণকে আহ্বানপূর্ব্বক শত্রু সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকে যে সময়ে বধ করে সে সময়ে শত্রুপক্ষ ভীত এবং অবনমিত হইয়া পড়ে। এবং তাহার বীরত্বের খ্যাতি লোকমধ্যে বিস্তার লাভ করে। ভীরু কাপুরুষগণ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শূরব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া থাকে এবং শূরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া তাহার সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধির বিবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

রাজ্য একদিকে যেমন সুখকর তাহার রক্ষাও তেমনই দুঃখকর। রাজ্যভ্রংশের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। অলব্ধ রাজ্যের লাভ ও লব্ধ রাজ্যের পরিপালন প্রভৃতি, রাষ্ট্রনায়কের যেমন অশেষ কীর্ত্তির বর্দ্ধক সেইরূপ বহুক্ষেত্রে তাহার জীবনও সংশয়িত। কারণ শত্রুকে বশীভূত করিতে পারিলে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ তাহার পুনরুত্থানের যোগ্যতা রাখেন না। রাজ্য অমৃতের সমান, শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে আক্রান্ত নরপতি, স্বর্গলাভ ও বিজয় এই দুইটির একটিকে স্থির করিয়া লইবেন। তোমার রাজ্য আজ বিধ্বস্ত—শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, এইজন্য তুমি হয় স্বর্গলাভ না হয় বিজয় ইহার একটিকে অবলম্বন কর। রাজধর্ম্ম পরিপালনে উদ্‌যুক্ত হইয়া যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশ কর। শত্রুগণকে নির্ভয় করিয়া তুমি দীন দশা প্রাপ্ত হইও না। আমাদের মিত্রপক্ষ রাষ্ট্রবাসিগণ শোকাকুল হইয়া যেন তোমাকে পরিবৃত না করে এবং শত্রুগণ সিংহনাদ করিয়া তোমাকে যেন পরিবৃত না করে। তোমাকে এইরূপ দীন হইতে দীনতর অবস্থায় আমি যেন কখনও দর্শন না করি। তুমি প্রচুর ভোগসমন্বিত হইয়া সৌবীর কন্যাগণ মধ্যে অবস্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ হর্ষলাভ কর। কিন্তু শত্রু দেশবাসী সৈন্ধবকন্যাগণের বশবর্ত্তী হইও না। তুমি যুবক, রূপবান্, বিদ্যা গৌরবে বংশ গৌরবে শ্রেষ্ঠ, তুমি লোক প্রখ্যাত যশস্বী তোমার যদি এতাদৃশ দুর্গতি হয়, তুমি যদি শত্রুর অধীন হইয়া জীবন যাপন কর তবে তাহা তোমার মৃত্যুরই সমান হইবে।

যখন আমি দেখিব তুমি বিজেতা শত্রুর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার স্তুতি করিতে করিতে শত্রুর অনুবর্ত্তন করিতেছ, এতদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমার আর কিছুই হইবে না। এই বংশের পূর্ব্বতন মহীপতিগণ কেহই শত্রুর অনুবর্ত্তন করেন নাই। তুমিও শত্রুর অনুবর্ত্তনকারী হইয়া জীবিত থাকিও না। এতদ্বংশীয় এবং পরবংশীয় নরপতিগণ যে শাশ্বত ক্ষত্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা অবগত আছি। ভগবান্ প্রজাপতিই রাষ্ট্ররক্ষক ও মহীপালগণের এই শাশ্বত অব্যয়বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ কোন ক্ষত্রিয়ই যেন ভয়বশতঃ অথবা জীবিকালাভেচ্ছু হইয়া শত্রুনরপতিগণের নিকট আনত না হন। সর্ব্ব অবস্থাতে উৎসাহ সম্পন্নই থাকিবেন কখনও

শত্রুর নিকট অবনত হইবেন না, রাজগণের দুর্ব্বার উৎসাহই তাহাদের পুরুষত্ব। মহীপতিগণ বরং অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন—তথাপি শত্রুর নিকট অবনত হইবেন না। মদমত্ত মাতঙ্গের মত যিনি শত্রুর নিকট আনত না হইয়া বরং মৃত্যুও বরণ করেন তাদৃশ নরপতিকেই মহামনা বলা হয়। ধর্ম্মের জন্য ধার্ম্মিকগণের নিকট, ব্রাহ্মণগণের নিকট, রাজা আনত হইবেন, কিন্তু ভয়বশতঃ শত্রুর নিকট কখনও আনত হইবেন না। রাজগণের ইহাই শাশ্বত বৃত্তি যে তাহার রাষ্ট্রবাসী সমস্তবর্ণের পরিপালন করিবেন এবং রাষ্ট্রকণ্টক সমস্ত দুষ্কৃতকারীর উচ্ছেদ করিবেন। রাজা সসহায়ই হউন আর অসহায়ই হউন তাঁহার যাবজ্জীবনের ইহাই ব্রত।

মহারাণী বিদুলার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র সৌবীররাজ সঞ্জয় বলিয়াছিলেন, "মা! তোমার হৃদয়ে কি করুণার লেশমাত্র নাই, আমি তোমার একমাত্র পুত্র, আমার বধের জন্য তুমি আমাকে শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিতেছ—

তোমার হৃদয় বীরত্বেপূর্ণ এবং শত্রুর প্রতি অতিশয় ক্রোধ সম্পন্ন। মনে হয় শ্রেষ্ঠ লৌহ প্রভৃতি দ্বারা তোমার হৃদয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বৃত্তি কি দারুণ! তুমি মা হইয়া আমাকে পরের মাতার মত শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছ। আমি তোমার একমাত্র পুত্র আমাকেও তুমি এইরূপ বলিতেছ। যুদ্ধে আমার মৃত্যু ঘটিলে সমগ্র পৃথিবী লাভ করিলেও কি তুমি সুখী হইতে পারিবে? আমি তোমার একমাত্র প্রিয় পুত্র, আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই—তবে তোমার ভোগ, জীবন, ঐশ্বর্য্য, সবই ত বৃথা হইয়া যাইবে।"

এতদুত্তরে মহারাণী বিদুলা বলিয়াছিলেন—সঞ্জয়! আজ তুমি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছ, তোমার সমস্ত কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রনষ্ট কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য যদি তোমাকে আমি এইরূপ না বলিতাম তবে তোমার প্রতি আমার যে বাৎসল্য, তাহা ত কেবল গর্দ্দভীর পুত্রবাৎসল্যেরই অনুরূপ হইত। ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, শত্রু কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া, সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্য্য হইতে বিযুক্ত হইয়া, কেবল মাত্র জীবন ধারণের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি পরামর্শ দিতে পারে না। এতাদৃশ জীবনধারণ সজ্জন বিগর্হিত ও মূর্খজনসেবিত। তোমার মত নিরুৎসাহ কাপুরুষ পুত্রদ্বারা কোন রমণীই পুত্রবতী হইতে পারে না। যে উৎসাহহীন দুর্বিনীত তাদৃশ পুত্রদ্বারা কিছুমাত্র পুত্রফল লাভ হইতে পারে না। দেহে আত্মবুদ্ধির মত মোহ আর কিছুই নাই। এই মোহ সাধারণ পুরুষগণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যদি রাজসিংহগণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পার তবেই তুমি আমার বীর পুত্র।

সজ্জনোচিত কর্ম্ম না করিয়া এবং হীনজনোচিত কর্ম্ম করিয়া পুরুষাধমগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। সঞ্জয়! তুমি মনে রাখিও ক্ষত্রিয় যুদ্ধের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রজা পালনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, শত্রুজয় করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অথবা সমরাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরগণ, ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। কি স্বর্গে কি ইন্দ্রলোকে কোথাও তাদৃশ সুখ নাই, শত্রুকে বশীভূত করিয়া ক্ষত্রিয় যে সুখলাভ করিয়া থাকে। মনস্বী পুরুষ শত্রুদ্বারা উৎপীড়িত হইলে তাহার হৃদয়ে যে ঘোরজ্বালা উৎপন্ন হয়, তাহার শান্তি হয় শত্রুর বিনিপাতে—না হয় রণাঙ্গন আলিঙ্গনে। অন্য কোন প্রকারে মনস্বী পুরুষের হৃদয় শান্ত হইতে পারে না।

এতদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—মা! তুমি এ তাদৃশ নিদারুণ কথা পুত্রকে বলিও না। তুমি দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে আমাকে দেখ। এতদুত্তরে মহারাণী বলিয়াছিলেন, আমি তোমার অশেষকল্যাণের জন্যই, নিরতিশয় আনন্দলাভের জন্যই, এইরূপ বলিয়াছিলাম। তুমি দেহের প্রতি কারুণ্যের কথা বলিতেছ, দেহের প্রতি করুণা

শোকেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তুমি যখন সমস্ত সিন্ধুরাষ্ট্রবাসিগণকে জয় করিবে তখন তোমার সেই বিজয়ে আমিই তোমাকে সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দিত করিব। এই দুঃসময়ের অবসানে তোমার অবশ্যই বিজয় হইবে ইহা আমি নিজেই দেখিতে পাইতেছি।

এতদুত্তরে সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে, সহায়ক মিত্র মণ্ডল নাই, ইহাতে আমার জয়ের আশা করিব কিরূপে? আমার এই দারুণ অবস্থা অবগত হইয়াই আমি রাজ্য উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি যেমন পাপী স্বর্গলাভের আশা পরিত্যাগ করে। এই অবস্থাতেও যদি আমার জয়লাভের কোন উপায় থাকে—জয়লাভের কোন উপায় যদি তুমি দেখিতে পাইয়া থাক তবে তুমি তাহা বল। তোমার অনুশাসন অনুসারে আমি কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

এতদুত্তরে মহারাণী বিদুলা বলিয়াছিলেন, অতীত অসমৃদ্ধিদ্বারা কাহারও স্বীয় আত্মাকে অবমানিত করা উচিত নহে। সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোন কার্য্যই আরম্ভ করা উচিত নহে। ইহা মূর্খাচরিত পন্থা, যাহা করিতে হইবে তাহা আদরের সহিত করিতে হইবে। ইহাই সজ্জনরীতি। যাহারা উদ্যমশীল হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না তাহাদের যে ফললাভ হইবে না ইহা নিশ্চিত। যাহারা উৎসাহশীল হইয়া কর্ম্ম করে তাহাদের ফল লাভ হইতেও পারে নাও হইতে পারে। উদ্যমবিহীন পুরুষ যে ফল লাভ করিবে না ইহা ত নিশ্চিত, তাহার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি কখনই হইতে পারেনা। যে উৎসাহশীল তাহারই বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। বিজিগীষু সর্ব্বদা উত্থানশীল হইবে, স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে জাগরণশীল হইবে এবং সমৃদ্ধিজনক কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্বদা ব্যথারহিত চিত্তে "অবশ্যই অভ্যুদয় হইবে" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় রাখিবে। যে উত্থানশীল, জাগরূক, মাঙ্গলিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ নরপতি, তাহার সমৃদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তী। তোমার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্যই এই সমস্ত কথা বলিলাম।

তোমার অনুষ্ঠেয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর—তোমার রাজ্যে যাহারা তোমার শাসনে ক্রুদ্ধ, যাহারা লুব্ধ, যাহারা পরিক্ষীণ, যাহারা গর্ব্বিত, যাহারা অপমানিত এবং যাহারা তোমার প্রতি স্পর্দ্ধাশীল তাহাদের অবধারণ পূর্ব্বক দানমানাদি দ্বারা প্রশমিত কর। তোমার শত্রুরাজ্যে এই ষড়্বিধ পুরুষের অবধারণ পূর্ব্বক শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত কর এবং দান মানাদি দ্বারা তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন কর তাহাতে শত্রুগণের মধ্যে মহান্ ভেদ উৎপন্ন হইবে। বায়ু যেমন অনায়াসে মেঘমালাকে বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয়—এইরূপ তুমিও অনায়াসে শত্রুমণ্ডল ভেদনে সমর্থ হইবে। যাহারা তোমার পক্ষাশ্রিত তাহাদিগকে অগ্রিম ভক্ত (ভাতা) ও বেতনাদি প্রদান করিয়া এবং তাহাদিগকে প্রিয়বাক্যে—সন্তুষ্ট করিয়া শত্রু বিজয়ের জন্য উত্থিত হও। তোমার পক্ষাশ্রিত জনগণ যাহাতে তোমার প্রতি বিরক্ত না থাকে এবং যাহাতে তোমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয় সর্ব্বপ্রথমে তাহার ব্যবস্থা কর। ইহারাই তোমার প্রিয় সম্পাদন করিয়া বিজয় আনয়ন করিবে। তোমার পক্ষাশ্রিত জনগণের সহিত তুমি সুদৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ হইয়া, হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু ইহার একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইলে শত্রু যখন বুঝিতে পারিবে ইহারা মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইয়াছে তখনই শত্রু হতোৎসাহ হইয়া পড়িবে।

প্রবল শত্রুকে কখনও সহসা যুদ্ধে আহ্বান করিবে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম দূতগণকে নিযুক্ত করিয়া শত্রুরাজাকে হতোৎসাহ করিবে। হতোৎসাহ শত্রু—বশীভূত শত্রু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। প্রবলশত্রুও হতোৎসাহ হইলে বিজিগীষু রাজার নানাবিধ সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এই সময়ে বিজিগীষু রাজা তাহারা কোষ বল নিরুদ্বেগে বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। কোষ বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মিত্রলাভ অনায়াস সাধ্য হইবে। ধনবানেরই বহু মিত্র হইয়া থাকে এবং ধনবানকেই লোকে আশ্রয় করে। সমৃদ্ধির সময়ে যাহারা মিত্র হয় অসমৃদ্ধির সময়ে তাহারাই শত্রু হইয়া থাকে।

শত্রুও ধনসমৃদ্ধ নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। শত্রুকে নিরুৎসাহ রাখিয়া বিজিগীষু রাজা সর্ব্বতোভাবে স্বীয় প্রতাপ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। কোষসম্পন্ন এবং বলসম্পন্ন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতির নিকটে শত্রু স্বভাবতঃই আনত হইয়া থাকে। শত্রুই যদি সহায়ক হয় তবে বিজিগীষু রাজার সমৃদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। রাজা কোন অবস্থাতেই ভীত হইবেন না। যে কোন আপদ উপস্থিত হউক না কেন, রাজা নির্ভীক চিত্তে তাহার প্রশমন করিবেন। রাজা হৃদয়ে বস্তুতঃ ভীত হইলেও কোন কার্য্যেই ভীতবৎ ব্যবহার করিবেন না। রাজাই যদি ভীত হইয়া পড়ে তবে তাহার সমস্ত প্রকৃতিবর্গ ভীত হইয়া পড়িবে। ভীতরাজার রাষ্ট্র, বল এবং অমাত্যবর্গ আর ঐক্যমত্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহারা পৃথক্ বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কেহ বা শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করে, কেহ বা রাজাকে পরিত্যাগ করে। যাহারা পূর্ব্বে রাজকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিল তাহারাই ভীত রাজার কোষাদি হরণ করে। নরপতি ভীত হইলেও পূর্ব্বে উপকৃত সুহৃদ্বর্গ যাহারা এই অবস্থায়ও নরপতিকে ত্যাগ করে না তাহারাই প্রকৃত মিত্র। যে রাজার সহায়তায় মিত্রবর্গ কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা রাজার শোকে শোকযুক্ত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত পূর্ব্বপূজিত রাষ্ট্রবাসী ও সুহৃদ্বর্গ এইরূপ মনে করে যে—আমাদের এই রাজ্য, আমাদের নেতা বিপদ্‌মগ্ন হইলে তাহাকে আমরাই উদ্ধার করিব এইরূপ দৃঢ় অভিমান যুক্ত পুরুষই প্রকৃত মিত্র এবং এতাদৃশ বহু মিত্রই তোমার রাষ্ট্রে আছে। তুমি কোন অবস্থায় ভীত হইও না। তুমি ভীত হইলে তোমার অমাত্যাদি ভীত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি জানিবার জন্যই—তোমার তেজের বৃদ্ধির জন্যই আমি তোমাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম। যদি তুমি মনোযোগের সহিত আমার বাক্য শুনিয়া থাক, তবে উৎসাহের সহিত জয়ের জন্য উত্থান কর। সঞ্চিত বিশাল রাজকোষ তোমার আছে। যাহা তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। এই কোষের সন্ধান আর কেহই রাখে না। সেই সঞ্চিত মহাকোষ আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী অনেক সুহৃৎ তোমার আছে। যাহারা সংগ্রাম ভূমিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না এইরূপ বহু সহায়ক তোমার আছে, এইরূপ সহায়যুক্ত রাজা অনায়াসেই জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

রাণী বিদুলার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত সঞ্জয়ের হৃদয় হইতে ভয় অপগত হইয়াছিল, এবং উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। তখন সঞ্জয় বলিয়াছিলেন—আমি অগাধ শত্রুজলে মগ্ন হইয়াও, হতোদ্যম হইয়াও, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াও, তোমার এই অসাধারণ অনুশাসনের ফলে আমি আশ্রয় লাভ করিলাম, পৈতৃক রাজ্য যেন ফিরিয়া পাইলাম। আমি যে তোমার কথার কিছু কিছু প্রতিবাদ করিয়াছি তাহা তোমার আরও অধিক অনুশাসন শ্রবণ করিবার জন্যই করিয়াছি। আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও অধিক শ্রবণের ইচ্ছাতেই তোমার প্রতিবাদ করিয়াছি। তোমার কথায় আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। এই আমি শত্রু দলনের জন্য ও বিজয়লাভের জন্য উত্থিত হইতেছি। কশাহত সদশ্বের মত সঞ্জয় বিদুলার বাক্যে উৎসাহযুক্ত হইয়া বিদুলার সমস্ত অনুশাসন যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিদুলার এই অনুশাসন, নৃপতিগণের তেজোবর্দ্ধক ও হর্ষবর্দ্ধক। শত্রুদ্বারা পীড়িত রাজাকে মন্ত্রী এই উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন। এই ইতিহাস "জয়াখ্য ইতিহাস" নামে প্রসিদ্ধ। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে রাজার পৃথিবীজয় ও শত্রু বিনাশ হইয়া থাকে। গর্ভিণী স্ত্রী পুনঃ পুনঃ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে বীরপুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় রমণীগণ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে তেজ বীর্য্য ও বীক্রম সম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী শত্রুজেতা অসাধুগণের নিয়ন্তা ও সাধুগণের রক্ষক পুত্র প্রসব করিয়া থাকেন।

গান্ধারীর অনুশাসন

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ১২৯ অধ্যায়ে মহারাণী গান্ধারী অনুশাসন উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হস্তিনা নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের

সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনানগরীতে এক মহতীসভার অধিবেশন হইয়াছিল, বৃহত্তরভারতের অগণিত নরপতিবৃন্দ এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। আগত মহাসমর হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য, এইরূপ মহতী সন্ধি সভার অধিবেশন ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। এই সভাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন মহারাজ দুর্য্যোধন তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী নরপতিগণের সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে সভাস্থিত সমস্ত সভ্যগণ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীত হইয়া মহারাণী গান্ধারীকে সভায় আনয়ন করিবার জন্য মহামতি বিদুরকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র মনে করিয়াছিলেন যে মহারাণী গান্ধারীর সৎপরামর্শ শ্রবণ করিলে হয়ত দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণ করিতে পারে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুর, দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন। গান্ধারী সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর নিকটে সভায় দুর্য্যোধনের ঔদ্ধত্য প্রকাশপূর্ব্বক সন্ধির সর্ত্ত প্রত্যাখ্যানের কথা বলিয়াছিলেন ও দুর্য্যোধন যাহাতে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয় দুর্য্যোধনকে তদনুরূপ অনুশাসন করিবার জন্য গান্ধারীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গান্ধারীও উভয়পক্ষের সন্ধি স্থাপিত হইলে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া দুর্য্যোধনের মতানুবর্ত্তী রাজগণের সহিত দুর্য্যোধনকে সভায় আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন যে—হে মহারাজ! এই ঘোর দুর্নীতির মূল কারণ আপনি, পূর্ব্ব হইতে দুর্য্যোধনের পাপ অভিপ্রায় অবগত হইয়াও আপনি দুর্য্যোধনের প্রজ্ঞারই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কাম ও ক্রোধের বশীভূত মোহসমাচ্ছন্ন দুর্য্যোধন আপনারই অভিপ্রায় অনুসারে লব্ধরাজ্য হইয়াছে, আজ তাহাকে বলপূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা সুকঠিন। মূঢ়, মূর্খ, দুরাত্মা, দুষ্টজনসহায়, লোভী দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদান করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজ তাহার ফলভোগ করিতেছেন। দ্যূত সভায় যখন পাণ্ডবগণের সহিত দুর্য্যোধনের ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল তখন কোনক্রমেই এই ভেদকে উপেক্ষা করা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গত হয় নাই। স্বজনের মধ্যে ভেদ উপেক্ষা করা মহীপতির কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। স্বজনের সহিত ভেদ উপস্থিত হইলে শত্রুগণ তাহাতে আনন্দিত হইয়া থাকে। প্রথমেই যাহার প্রতিবিধান করিলে অনায়াসেই উভয় পক্ষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত, আজ তাহা বহু প্রয়াসেও সম্পাদিত হওয়া সুকঠিন। সাম অথবা ভেদ প্রয়োগদ্বারা প্রথমেই দুর্য্যোধনকে নিবৃত্তকরা অনায়াসসাধ্য ছিল—কিন্তু আজ দণ্ড প্রয়োগ করিয়াও দুর্য্যোধনকে নিবৃত্তকরা সুকঠিন হইবে।

কোন নীতিজ্ঞ নরপতিই উপযুক্তকালে সামসাধ্য অথবা ভেদসাধ্য বিষয়কে প্রথমতঃ উপেক্ষা করিয়া পরে দণ্ডদ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন না।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর আদেশানুসারে বিদুর, সানুযাত্রদুর্য্যোধনকে সভায় আনয়ন করিয়া ছিলেন। দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও কেবলমাত্র মাতার অনুশাসনের প্রতি গৌরব প্রযুক্তই সেই সন্ধি সভায় পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। পুত্র দুর্য্যোধনকে রাজসভায় প্রবিষ্ট জানিয়া মহারাণী গান্ধারী, কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের শান্তি বিধানের জন্য দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিয়াছিলেনঃ—হে দুর্য্যোধন! তোমার মতানুসারী মহীপতিগণের সহিত তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য তোমাকে কয়েকটি কথা বলিব—শ্রীকৃষ্ণ যে সন্ধির সর্ত্ত উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা যদি তুমি স্বীকার করিয়া লও তাহা হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও আমি অতিশয় সম্মানিত হইব। শোন, দুর্য্যোধন! যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা কোন রাজা কখনই অপ্রাপ্তরাজ্যাদির লাভ ও লব্ধরাজ্যাদির রক্ষা করিতে পারে না এবং লব্ধরাজ্যের ভোগও করিতে পারে না। অজিতেন্দ্রিয় নরপতি দীর্ঘদিন রাজ্যভোগ করিতে পারে না। যে নরপতি সংযত ইন্দ্রিয় ও মেধাবী, তিনিই দীর্ঘদিন রাজ্য পরিপালনে সমর্থ

হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ নরপতিগণ কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইলে তাঁহার রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাম ও ক্রোধ রাজার মহাশত্রু, এই দুই শত্রুকে প্রথমতঃ পরাজিত করিয়া রাজা পৃথিবী বিজয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন। লোকের প্রতি প্রভুত্ব বড় গুরুতর ভার, দুরাত্মনরপতিগণ এই প্রভুত্বের ভারবহনে সর্ব্বথা অসমর্থ। রাজ্য সর্ব্বজনের অভীপ্সিত—এই সর্ব্বজনাভীপ্সিত রাজ্য কখনও কামকার দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রভুত্ব বা আধিপত্য লাভে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে কামে ও অর্থে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা আবশ্যক।

সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অসংযতেন্দ্রিয় নির্বুদ্ধি কখনও প্রভুত্বরূপ মহত্ত্বলাভে সমর্থ হয় না। অসংযত অশ্ব রথে নিযুক্ত হইলে সেই অশ্ব সকল যেমন সারথিকেই বিনাশ করে এইরূপ অসংযতেন্দ্রিয় রাজার তাদৃশ ইন্দ্রিয়বর্গও রাজার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। যে রাজা নিজেকে জয় না করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলকে জয় করিতে ইচ্ছাকরে এবং মন্ত্রীমণ্ডলকে জয় না করিয়া শত্রুরাজগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করে সেই রাজা অগতিক হইয়া নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিজিগীষু রাজার সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য এই যে তিনি প্রথমতঃ নিজেকেই নিজের শত্রুরূপে গ্রহণ করিবেন। যিনি নিজেকেই জয় করিতে পারেন নাই তিনি অন্যশত্রুকেও কখন জয় করিতে পারিবেন না। ইন্দ্রিয়বর্গের জয় দ্বারাই আত্মজয় হইয়া থাকে, এজন্য বিজিগীষু রাজা আত্মজয় করিয়া পরে অমাত্যগণকে জয় করিবেন এবং অমাত্যগণকে জয় করিয়া পরে শত্রুরাজাকে জয় করিবেন। আত্মজয় ও অমাত্যজয় না করিয়া শত্রুগণকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিজিগীষু রাজা নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। যে রাজা ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যিনি ধীর প্রকৃতি, পরীক্ষ্যকারী এবং অপরাধিগণের প্রতি দণ্ডবিধানে সমর্থ তিনিই রাজলক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন। কাম ও ক্রোধের মত প্রজ্ঞা বিনাশকারী শত্রু আর কেহই নাই। যে রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্পকে সম্যকভাবে বিজয় করিতে জানেন তিনিই মাত্র মহীপতি হইতে পারেন। যে রাজা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় নিগ্রহে যুক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও শত্রুর পরাজয় সতত ইচ্ছা করেন তিনিই মহীপতি হইয়া থাকেন—তিনিই নরগণের পালক হইয়া থাকেন। যে রাজা কামাভিভূত অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, স্বমণ্ডলে বা পরমণ্ডলে কেহই তাঁহার সহায়ক হয় না।

দুর্য্যোধন! তুমি যদি মহাপ্রাজ্ঞ শূর শত্রুনিহন্তা পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত থাক তবে তুমি সুখী হইয়া পৃথিবী ভোগে সমর্থ হইবে। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সর্ব্বদা অজেয়, একথা ভীষ্ম ও দ্রোণ বারম্বার বলিয়াছেন। যে রাজা অত্যন্ত কল্যাণকামী সুহৃদ্‌বর্গের এবং প্রাজ্ঞ কৃতবিদ্যজনের শাসনে অবস্থিত থাকেন না, তিনি সত্বরই শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত যে যুদ্ধের কথা ভাবিতেছ এই যুদ্ধ সংঘটিত হইলে কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না এই যুদ্ধ সংঘটিত হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ ও সুখ কিছুই লাভ হইবে না, আরও বিশেষ কথা যুদ্ধে জয় অনিশ্চিত এজন্য তুমি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কখনও অগ্রসর হইও না—হে দুর্য্যোধন! ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ বাহ্লিক, ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া যে তাহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের সহিত পাণ্ডবগণের ভেদের ভয়েই করিয়াছিলেন, একত্র অবস্থান করিলে পাণ্ডবগণের সহিত তোমাদের ভেদ উপস্থিত হইত, পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানের ফলেই আজ তুমি পৃথিবীপতি হইয়া আছ, পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান না করিলে পূর্ব্বেই তোমার সহিত তাহাদের বিগ্রহ ঘটিত, আর তাহা হইলে আজ তুমি পৃথিবীপতি হইয়া থাকিতে পারিতে না। পাণ্ডবগণের অবশ্য প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ তুমি অবিলম্বে প্রদান কর—যে অর্দ্ধরাজ্য তোমার থাকিবে তাহাতেই অমাত্য বর্গের সহিত তোমার পর্য্যাপ্ত হইবে। ভীষ্মাদি সুহৃদ্‌বর্গের অনুশাসন অনুসারে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলে তুমি যশস্বী হইতে পারিবে। আর যদি সন্ধি না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তবে তুমি সমস্ত সুখ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, যে হেতু পাণ্ডবগণ আত্মবান্, বুদ্ধিমান্ ও জিতেন্দ্রিয়। তুমি ক্রোধ শান্ত কর এবং সুহৃদ্‌গণের অনুশাসন অনুসারে পাণ্ডবগণকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান কর। বিগত ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণ অতিদুঃখে সময় যাপন করিয়াছে, তুমি আর

অধিক কাম ও ক্রোধের মাত্রা বাড়াইও না, তুমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহায়তায় কখনও পাণ্ডবগণের রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। মনে রাখিও যদি এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে সেই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মিলিত হইবেন আর তাহাতে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

হে দুর্য্যোধন! কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া কুরুবংশ নির্ম্মূল করিও না—হে পুত্র! তুমি কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া পৃথিবীর সংহার করিও না। তোমার জন্য যেন পৃথিবী বিনাশপ্রাপ্ত না হয় এইদিকে দৃষ্টিপাত কর।

রে মূঢ়! তুমি মনে করিতেছ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি তোমার জন্য সর্ব্বশক্তিতে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন কিন্তু ইহা তোমার মহতী ভ্রান্তি, কারণ তোমাদের সহিত ভীষ্মাদির যে সম্বন্ধ পাণ্ডবগণের সহিতও সেই সম্বন্ধ। এই রাজ্য যেমন তোমার তেমনই পাণ্ডবগণের। এই সমস্ত বিষয়ে পাণ্ডবগণের সহিত তোমাদের সমতা থাকিলেও পাণ্ডবেরা ধার্ম্মিক আর তোমরা ঘোর অধার্ম্মিক। তোমাদের অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্তও হন তাহাতে তোমার কোন লাভই হইবে না, কারণ যুদ্ধে ভীষ্মাদি জীবনও ত্যাগ করিবেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কোনই অনিষ্ট করিতে উদ্যোগী হইবেন না—কেবলমাত্র লোভের বশীভূত হইলেই অর্থসম্পদের বৃদ্ধি হইতে পারে না। তুমি উৎকট লোভের বশীভূত হইয়া জগতের বিনাশ করাইও না। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া করিয়া শান্ত হও। অনন্তর মহারাণী গান্ধারী সেই মহতী সভাতে বলিয়াছিলেন,—এই সভাতে যে সমস্ত মহীপতিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করুন, এই দুর্য্যোধন তাহার অনুযায়ী মহীপতিগণের সহিত এবং তাহাদের অমাত্যগণের সহিত মিলিতভাবে অতিগুরু পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। আমাদের এই কুরুবংশে ইহাই কুলধর্ম্ম যে, যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, এই নৃশংসকর্ম্মা দুর্য্যোধন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া এই কুলধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীর্ঘদর্শী বিদুর জীবিত আছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই উভয়কে লঙ্ঘন করিয়া দুর্য্যোধন কিছুতেই রাজা হইতে পারে না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর এই উভয়েরও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে কোন রাজ্যাধিকার নাই। মহাত্মা ভীষ্ম রাজ্য কামনা করেন নাই বলিয়াই ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইয়াছেন বস্তুত ধৃতরাষ্ট্র রাজা নহেন। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহারাজ পাণ্ডু। এইজন্য পাণ্ডুর পুত্রগণই এই রাজ্যের অধিকারী পিতার রাজ্যে পুত্রের এবং পিতামহের রাজ্যে পৌত্রের অধিকার হইয়া থাকে। সুতরাং সমগ্র রাজ্যই পাণ্ডবগণের, এই রাজ্যে দুর্য্যোধনের কোনও অধিকার নাই। সুতরাং এই বিশাল কুরুরাজ্য যুধিষ্ঠিরই শাসন করুন। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরের উপদেষ্টারূপে অবস্থান করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসন

আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভারত সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যে গণ্য না হইলেও তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ—রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র যেসমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে অনেকেই অনেক দায়িত্বপূর্ণপদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিণত বয়সে সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন। দীর্ঘদিন যিনি যে বিভাগের পরিচালনা করেন তাঁহার সেই বিভাগ সম্বন্ধে জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া

স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এমন একটি লোককেও দেখিতে পাই না, যিনি দীর্ঘদিন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কোন বিশেষ পরিচালনা করিয়া সেই পরিচালনালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি শিক্ষা বিভাগের পরিচালক তিনি দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটী সংশোধনের উপায়, শিক্ষাপ্রদানের রীতির দোষ ও তাহা নিবারণের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু করিয়াছেন বলিয়া এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এইরূপ বিচার বিভাগে, দেশরক্ষা বিভাগে, যিনি যে কোন দায়িত্বপূর্ণ বিভাগেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, গতানুগতিকভাবে দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালন ভিন্ন প্রচলিতব্যবস্থার দোষগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে যত্নবান হইতে দেখা যায় না।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সুরাজাই হউন আর কুরাজাই হউন তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তিনি জীবনের শেষভাগে সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন। স্বাধীনভারতের জনগণ হইতে পরাধীন ভারতের জনগণের ইহাই মহৎ বৈলক্ষণ্য যে, স্বাধীন ভারতে যিনি যাহা করিতেন তিনি তাহা অতি, শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত সম্পাদন করিতেন—পরাধীন ভারতে যিনি যাহা করেন, তাহা তিনি কোন শ্রদ্ধা বা আদরের সহিত করেন না কোনরূপে দিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহার প্রাপ্য সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত থাকেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এইজন্যই তিনি তাঁহার পরম আদরের সিদ্ধান্ত জীবনের শেষসময়ে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন, হে কুরুনন্দন! তুমি এই অষ্টাঙ্গ রাজ্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে—কখনও অপ্রণিহিত হইও না। এস্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—সমস্ত নীতিশাস্ত্রকারগণই—১। স্বামী, ২। অমাত্য, ৩। রাষ্ট্র, ৪। দুর্গ, ৫। কোষ, ৬। বল, ৭। সুহৃদ এই সাতটিকে লইয়া সপ্তাঙ্গ রাজ্য বলিয়াছেন—কিন্তু এস্থলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অষ্টাঙ্গ রাজ্য বলিয়াছেন, রাজ্যের অষ্টম অঙ্গটি কি তাহা এস্থলে বলা হয় নাই।

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—হে যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা বিদ্যাবৃদ্ধ জনগণের উপাসনা করিবে ও তাঁহাদের মত শ্রবণ করিবে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বিদ্যাবৃদ্ধ জনগণের পূজা করিবে এবং সন্দিগ্ধ বিষয়ে ইহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে। বিদ্যাবৃদ্ধ জনগণ তোমার দ্বারা সৎকৃত হইলে—সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা তোমাকে হিতোপদেশ করিবেন। ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রের প্রারম্ভেই বৃদ্ধসংযোগ বলিয়াছেন। রক্ষিত ধন যেমন জনগণের কল্যাণের জন্য হইয়া থাকে—এইরূপ সংযমদ্বারা ইন্দ্রিয় রক্ষিত হইলে অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে। অশ্ববিনেতা যেমন দুষ্ট অশ্বগণকে শিক্ষিত করিয়া সাধুবাহী করিয়া থাকে এইরূপ রাজাও দুষ্টঅশ্বের মত দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গকে সর্বদা সংযত করিবেন। ইহাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়জয় নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে—কৌটিল্যও বৃদ্ধসংযোগের পরে ইন্দ্রিয়জয় প্রকরণ বলিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির! তুমি পিতৃপিতামহক্রমে আগত শুচি, এবং দান্ত উপধাতীত অমাত্যগণকে তাহাদের যোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। কৌটিল্যও ইন্দ্রিয় জয়ের পরেই অমাত্যোৎপত্তি বলিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়ছেন—অমাত্যগণ উপধাশুদ্ধ হওয়া চাই। নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা বলা হইয়াছে। এক একটি উপধাশুদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার যোগ্যস্থানে নিযুক্ত করিবে—যেমন ধর্ম্মোপধা শুদ্ধ পুরুষকে ধর্ম্মস্থানানুবন্ধি কর্ম্মে অথবা রাজ্যের কণ্টকশোধন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। অর্থোপধা শুদ্ধ পুরুষকে ধনসংগ্রহে ও ধন রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। কামোপধা শুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্তঃপুর রক্ষণাদির কার্য্যে নিযুক্ত করিবে এবং ভয়োপধা শুদ্ধ ব্যক্তিকে রাজা স্বীয় শরীর রক্ষণাদির কার্য্যে নিযুক্ত করিবে এবং সর্ব্বোপধাশুদ্ধ পঞ্চম ব্যক্তিকে অর্থাৎ যিনি এই চারিটি উপধাতেই শুদ্ধ হইয়াছেন এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবে। আর যাহারা কোন উপধাতেই শুদ্ধ নহে—প্রত্যেকটি উপধাতেই অশুদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদিগকে আকর, অরণ্য, হস্তিবনাদিতে নিযুক্ত করিবে। উপধা শব্দের অর্থ ছল। ধর্ম্মাদি বিষয়ে ছল

উদ্ভাবন করিয়া অমাত্যগণের পরীক্ষার রীতি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ১ম অধ্যায়ের ষষ্ঠ প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। মনু ৭ম অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে অমাত্য পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে—এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রকরণটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শান্তিপর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে পঞ্চোপধাতীত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করার কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকাতে নীলকণ্ঠ বাচিকী, কায়িকী এবং মানসিকী এই ত্রিবিধ ছলের প্রত্যেক ও ইতর সংযোগে পঞ্চ সংখ্যা পূরণ করিয়া পঞ্চবিধ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ এই টীকা নিতান্ত প্রমাদপূর্ণ। অর্থশাস্ত্র না জানার জন্যই তিনি ইহা বলিয়াছেন। অমাত্যগণের এইরূপ বিশুদ্ধির ব্যবস্থা অনেকদিন হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। অমাত্যগণ এইরূপে জীবনের মধ্যে কোন একদিন বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইলেই—যাবজ্জীবন কোন পদ স্থায়িভাবে ভোগ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যকালে বহুবার এই বিশুদ্ধি প্রমাণিত করিতে হইত। কোনরূপে একটি গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলেই—যাবজ্জীবন নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করিবার ব্যবস্থা ছিল না—এইজন্য দুর্নীতিসম্পন্ন অমাত্যগণ রাজকার্য্যে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না। অমাত্যগণের শোধনের ব্যবস্থা, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক অতঃপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির! তুমি স্বরাষ্ট্রবাসী পরীক্ষিত বহুবিধ চারবর্গকে স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে সর্ব্বদা সঞ্চারিত করিবে—এই চারবর্গ যেন পরস্পরের সহিত পরিচিত না থাকে। পরস্পর অপরিচিতভাবে বিভিন্ন প্রকারের চারবর্গ, সর্ব্বদা স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিবে ও তাহাদের দ্বারা সংগৃহীত স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় সংবাদ তুমি সর্ব্বদা অবগত হইবে।

মনু ৭ম অধ্যায় ৫৪ শ্লোকে পঞ্চবর্গ পরিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ভাষ্যে মেধাতিথি ১। কাপটিক, ২। উদাস্থিত, ৩। গৃহপতিব্যঞ্জন, ৪। বৈদেহকব্যঞ্জন, ৫। তাপস ব্যঞ্জন—এই পাঁচ প্রকার চারের কথা বলিয়াছেন—আর এই পাঁচ প্রকার চারকেই মনুসংহিতাতে পঞ্চবর্গ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মেধাতিথি এই পঞ্চবর্গের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে এই গূঢ় পুরুষোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। এই গূঢ় পুরুষকেই এস্থলে চার বলা হইয়াছে।

মেধাতিথি সম্পূর্ণভাবে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের প্রত্যক্ষর উদ্ধৃত করিলেও মেধাতিথি কৌটিল্যের নাম করেন নাই। বলা বাহুল্য টীকাকার কুল্লূক ভট্ট, মেধাতিথি হইতেই এই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেজন্য তিনিও কৌটিল্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এই পঞ্চবিধ সংস্থা বলা হইয়াছে। কৌটিল্য ইহার পরবর্ত্তী অষ্টম প্রকরণে ১। সত্রী, ২। তীক্ষ্ণ, ৩। রসদ, ৪। ভিক্ষুসী এই চতুর্ব্বিধ চারের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুইটি প্রকরণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে—প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি-অনুসারে পূর্ব্বতন মহীপতিগণ শত্রুরাজ্যে, মিত্ররাজ্যে, মধ্যম রাজার রাজ্যে এবং উদাসীন রাজার রাজ্যে এবং স্বকীয় রাজ্যে চার প্রচারণ করিয়া কিরূপে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়। এই সত্রী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ গূঢ় পুরুষ, রাজার স্বমণ্ডলে পরমণ্ডলে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া যে সমস্ত সংবাদ আনয়ন করিত, তাহা রাজার নির্ভরযোগ্য হইত কিরূপে—এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য কৌটিল্য বলিয়াছেন যে সত্রী প্রভৃতি গূঢ়পুরুষগণ যাহারা মণ্ডল মধ্যে বিচরণ করিবে তাহারা যাহাতে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে না পারে—রাজা তাহার সুব্যবস্থা রাখিবেন। পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত—পরস্পরের বার্ত্তানাভিজ্ঞ গূঢ় পুরুষগণ, একজাতীয় সংবাদ ক্রমশঃ তিনজনে আনয়ন করিলে সেই সংবাদ নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এবং এই গূঢ় পুরুষগণ একই বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ সংবাদ উপস্থাপিত করিলে তাহাদের গুপ্ত দণ্ডের ব্যবস্থা

করা হইত অথবা তাহাদের কার্য্য হইতে বিচ্যুত করা হইত। যাহা হউক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন যাহারা পিতৃপিতামহক্রমে অমাত্যের কাজ করিয়া থাকেন এইরূপ ব্যক্তিগণকে অমাত্যপদে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অমাত্যগণ উপধাশুদ্ধ হইবেন এবং কর্ম্মে দক্ষ ও দান্ত হইবেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—হে যুধিষ্ঠির! এই চারবর্গ বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক এবং এই চারবর্গ যেন স্বরাষ্ট্রবাসী হয়। তোমার নগরী সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখিবে এবং সুদৃঢ় প্রাকার—পরিখা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখিবে। তোমার নগরীতে প্রবেশের জন্য সুরক্ষিত নগরতোরণ রক্ষা করিবে। তোমার নগরী দুর্গস্বরূপ হইবে এবং এই দুর্গের উপরিভাগে রক্ষিসৈন্যগণের সর্ব্বদা বিচরণ স্থান থাকিবে এবং তোমার নগরী ক্রমশঃ ৭টি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। সর্ব্বশেষ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে তোমার অন্তঃপুর অবস্থিত থাকিবে। তোমার নগরীর চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ ও সুরক্ষিত ৪টি দ্বার থাকিবে এবং এই দ্বার সমুহ নানা যন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত থাকিবে এবং যাহারা তোমার বিশেষভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রশস্ত বংশসম্ভূত এবং প্রশস্তচরিত্র এতাদৃশ পুরুষগণ সর্ব্বদা তোমার দেহরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং ইহারা তোমার ভোজন, শয়ন এবং বিহারাদিকালে তোমাকে রক্ষা করিবে। চরিত্রবান্ সদ্‌বংশসম্ভূত, বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও অতিশয় আপ্তজন দ্বারা তোমার অন্তঃপুর যেন সুরক্ষিত থাকে। নানা বিদ্যাবিশারদ, বিনীত, ধর্ম্মার্থ কুশল ব্রাহ্মণগণকে তোমার ধীসচিবপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে—এতাদৃশ মন্ত্রিগণের সহিত সর্ব্বদা মন্ত্রণা করিবে কিন্তু একসঙ্গে বহু মন্ত্রীর সহিত কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিবে না। কোন বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে এক একজন মন্ত্রীর সহিত পৃথক্‌ভাবে মন্ত্রণা করিয়া তাহাতে মন্ত্র-নিশ্চয় না হইলে সমস্ত মন্ত্রিপরিষদের সহিতও কখনও মন্ত্রণা করিবে।

তোমার মন্ত্রণাগৃহ যেন অত্যন্ত সুরক্ষিত হয়—মন্ত্রণা স্থান যেন সর্ব্বদা অন্যমনুষ্য বিবর্জিত হয়। রাত্রিকালে কখনও মন্ত্রণা করিবে না। মন্ত্রণা গৃহে বানর প্রভৃতি প্রাণী ও মনুষ্যানুসারী শুকশারিকাদি পক্ষী এবং জড় পঙ্গু প্রভৃতি মনুষ্য যেন না থাকে। সর্ব্বদা এ বিষয়ে প্রণিহিত থাকিবে যে কোন রূপেই যেন মন্ত্রণা বাহিরে প্রকাশিত না হয়। অন্যে যদি এই মন্ত্রণা জানিতে পারে তবে তাহাতে রাজগণের মহাতী হানি হইয়া থাকে। মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহাতে এত বড় দোষ ঘটে যে তাহার আর সমাধান করা যায় না। এজন্য তুমি মন্ত্রিমণ্ডলেও মন্ত্রভেদের দোষগুলি বিশেষ ভাবে বলিয়া দিবে। মন্ত্রগুপ্তি থাকিলে যে গুণ লাভ হয় তাহাও পুনঃ পুনঃ বলিবে। তুমি সর্ব্বদা তোমার নগরবাসী ও রাজ্যবাসী জনগণের অভিপ্রায় বিশেষ ভাবে বিদিত হইবে। তাহারা তোমার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত ইহা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইবে। তোমার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের অভিপ্রায় যেন তোমার অজ্ঞাত না থাকে সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে। তোমার রাজ্যের বিচার বিভাগে যেন আপ্ত পুরুষগণ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং অত্যন্ত গুপ্ত চরগণ যেন বিচার বিভাগের তথ্যসংগ্রহ করে যাহাতে বিচারকগণ স্বার্থান্বেষী হইয়া বিচার বিভ্রাট ঘটাইতে না পারে। অপরাধের পরিমাণ বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে। বিচার কার্য্যে নিযুক্ত বিচারকগণ যেন বিচার শাস্ত্র অনুসারেই বিচারের ব্যবস্থা করেন। যাহারা বিচারপ্রার্থিগণের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থাদি উপার্জনে অভিলাষী এবং তোমার রাজ্যে রাজকর্ত্তৃবৃন্দ যাহারা পরের ধন গ্রহণে অভিলাষী, পরস্ত্রীসংগ্রহে অভিলাষী, কঠোর দণ্ড প্রদানে যাহারা অভ্যস্ত, মিথ্যাবিচার যাহারা করে—যাহারা লুব্ধ প্রকৃতি, যাহারা অন্যের প্রতি মিথ্যাঅপবাদ প্রচার করে, যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের ধন গ্রহণ করে, সভাবিহারাদি গৃহকে নাশ করে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে দুষিত করে, এইরূপ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও বিচারক বর্গকে তাহাদের অপরাধের অনুসারে সুবর্ণদণ্ড বা বধদণ্ডের ব্যবস্থা করিবে। যাহারা তোমার রাজ্যে ব্যয়কার্য্যে নিযুক্ত, তুমি দিবসের প্রথম ভাগেই তাহাদের কর্ম্ম দর্শন করিবে। ব্যয়কর্ম্ম পরিদর্শনের পরে তুমি তোমার দেহের অলঙ্কারাদি ধারণ ও ভোজনাদি কর্ম্ম করিবে। অতঃপর তুমি তোমার সৈন্যগণের পরিদর্শন করিবে। যখন তুমি সৈন্যগণের পরিদর্শন করিবে তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে যে সৈন্যগণের উৎসাহ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি রাত্রির প্রথমভাগে দূতগণের ও চারগণের নিকট হইতে

যে সংবাদ অবগত হইয়াছিলে রাত্রির শেষভাগে তদনুসারে নিজে কর্ত্তব্যাবধারণ করিবে। মধ্যরাত্রে ও মধ্যাহ্ন কালে বিহার সুখ অনুভব করিবে। যদিও আমি সময় বিভাগ প্রদর্শন করিলাম তথাপি এই কাল বিভাগ তুমি নিজের সুবিধা অনুসারেও করিতে পারিবে। কোন কালই কোন কার্য্যের অযোগ্য নহে। তুমি অলঙ্কৃত হইয়া যথাকালে রাজ সভায় উপস্থিত থাকিবে। চক্রের আবর্ত্তের মত রাজকার্য্যও আবর্ত্তিত হইয়া থাকে তুমি কখনও অলস চিত্ত হইওনা। ন্যায়নুসারে কোষ সঞ্চয়ের জন্য যত্নবান্ থাকিবে। বিবিধ কোষের সঞ্চয়ে যেমন যত্নবান থাকিবে এইরূপ বিবিধ কোষ যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে সেই বিষয়েও প্রণিহিত থাকিবে। তুমি সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষী হইবে। শত্রুগণের সর্ব্ববিধ ব্যবহার চারগণের দ্বারা অবগত থাকিবে। যে সমস্ত দুষ্ট শত্রু তোমার ছিদ্রান্বেষী তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াই আপ্তপুরুষগণ দ্বারা প্রশমিত করিবে। তুমি বিশেষভাবে কার্য্য দেখিয়া ভৃত্যগণকে তাহাদের উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ঊর্দ্ধতনকর্ম্মচারী দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই যেন ভৃত্যগণ তোমার কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ভক্ত, তোমার প্রতি অনুরাগী, তোমার হিতচিন্তক, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশসহনশীল, শূর এবং অতি দৃঢ় চরিত্র এরূপ ব্যক্তিকে তুমি সেনাপতি করিবে।

তোমার কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে যেন তোমার জন-পদবাসী জনগণ তাহা সম্পাদন করিতে উদ্যুক্ত থাকে, তাহারা তোমার কার্য্য সম্পাদনে যেন কখনও পরাঙ্মুখ না হয়। তুমি সর্ব্বদা তোমার ন্যূনতা ও তোমার শত্রুরাজগণের ন্যূনতা লক্ষ্য করিবে। স্বরাষ্ট্রে ক্রুদ্ধ, ভীত, অপমানিত ও লুব্ধ বর্গই স্বরাজ্যের ছিদ্র বা রন্ধ্র, ইহার প্রশমনে তুমি সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকিবে এবং শত্রুরাজ্যের এই চারিটি বর্গকে শত্রু রাজার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে।

তোমার রন্ধ্র যেন কোন ক্রমেই শত্রু জানিতে না পারে, এইরূপ মিত্র মধ্যম ও উদাসীন রাজগণও যেন তোমার রন্ধ্র জানিতে না পারে। তোমার স্বদেশজাত পুরুষগণ তাহাদের যেকোনও কার্য্যে অসাধারণতা প্রদর্শন করিলে তাহাদের গুণানুসারে তাহাদিগকে অবশ্য পুরস্কৃত করিবে। তোমার রাজ্যে কারু ও শিল্পিবর্গ যাহাতে তাহাদের কর্ম্মে অতিশয় নিপুণ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তোমার রাষ্ট্রবাসী জনগণের গুণবর্দ্ধনে তুমি কোন অবস্থাতেই পরাঙ্মুখ হইও না। তুমি সর্ব্বদা মিত্র, মধ্যম, উদাসীন ও স্বমণ্ডল এই চতুর্ব্বিধ মণ্ডলের কার্য্য অবগত থাকিবে।

মনু ৭ম অধ্যায় ১৭৭ ও ১৮০ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে নীতিজ্ঞ মহীপতি সর্ব্বোপায়ে—সর্ব্ব প্রযত্নে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন—যাহাতে তাঁহার শত্রু মিত্র ও উদাসীন রাজগণ তাঁহা অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারে। মিত্র, উদাসীন ও শত্রুরাজা যাহাতে বিজিগীষু রাজাকে পীড়িত করিতে না পারে—বিজিগীষু রাজা সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাই রাজনীতিশাস্ত্রের সার সংক্ষেপ।

যাহা হউক ধৃতরাষ্ট্রও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র শত্রুমণ্ডলকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—১। শত্রু, ২। শত্রুর মিত্র, ৩। ও তাহার মিত্র এবং ৪। উভয়শত্রু অর্থাৎ শত্রু ও বিজিগীষু উভয়ের শত্রু। এই চতুর্ব্বিধ শত্রু সতত অবগত হইবে এবং সমস্ত আততায়িগণেরও যাহারা মিত্র এবং যাহারা তাহাদেরও মিত্র তাহাও অবগত হইবে। এই প্রত্যেক রাজারই ১। অমাত্য, ২। রাষ্ট্র, ৩। দুর্গ, ৪। কোষ, ৫। বল এই পাঁচটি অঙ্গ আছে। দ্বাদশ রাজ মণ্ডলের প্রত্যেকের এই পাঁচটি করিয়া অঙ্গ থাকায় ৬০টি অঙ্গ হইবে এবং দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সহিত মিলিত এই ৬০টি অঙ্গ লইয়া ৭২টি হইবে।

১। শত্রু, ২। মিত্র, ৩। শত্রুমিত্র, ৪। মিত্রমিত্র, ৫। শত্রুর মিত্রের মিত্র, ৬। পার্ষ্ণিগ্রাহ, ৭। আক্রন্দ, ৮। পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, ৯। আক্রান্দাসার, ১০। বিজিগীষু, ১১। মধ্যম, ও ১২। উদাসীন এই বারটি রাজা—ইহাদের

প্রত্যেকের ৫টি করিয়া অমাত্যাদি দ্রব্যপ্রকৃতি বা অঙ্গ আছে—ইহারাই দ্বাদশ রাজমণ্ডল চিন্তার বিষয়। ইহাই নীতিশাস্ত্রবিদ্ আচার্য্যগণ বলিয়াছেন।

এই দ্বাদশ রাজমণ্ডলে ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এই ৬টি গুণ চিন্তা করিবে। এই ষাড়্গুণ্য প্রয়োগের ফল—১। বৃদ্ধি, ২। স্থান, ও ৩। ক্ষয় এই ত্রিবিধ ফলকেই যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফল বলা হয়।

যে সময়ে স্বপক্ষ কোষ দণ্ডাদি বলে বলবান্ বলিয়া নিশ্চিত হইবে—এবং শত্রুপক্ষ কোষ দণ্ডাদি বলে দুর্ব্বল বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, তখন বিজিগীষু রাজা শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুকে জয় করিবেন। আর যদি শত্রুপক্ষই অধিক বলশালী হয় আর স্বপক্ষ দুর্ব্বল হয়, তবে দুর্ব্বল রাজা বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেন। বিজিগীষু রাজা স্বকীয় বল বর্দ্ধনের জন্যই প্রবল শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেন, কিন্তু সন্ধি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন না। সন্ধি করিয়া মহীপতি স্বীয় কোষ দণ্ডাদির অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেন এবং যখন নিজেকে সমর্থ মনে করিবেন অর্থাৎ অধিক বলসম্পন্ন বলিয়া মনে করিবেন তখন শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইবেন। প্রবল শত্রুর সহিত সন্ধিকালে যদি শত্রুকে ভূমি অর্পণ করিতে হয়, তবে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক শত্রুকে সেই সমস্ত ভূমি অর্পণ করিবেন, যে ভূমিতে শস্যাদি অল্প হয় এবং সুবর্ণাদির আকার না থাকে। যদি ধন প্রদান করিতে হয় তবে সুবর্ণ রজতাদি ভিন্ন ধন প্রদান করিবেন। যদি মিত্রত্যাগ করিতে হয়—তবে দুর্ব্বলমিত্রকে ত্যাগ করিবেন। যদি সৈন্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন—কিন্তু শ্রেষ্ঠভূমি, শ্রেষ্ঠ ধন, উত্তম মিত্র, সুশিক্ষিত ও অনুরক্ত সৈন্য ত্যাগ করিবেন না। তোমার সহিত যদি দুর্ব্বল শত্রু সন্ধি করে তবে সেই সন্ধির দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য, শত্রুর পুত্রকে প্রতিভূরূপে নিজের নিকটে রাখিবে। শত্রু অন্য কাহাকেও প্রতিভূরূপে দিলে তাহা গ্রহণ করিবে না এবং তুমি যখন অন্যের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে তখন তুমি পুত্রকে প্রতিভূ রাখিও না এবং রাখিতে হইলে সত্বরই তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবিষয়ে নানাবিধ মন্ত্রণা ও উপায়ের প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিবে।

তোমার রাষ্ট্রবাসী জনগণের মধ্যে যাহারা দীন, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং তোমার অমাত্যাদিগের মধ্যেও যাহারা বিপন্ন তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

নীতিশাস্ত্রকারগণ শত্রুর প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার চারি প্রকার বলিয়াছেন—১। উচ্ছেদ ২। অপচয় ৩। পীড়ন বা স্তম্ভন ও ৪। কর্ষণ। শত্রুরাজ্য হইতে শত্রুকে সর্ব্বদা বিতাড়িত করা অথবা শত্রুকে বিনাশ করাকে উচ্ছেদ বলে। শত্রুর মন্ত্রশক্তি, উৎসাহশক্তি ও প্রভুশক্তির হানি করার নাম অপচয়। শত্রুর কোষ ও দণ্ডের হানিকরার নাম কর্ষণ। সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণের বিনাশ করার নাম পীড়ন।

বিজিগীষু রাজা শত্রুর উচ্ছেদে অসমর্থ হইলে পীড়ন কর্ষণাদি দ্বারা শত্রুকে দুর্ব্বল করিবেন। বিজিগীষু শত্রুকে দুর্ব্বল করিতে না পারিলে নিজের রাজ্যই রক্ষা করিতে পারিবেন না। স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্যই শত্রুর পীড়ন কর্ষণাদি করা আবশ্যক। এজন্য বিজিগীষু রাজা অতিযত্নের সহিত পীড়নাদির অনুষ্ঠান করিবেন। অভ্যুদয় অভিলাষী কোন রাজা ক্ষীণশক্তি হইয়া আশ্রয়প্রার্থী হইলে বিজিগীষু কখনও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। তাহার অভ্যুদয়ের সহায়তা করিয়া মিত্ররূপে গ্রহণ করিবেন।

তোমার রাষ্ট্রবাসী জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহাতে তোমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে না পারে তাহার জন্য সর্ব্বদা মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রবাসী জনগণের সঙ্ঘভেদনে যত্নশীল হইবে। তুমি সজ্জনের সংগ্রহে

এবং দুষ্কৃতকারীর নিগ্রহে যত্নশীল থাকিবে এবং প্রবল পুরুষেরা যাহাতে দুর্ব্বলকে পীড়িত করিতে না পারে—তাহার প্রতি যত্নশীল থাকিবে। যদি কোন প্রবল নরপতি, দুর্ব্বল নরপতিকে আক্রমণ করে তবে সেই দুর্ব্বল নরপতি, বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করিবেন কিন্তু ভৌজঙ্গীবৃত্তি অবলম্বন করিবেন না এবং সাম দানাদি দ্বারা প্রবল শত্রুকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি এই সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রুর নিবৃত্তি করা অসম্ভব হয়—তবে সম্পূর্ণ কোষদণ্ডের সাহায্যে এবং মিত্রমণ্ডলের সহায়তায় পূর্ণ বিক্রমের সহিত অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুকে আক্রমণ করিবেন, তাহাতে যদি মৃত্যুও ঘটে তাহাও নরপতিগণের শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন তুমি যথাকালে শত্রুরাজগণের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবে—এই সন্ধি ও বিগ্রহ প্রত্যেকটি দ্বিযোনি অর্থাৎ ২ প্রকার এবং এই সন্ধি ও বিগ্রহের উপায়ও বহু প্রকার এবং ইহার স্বরূপও বহুবিধ।

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১৬২ শ্লোক হইতে ১৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এই ছয়টি গুণের প্রত্যেকটিকেই দ্বিযোনি অর্থাৎ ২ প্রকার বলা হইয়াছে।

আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের যে রাজধর্ম্মানুশাসনের উল্লেখ করিয়াছি—তাহাতে রামচন্দ্রও সন্ধি ও বিগ্রহকে দ্বিযোনি বলিয়াছেন।

"দ্বিযোনী সন্ধি বিগ্রহৌ" ৭০ শ্লোক অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির আচারাধ্যায়ে ৩৪৩ শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার টীকা বালক্রীড়াতে বিশ্বরূপাচার্য্য, মনুস্মৃতির অনুসারেই সন্ধি ও বিগ্রহ দ্বিযোনি বলিয়াছেন। উভয় রাজার সুবিধার জন্য হিরণ্যাদি পণ বন্ধন করিয়া যে সন্ধি করা হয়—এই সন্ধি উভয় রাজারই তৎকালেই সুবিধা হইয়া থাকে। এইরূপ কোন সন্ধি দ্বারা একজন রাজার তৎকালেই সুবিধা হয় এবং অন্য রাজার ভবিষ্যতে সুবিধা হয়। তাৎকালিক ফল ও ভাবিফলকে অপেক্ষা করিয়াই সন্ধি দুই প্রকার বলা হইয়াছে।

কিন্তু মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি, বালক্রীড়াকার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহা করেন নাই। ভাষ্যকার মেধাতিথি সমানযানকর্ম্মা সন্ধি ও অসমানযানকর্ম্মা সন্ধি এই দ্বিবিধ বলিয়াছেন। বিজিগীষু রাজা অন্য রাজার সহিত শত্রুরাজার প্রতি যানাদি বিষয়ক যে সন্ধি করেন, সেই সন্ধির ফল তৎকালে বা পরবর্ত্তিকালে লব্ধ হইয়া থাকে। সন্ধিবন্ধন করিয়া দুইজন রাজা মিলিতভাবে যখন শত্রু রাজ্যের প্রতি অভিযান করেন তাহার ফল তাৎকালিক বা পরবর্ত্তিকালে হইতে পারে—এইরূপ সন্ধির নাম সমান যানকর্ম্মা সন্ধি। আর তুমি এইদিকে শত্রুরাজ্য আক্রমণ কর, আমি অপরদিকে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিব এইরূপ সন্ধিবন্ধন করিয়া তাৎকালিক ফল লাভের জন্য বা পরবর্ত্তীকালে ফল লাভের জন্য যে সন্ধিবন্ধন করা হয় তাহার নাম অসমান যানকর্ম্মা সন্ধি। কিন্তু কামন্দক প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রকারগণ সন্ধি ১৬ প্রকার বলিয়াছেন এবং ১৬ বলিয়া পরে সন্ধির আরও প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। মনু-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে সন্ধি দ্বিযোনিই বলা হইয়াছে।

এইরূপ বিগ্রহও দুই প্রকার। স্বয়ংকৃত এবং অন্যরাজার দ্বারা মিত্ররাজার অপকার হইলে সেই মিত্ররাজার রক্ষার জন্য বিগ্রহ হইয়া থাকে। এই কথা মনু ৭ম অধ্যায় ১৬৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

রাজা সর্ব্বদা নিজের ও শত্রুরাজগণের প্রবল দুর্ব্বলভাব চিন্তা করিবেন এবং সর্ব্বদা নিজের ন্যূনতা পরিপূরণের জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। শত্রুকে কখনও দুর্ব্বল বিবেচনা করিবেন না। শত্রুর কোষ ও দণ্ড পর্য্যাপ্ত আছে ও শত্রু আত্মবান্ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। রাজা প্রবল শত্রুর নিকটে কখনও আনতও হইবেন—কিন্তু

আনত হইয়াও নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। দুর্ব্বল শত্রুকে আনত রাখিবেন। প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রবলতর রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

শত্রুরাজ্যে যাহাতে নানাবিধ ব্যসন উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের সহিত শত্রুরাজার যাহাতে ভেদ উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নানাবিধ উপায়ে শত্রুরাজার কোষ দণ্ডাদির ক্ষয় করাইবেন। নানবিধ বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখাইয়া শত্রুরাজাকে ভীত করিবেন এবং অন্যের সহিত যুদ্ধ ঘটাইয়া শত্রুরাজার বল ক্ষয় করাইবেন।

উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তির বলাবল সর্ব্বদা বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে শত্রুরাজার কোন্ শক্তি অধিক ও বিজিগীষু রাজার কোন্ শক্তি অধিক তাহা বিবেচনা করিবেন। এই ত্রিবিধ শক্তি সম্পন্ন রাজা শত্রুকে বশীভূত করিতে পারে—যদি শত্রু রাজা এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন না হন। শত্রুরাজা উক্ত ত্রিবিধ শক্তি সম্পন্ন হইলে সাক্ষাৎভাবে শত্রুরাজার সহিত বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না। রাজা—পাঁচপ্রকার বল অর্থাৎ সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। ১। মৌলবল। ২। মিত্রবল। ৩। ভৃতকবল। ৪। আটবিকবল ও। ৫। শ্রেণীবল। যাহারা সর্ব্বদা পিতৃপিতামহক্রমে স্বদেশসম্ভূত রাজার সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে মৌলবল বলা হয়। এই মৌলবল স্বদেশসম্ভূত রাজার প্রতি গাঢ় অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে ও ইহাদের রাজ্যের প্রতি সুদৃঢ় মমত্ব বোধ থাকে। ইহারা সর্ব্বদা সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত থাকে বলিয়া অনবরত ব্যয়ামাদি কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া থাকে এজন্য মৌলবল সমস্ত বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রয়োজনানুসারে মিত্ররাজা সহায়তার জন্য যে বল প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহাকে মিত্রবল বলে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে মিত্রবলই প্রভূততর ছিল। যুদ্ধকালে সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সাময়িক ভাবে বেতনদ্বারা যে সৈন্যসংগ্রহ করা হয় তাহাদিগকে ভৃতকবল বলে। যুদ্ধকালে স্বদেশাধিপতির সহায়তার জন্য সেই দেশবাসী এক শ্রেণীভুক্ত অথবা এক জাতীয় শিল্পবিৎ জনগণ সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে তাহাদিগকে শ্রেণীবল বলে। রাজার নিজের রাজ্যের অন্তর্গত পর্ব্বত অরণ্যাদি বহুল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ রাজার সহায়তার জন্য যাহারা সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহাদিগকে আটবিক বল বলে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই পাঁচপ্রকার বলের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী দণ্ডনীতিশাস্ত্রে ছয় প্রকার বল বলা হইয়াছে। ১। মৌলবল। ২। ভৃতকবল। ৩। শ্রেণীবল। ৪। মিত্রবল। ৫। শত্রুবল। ৬। আটবিক বল। এই ছয়প্রকার বলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বল শ্রেষ্ঠ ও পরপর বল নিকৃষ্ট ইহাই বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী নীতিশাস্ত্রকারগণ শত্রুবল নামক একটি নূতন বলের কথা বলিয়াছেন।

শত্রুরাজার সহিত সন্ধিদ্বারা অথবা বলপূর্ব্বক অথবা ভেদাদির দ্বারা যে সমস্ত শত্রুসৈন্যগণকে বিজিগীষু রাজা আত্মসাৎ করেন তাহাদিগকে শত্রুবল বলে। এই শত্রুবল আটবিক বল হইতে শ্রেষ্ঠ ইহাও পরবর্ত্তী নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই শত্রুবল স্বীকার করেন নাই। শত্রুবলকে নিজের বলের অন্তর্গত করিতে বলেন নাই এবং মিত্রবলকে মৌলবলের বলের পরেই গণনা করিয়াছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মতে মৌলবল প্রথম ও মিত্রবল দ্বিতীয়। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—মিত্রবল ও মৌলবল এই দুইটিই শ্রেষ্ঠবল এবং শ্রেণীবল ও ভৃতকবল উভয়ই তুল্য বলিয়াছেন। এই যে পঞ্চবিধ বল বলা হইয়াছে তাহারও বহুবিধ ব্যসন আছে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই ব্যসন বা আপৎ বহুপ্রকার। সপ্তাঙ্গ রাজ্যের প্রত্যেকটি অঙ্গেই বহুবিধ আপৎ সম্ভাবিত রহিয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই আপৎ বা ব্যসন গণনা করিয়া বলেন নাই। নীতিশাস্ত্রকারগণ এই প্রত্যেকটি অঙ্গেই বহুবিধ আপদের বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

১। উপরুদ্ধ অর্থাৎ শত্রুসৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত। ২। পরিক্ষিপ্ত—বিশৃঙ্খলিতভাবে নানাস্থানে অবস্থিত। ৩। বিমানিত অর্থাৎ অপমানিত। ৪। অমানিত অর্থাৎ উপযুক্ত সম্মান যাহারা পায় নাই। ৫। ব্যাধিত। ৬। শ্রান্ত। ৭। দূরদেশ হইতে আগত। ৮। নবাগত প্রভৃতি।

সপ্তাঙ্গ রাজ্যের যে কোন অঙ্গেই আপৎ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার এবং যাহাতে কোন আপৎ উপস্থিত হইতে না পারে—সেজন্য রাজা সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবেন। সমস্ত প্রকৃতিসম্পৎ দ্বারা সম্পন্ন রাজাই শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে পারেন। শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে হইলে দেশ ও কাল অনুকূল হওয়া আবশ্যক। বিজিগীষুরাজা নীতিজ্ঞান প্রভৃতি রাজগুণ সম্পন্ন হইবেন। বিজিগীষু রাজা যদি হৃষ্টপুষ্ট বল সম্পন্ন হন এবং অমাত্যসম্পৎযুক্ত ও কোষসম্পৎ যুক্ত হন এবং শত্রু যদি বিপরীত গুণযুক্ত হয় তবে বিজিগীষু রাজা যে কোন সময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। রাজা যুদ্ধকালে শকটব্যূহ, পদ্মব্যূহ, বজ্রব্যূহ প্রভৃতি যাহা ঔশনস তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। যুদ্ধে উদ্যুক্ত বিজিগীষু রাজা, চারসমূহদ্বারা শত্রুসৈন্যগণের সমস্ত অবস্থা অবগত হইবেন এবং স্বসৈন্যগণেরও অবস্থা অবগত হইবেন। প্রয়োজনানুসারে রাজা কখনও বা স্বভূমিতে কখনও বা শত্রু ভূমিতে যুদ্ধ করিবেন। রাজা সর্ব্বদাই দান ও মানদ্বারা স্বকীয় সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিবেন এবং যুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ লোকদিগকে সৈন্যমধ্যে আনিবেন।

রাজা সর্ব্ব অবস্থাতেই নিজের রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ থাকিবেন। রাজার স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে যে সমস্ত ব্যবহারের কথা বলা হইল, রাজা তাহার যথার্থ অনুষ্ঠান করিলে—ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণলাভ করিয়া থাকেন। প্রজামণ্ডলের প্রিয় রাজা ইহলোকে যেমন সুখভোগ করিয়া থাকেন—পরলোকেও সেইরূপ সুখী হইয়া থাকেন। বহু অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, ধর্ম্মতঃ প্রজা পরিপালনেও সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

রামায়ণে রাজনীতি

ভগবান্ বাল্মীকি তাঁহার আদি মহাকাব্য রামায়ণের বহুস্থলেই রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, ইহা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি। যুদ্ধকাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গে দেখিতে পাওয়া যায় রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কা নগরীতে এক মন্ত্রণাসভার আহ্বান করিয়াছিলেন। লঙ্কানগরী আক্রমণ করিবার জন্য রামচন্দ্র বানরসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের উত্তর তটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তথায় সেনা সন্নিবেশ করিয়া সমুদ্র পার হইবার আয়োজন করিতেছেন—বানর সৈন্যের সেনাপতি নীলের তত্ত্বাবধানে সাগরের উত্তরতীরে বানরসেনাসমূহ সুসন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে—এই সংবাদ লঙ্কাপতি অবগত হইয়া এবং ইতঃপূর্ব্বেও মহাবীর সমুদ্রলঙ্ঘন পূর্ব্বক দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া নগরধর্ষণ প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়া শত্রুপক্ষের অধর্ষণীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন—ইহাতে রাক্ষসরাজ কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়া মন্ত্রণা সভার আহ্বান করিয়াছেন। রাক্ষস মন্ত্রিবর্গ সভায় সমবেত হইলে—রাক্ষসরাজ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপস্থিত কার্য্যের গুরুত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয়গণের কার্য্যের প্রতিরোধের জন্য রাক্ষসমন্ত্রিগণের মন্ত্রণা শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ বলিয়াছিলেন—যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ইহাতে আমাদের করণীয় কি? যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে—শত্রুর প্রতিরোধের জন্য আমাদের যাহা অবশ্য করণীয় তাহার অবধারণ করিবার জন্যই আপনাদের মন্ত্রণার একান্ত প্রয়োজন।

মহীপতিগণের বিজয়ের মূল মন্ত্র (মন্ত্রণা)। প্রাচীন নীতিবিদ্‌গণ ইহাই বলিয়াছেন। এজন্য উপস্থিত পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের মন্ত্রণা শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি, যে রাজা মন্ত্রণাকুশল অনুরক্ত মন্ত্রিগণের সহিত

মন্ত্রণা করিয়া কর্ত্তব্যের অবধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ করেন এবং দৈব ও পুরুষকারে যত্নশীল থাকেন, তাদৃশ মহীপতিকেই শ্রেষ্ঠ মহীপতি বলা হয়।

যে রাজা মন্ত্রিগণের অপেক্ষা না করিয়া মাত্রই নিজের স্ববুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্যের অবধারণ করেন এবং নিজেই সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া কার্য্যের প্রবৃত্ত হন তাঁহাকে মধ্যম নরপতি বলা হয়।

যে রাজা কার্য্যের গুণ দোষ নিরূপণ না করিয়াই এবং নীতিশাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়াই কেবলমাত্র রাগ দ্বেষাদি বশতঃ এইরূপ আমি করিব—এই নিশ্চয় করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহাকে অধম নরপতি বলা হয়। প্রদর্শিতরূপে নরপতি যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে এইরূপ মন্ত্রণাও উত্তম মধ্যম ও অধমরূপে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যেস্থলে মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রিবর্গ নীতিশাস্ত্রানুসারে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণে একমত হইয়া থাকেন, কর্ত্তব্যাবধারণে মন্ত্রিগণের যদি বৈমত্য উপস্থিত না হয়, সকলেই একমত হইয়া কার্য্যের অবধারণ করেন, তবে তাহাকে উত্তম মন্ত্রণা বলা হয়। আর যে স্থলে অর্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিগণ নানাবিধ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন ও পরে সেই মন্ত্রিগণ ঐকমত্যে উপস্থিত হইয়া থাকেন তাদৃশ মন্ত্রণাকে মধ্যম মন্ত্রণা বলে। আর যে স্থলে মন্ত্রিবর্গ অর্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কোন ঐকমত্যে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন প্রত্যেকেই পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া কেবল মাত্র স্বসিদ্ধান্ত রক্ষণের উপযোগী কথাই বলেন কিন্তু পরস্পর একমত হইতে পারেন না—সেই মন্ত্রণাকে অধম মন্ত্রণা বলা হয়।

উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে যেমন পুরুষ ত্রিবিধ এইরূপ মন্ত্রণাও ত্রিবিধ। রাক্ষসরাজ বলিয়াছিলেন যে—আপনারা সকলেই নীতিশাস্ত্রকুশল বুদ্ধিমান্, যাহাতে আমরা উপস্থিত কার্য্যে ঐকমত্য প্রাপ্ত হইতে পারি, আমাদের কার্য্য যাহাতে আপনাদের দ্বারা সুমন্ত্রিত হয় আপনারা তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের ঐকমত্যেই আমাদের কল্যাণ অবস্থিত ইহাই আমার এস্থলে বক্তব্য। রাম বহু বানর বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের উত্তর তীরে সেনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। আমাদের সহিত বিরোধ করিবার জন্য ইহারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের অবরোধের জন্য লঙ্কায় আগমন করিবে। বিক্রমশালী বানর সেনার সহিত এবং বিক্রমশালী লক্ষণের সহিত মিলিত হইয়া রাম লঙ্কায় আগমন করিলে আমাদের সহিত যে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইবে তাহার প্রশমনের জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে মন্ত্রণা করা আবশ্যক।

এই মন্ত্রণা সভাতে রাক্ষস রাজের প্রস্তাবানুসারে সেনাপতি প্রহস্ত, দুর্ম্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, বজ্রহনু প্রভৃতি রাক্ষসবর্গ স্ব স্ব অসাধারণ পরাক্রমের উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত আস্ফালন পূর্ব্বক শত্রুর হীনতার ও অবজ্ঞেয়তার উল্লেখ করিয়াছিল এবং রাবণকে আশ্বস্ত করিয়াছিল। কেবলমাত্র স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়াই রাক্ষসগণ রাবণকে আশ্বাসন করিয়াছিল কিন্তু শারীরবল ভিন্ন মন্ত্রবল কিছুই প্রদর্শন করে নাই। মন্ত্রণা সভায় আহূত হইয়া ইহারা মন্ত্রবল প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র শারীরবলই প্রকাশ করিয়াছিল।

যখন উদ্যতশস্ত্র রাক্ষসগণ মন্ত্রণা সভাতে শত্রুর হীনতা ও অবজ্ঞেয়তা প্রকাশ করিতেছিল তখন বিভীষণ সেই উদ্যতশস্ত্র রাক্ষসগণকে নিবারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন যে—যেস্থলে সাম দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও অভিপ্রেত বস্তুর সিদ্ধি হয় না সেই স্থলেই বিক্রম প্রদর্শনের অর্থাৎ দণ্ডরূপ উপায় প্রয়োগের কাল উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই নীতিবিদ্‌গণ বলিয়াছেন। দণ্ড প্রয়োগও সর্ব্বত্র ফলপ্রদ হয় না। যে স্থলে শত্রু প্রমত্ত, বলবান্—অন্যশত্রু দ্বারা আক্রান্ত, এবং ব্যাধি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব উৎপাতে বিড়ম্বিত—তাদৃশ শত্রুর প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্তু এই বিক্রম প্রকাশও শত্রুর কোষ ও বল প্রভৃতি পরীক্ষা পূর্ব্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রযুক্ত হইলে অভিপ্রেত ফলের সাধক হইয়া থাকে।

আমরা যে শত্রুর প্রতিরোধের জন্য এই মন্ত্রণা সভায় মিলিত হইয়াছি—এই শত্রু প্রমত্ত নহে কিন্তু অত্যন্ত অপ্রমাদী বিজিগীষুগুণ সম্পন্ন এবং অত্যন্ত বল সংযুক্ত, এই শত্রু জিতরোষ ক্রোধের বশীভূত হইয়া অকস্মাৎ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না এবং দুরাধর্ষ, তাহাকে তোমারা কিরূপে প্রধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে? সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া হনুমান্ যে দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছে, তাহা কল্পনারও অতীত। শত্রুর অপরিমিত বল ও বীর্য্যের বিষয় না জানিয়া সহসা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আরও বিশেষ কথা এই যে আজ আমরা যে রামের বিরোধে অভিযানের জন্য উদ্‌যুক্ত হইতেছি এই রাম পূর্ব্বসময়ে রাবণের কি কোন অপকার করিয়াছিল? যদি অপকার না করিয়া থাকে তবে রাম আমাদের শত্রু হইল কিরূপে? যে আমাদের পূর্ব্বে কখনও অপকার করে নাই সে আমাদের কখনও শত্রু হইতে পারে না। রামের ভার্য্যাকে রাবণ অকারণে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া আনিলেন কেন? খর দুষণাদিকে যে রাম বধ করিয়াছেন তাহাতে রামের কোন অপরাধ নাই—কারণ ইহারাই রাম লক্ষণাদিকে বধ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রম আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং প্রাণরক্ষার জন্যই রাম ইহাদিগকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরদারাভিমর্ষণ অযশস্য ও অনায়ুষ্য ঘোরতর পাপ, এই ঘোরতর পাপ অনুষ্ঠান করায় লঙ্কানগরীতে অবরুদ্ধ সীতা আমাদের বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে। আমার মনে হয় সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করাই উচিত। অকারণ যুদ্ধ ঘটাইবার কোন কারণ নাই। বীর্য্যবান্ ধর্ম্মানুবর্ত্তী রামের সহিত নিরর্থক শত্রুতা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই—এই জন্য সীতাকে প্রত্যর্পণ করা সঙ্গত মনে করি। তাড়কা বধ, মারীচ সংযমন, সুবাহু বধ, হরধনুভঙ্গ, পরশুরামদমন, কবন্ধ বিরাধ প্রভৃতির বিনাশ, খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষসের সংহার হইতে রামের অসাধারণ বিক্রমশালিতা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

সুতরাং অকারণ রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। যুদ্ধ সংঘটিত হইলে লঙ্কানগরীর বিনাশ অবশ্য ঘটিবে। লঙ্কার শূরবীর রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইবে। হনুমানের কার্য্য হইতে আমরা বানরবাহিনীর দুর্দ্ধর্ষতা বুঝিতে পারিয়াছি। এই বানরবাহিনী লঙ্কা আক্রমণ করিলে কখনও কল্যাণ হইবে না। সীতাকে যদি প্রত্যর্পণ না করা যায় তবে মহাবীর রাম ও দুর্দ্ধর্ষ বানর বাহিনীর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবে আর তাহাতে লঙ্কার ক্ষয় অনিবার্য্য। এজন্য আমি রাক্ষসগণের হিত মনে করিয়াই সীতা প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিতেছি। রাক্ষসরাজের প্রতি বন্ধুত্ব প্রযুক্তই বিনীতভাবে আমি এই প্রার্থনা জানাইতেছি। বিভীষণের পরামর্শ শ্রবণের পরে সেই দিনের মত মন্ত্রণা সভার কার্য্য সমাপ্ত করা হয়। পরদিন প্রভাতসময়ে পুনর্ব্বার মন্ত্রণাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিভীষণ বিনীতভাবে মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ—রাবণকে রামের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার জন্য নানাবিধ হিতবাক্য বলিয়াছিলেন। বিভীষণ রাবণের নিকট যখন যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার কথা বলিতেছিলেন তখন সেই সভাতে রাবণের বিশিষ্ট মন্ত্রিবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। বিভীষণ বলিয়াছিলেন সীতা হরণের পর হইতে লঙ্কা নগরীতে নানাবিধ দুর্নির্মিত্ত দেখা যাইতেছে—যাহাতে বুঝিতে পারা যায় লঙ্কানগরী ও রাক্ষসগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে, এজন্য অদূর ভবিষ্যতে যে ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইবে তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য রাক্ষসরাজ যদি সঙ্গত মনে করেন তবে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত।

বিভীষণ আরও বলিয়াছিলেন যে—এইরূপ বলায় আমার যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে তবে তাহা রাক্ষসরাজ মার্জ্জনা করিবেন। আমি যে সমস্ত ভয়সূচক দুর্নিমিত্তের কথা বলিলাম তাহা লঙ্কাবাসী সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহা মহারাজের নিকটে কেহই প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না। আমি ইহা অবশ্য বক্তব্য মনে করিয়া নিবেদন করিলাম।

এতদুত্তরে রাক্ষসরাজ বলিয়াছিলেন যে—আমি ভয়ের কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ বলিয়া রাক্ষসরাজ সভায় কার্য্য স্থগিত করিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভট্টিকাব্যে দণ্ডনীতি

আমরা রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া মন্ত্রণা সভার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি রামায়ণের বিষয়বস্তু লইয়া সুপ্রাচীন ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক হইতে রামায়ণের প্রদর্শিত মন্ত্রণা প্রতিপাদক উক্তি গুলিকেই কবি ভট্টি নিজের ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। আর তাহাতে কবি ভট্টি রামায়ণীয় প্রদর্শিত মন্ত্রণা প্রতিপাদক উক্তিতে কতটুকু আলোক পাত করিয়াছেন অর্থাৎ রামায়ণের উক্তিতে এই মন্ত্রণা রীতি যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা কতটুকু সুস্পষ্ট হইয়াছে ইহা অবধারণ করিবার জন্য আমরা এস্থলে ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ অধ্যায়ের আশয় প্রদর্শন করিব। আরও বিশেষ কথা এই যে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধিকরণে বর্ণিত বিষয়গুলি কবি এই অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়াছেন।

ভারতের এমনদিন ছিল কবি হইতে হইলেও দণ্ডনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। দণ্ডনীতি উপেক্ষা করিয়া কবি হওয়া যাইত না। ভট্টিতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রণা সভায় সম্মিলিত মন্ত্রিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া রাক্ষসরাজ বলিয়াছিলেন—আপনারা সকলেই আমার মিত্র, মন্ত্রণাতে কুশল এবং আপনারা দৃষ্টকর্ম্মা। যাঁহারা কেবল নীতিশাস্ত্রই জানেন কিন্তু নিজে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই তাঁহারা কোন জটিল কার্য্যের উদ্ভব হইলে বিষাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আপনারা সকলেই নীতিশাস্ত্রাভ্যাসী অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র আপনারা বহুধা অধ্যয়ন করিয়াছেন। আপনারা বুদ্ধিমান্ ও উপায়বিদ্ অর্থাৎ সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের প্রয়োগে নিপুণ। আপনাদের মত সুযোগ্য মন্ত্রিগণের সহিত সুমন্ত্রিত কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। রামকর্ত্তৃক মহাবীর বালি এবং খরদূষণ প্রভৃতি রাক্ষসবর্গ নিহত হইয়াছে, আমরা তাহা উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছি। কোন প্রতিকার করা সঙ্গত মনে করি নাই। হনূমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা নগরী দগ্ধ হইয়াছে। হনূমানের সহিত যুদ্ধে সৈন্যগণের সহিত কুমার অক্ষ নিহত হইয়াছে। শত্রু সৈন্যগণ সমুদ্রের উত্তর তটে সম্মিলিত হইয়া সাগর লঙ্ঘন করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের অন্তর করণীয় কি তাহা আপনারা বলুন। রাক্ষসরাজের এইরূপ প্রস্তাবের উত্তরে সেনাপতি—প্রহস্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ, হস্তচালন এবং ধনু, গদা, তরবারি প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজকে বলিয়াছিলেন—এই ক্ষুদ্রশত্রুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাহার প্রতিকারের জন্য আপনি যে মন্ত্রণা সভার আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে শত্রুর গুরুত্বই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। আপনি স্বর্গরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছেন, সুতরাং ক্ষুদ্র মনুষ্যের সহিত বিরোধ আপনার কোন চিন্তার বিষয়ই হইতে পারে না। আপনার আদেশানুসারে আমরা যে কোন প্রবলশত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারি। আর এই তুচ্ছ বানর সেনার সহিত সম্মিলিত রামকে পরাজিত করিতে আমরা সকলেই অনায়াসে সমর্থ। আপনি মহাবীর আপনি আদেশ করিলে আমরা পারি না এমন কোন কার্য্যই নাই—আর আপনি যে হনূমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা নগরীর দাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে শত্রুর বলবত্তা কিছুই প্রমাণিত হয় নাই—নিজেদের অনবধানতা বশতঃই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। যখন হনূমান্ লঙ্কাদাহে উদ্যুক্ত হইয়াছিল তখনই তাহাকে বধ করা উচিত ছিল। তাহাকে যে তখনই বধ করা হয় নাই ইহাতে রাক্ষসগণের অনবধানতাই বুঝিতে হইবে।

প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসগণের আস্ফালন যুক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ, প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বলিয়াছিলেন—আপনারা এই মন্ত্রণা সভাতে উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা শৌর্য্য প্রকাশক বটে কিন্তু মন্ত্রণাসভাতে প্রজ্ঞাপ্রদর্শনই আবশ্যক—শৌর্য্য প্রদর্শন নিরর্থক। শৌর্য্য প্রদর্শনের স্থান যুদ্ধ ক্ষেত্র—মন্ত্রণাসভা নহে। আর আপনারা যে বলিয়াছেন এই তুচ্ছ শত্রু প্রতিরোধের জন্য মন্ত্রণা সভার আহ্বান করায়

শত্রুরই গুরুত্ব বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—আপনাদের এই কথার সমুচিত উত্তর, লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া হনূমানই প্রদর্শন করিয়াছে। শত্রু যদি তুচ্ছ হইত তবে শত্রুর সাধারণ অনুচর হনূমান্ লঙ্কানগরী দাহে সমর্থ হইত না। লঙ্কানগরী দাহেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে শত্রু তুচ্ছ নহে, সুতরাং মন্ত্রণাসভার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আর যে আপনারা বলিয়াছেন রাক্ষসগণের প্রমাদবশতঃই হনূমান্ লঙ্কানগরী দাহ করিতে পারিয়াছে, ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে লঙ্কানগরীর দাহ যদি রাক্ষসগণের প্রমাদবশতঃই হইয়া থাকে তাহা হইলেও অতি সুঘোর ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাও যে হনূমান্ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও হনূমানের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, ইহাও কি রাক্ষসগণের প্রমাদই বুঝিতে হইবে? এই জগৎ অতি বিচিত্র স্বভাব, জনগণও অতি বিচিত্র শক্তি যুক্ত, এজন্য বৃথা আত্মাভিমানে গর্ব্বিত হওয়া সঙ্গত নহে। উপস্থিত বিপদের প্রতিকারের জন্য যাহা অবশ্য করণীয় তাহা করুন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব প্রভৃতি ষাড়্গুণ্য পরিজ্ঞানগর্ভিত যুক্তিবাদিগণের প্রতি বৃথা অবজ্ঞা প্রদর্শন বিজিগীষুর কর্ত্তব্য নহে। অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই ছয়টি দ্রব্যপ্রকৃতির সম্পদ্যুক্ত এবং আত্মসম্পদ্যুক্ত মহীপতিই বিজিগীষু। এই বিজিগীষু নরপতিই নীতিশাস্ত্রানুসারে সন্ধি বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্যের অনুষ্ঠাতা। এজন্য ইহাকেই নয়ের অধিষ্ঠতা বলা হয়।

এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে বৃদ্ধি, স্থান ও ক্ষয় এই ত্রিবিধ ফল হইয়া থাকে। সন্ধি বিগ্রহাদি ছয়টি গুণের মধ্যে যে গুণে অবস্থিত হইয়া বিজিগীষু বুঝিতে পারেন যে এই গুণে অবস্থিত হইয়া আমি আমার দুর্গকর্ম্ম, সেতুকর্ম্ম, বণিক্পথ নির্ম্মাণ, শূন্যনিবেশন, খনি আকর ইত্যাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নিজের বৃদ্ধিকর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে পারিব এবং শত্রুর এই কর্ম্মগুলির উপঘাত করিতে পারিব, বিজিগীষু রাজা সেই গুণ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন, ইহাই ষাড়্গুণ্য প্রয়োগের বৃদ্ধি নামক ফল। নীতিশাস্ত্রকারগণ ১। কৃষি, ২। বণিক্পথ, ৩। দুর্গ, ৪। সেতু, ৫। কুঞ্জরবন্ধন, ৬। খনিকর্ম্ম, ৭। আকরকর্ম্ম, ৮। শূন্যভূমিরনিবেশন এই আটটি কর্ম্ম বলিয়াছেন। এই আটটি কর্ম্মকেই অষ্টবর্গ বলে। বিজিগীষু রাজা যে গুণ অবলম্বন করিলে প্রদর্শিত ফলের বিপরীত ফল হয় তাহাকে ক্ষয় বলা হয় অর্থাৎ নিজের দুর্গকর্ম্মাদির উপঘাত হয় এবং শত্রুর দুর্গকর্ম্মাদির অনুপঘাত হয়—তাদৃশ গুণের অনুষ্ঠানের ফল ক্ষয়।

আর যেগুণে অবস্থিত হইলে প্রদর্শিত দুর্গকর্ম্মাদির ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না তাহাকে স্থান বলে। পূর্ব্বাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেনা বলিয়াই ইহাকে স্থান বলা হয়। বিজিগীষু নরপতি নিজের এবং শত্রুর বৃদ্ধি ক্ষয় ও স্থান সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া সন্ধি প্রভৃতি ছয়টি গুণের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিবেন। আত্মগত ও শত্রুগত এই ত্রিবিধ ফলের সাধক ষাড়্গুণ্য নিরূপণে ও তাহার প্রয়োগে বিজিগীষু সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবেন। রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও এতাদৃশ রিজিগীষু নরপতিকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না।

অতঃপর বিভীষণ বলিয়াছেন যে—এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যেসময়ে বিজিগীষু নরপতি, শত্রুর বৃদ্ধিতেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন। সাধারণভাবে শত্রুর বৃদ্ধি উপেক্ষণীয় না হইলেও অবস্থা বিশেষে শত্রুর বৃদ্ধিও উপেক্ষার যোগ্য। শত্রু যদি নীতিপরিজ্ঞান বিরহিত দুর্নীতিসম্পন্ন হয় এবং অজিতেন্দ্রিয় হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষযুক্ত হয় তাদৃশ শত্রুর বৃদ্ধি, সমস্ত লোকেরই বিরাগের কারণ হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকের উদ্বেগকারিণী বৃদ্ধি, পরিণামে তাহারই মূলচ্ছেদের কারণ হইয়া থাকে। যে বৃদ্ধিতে শত্রু নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে—শত্রুর তাদৃশ বৃদ্ধি বিজিগীষুর উপেক্ষারই বিষয়।

বিভীষণ আরও বলিয়াছেন—এমন অবস্থাও হইতে পারে, যে অবস্থাতে বিজিগীষু নিজের ক্ষয়েও উপেক্ষা করিবেন। যে অবস্থাতে বিজিগীষুর ক্ষয়ও জনগণের অনুরাগের বর্দ্ধক যে ক্ষয়ে বিজিগীষুর প্রকৃতিমণ্ডল বিজিগীষুর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে—প্রকৃতিমণ্ডলের অনুরাগবর্দ্ধক ক্ষয়ও উপেক্ষার বিষয় বটে।

যে বিজিগীষু রাজা অরিষড়্বর্গ জয় করিয়াছেন তাদৃশ বিজিগীষু প্রকৃতিবর্গের অনুরাগ বর্দ্ধনের জন্য নিজের ক্ষয়কেও উপেক্ষা করিবেন। এই ক্ষয়ও সেই অবস্থাতে উপেক্ষার বিষয় হইবে যখন বিজিগীষু রাজা শত্রুরাজগণের সহিত দৃঢ়সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন। শত্রুরাজগণের সহিত দৃঢ় সন্ধিবন্ধন না থাকিলে ক্ষয়যুক্ত বিজিগীষু রাজাকে শত্রুরাজগণই অভিভূত করিয়া ফেলিবে।

যখন বিজিগীষু রাজা সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুইটি গুণের যে কোন গুণের প্রয়োগে নিজের বৃদ্ধিরূপ ফল সম্পাদনে অসমর্থ হইবেন—তখন বিজিগীষু নিজের বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য আসন অবলম্বন করিবেন। কৌঃ অঃ ৭ম অধিকরণের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে—উপেক্ষণং আসনম্ ইহার অর্থ শত্রুরাজার সহিত সন্ধি ও বিগ্রহাদি না করার নাম আসন। সন্ধি বিগ্রহাদি না করাতেই উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে সময়ে বিজিগীষু রাজা সন্ধি বা বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া নিজের বৃদ্ধি বা শত্রুর ক্ষয় ঘটাইতে অসমর্থ হন বিজিগীষু রাজা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে যদি বুঝিতে পারেন যে এই শত্রুর সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিলে আমার বৃদ্ধি বা শত্রুর ক্ষয় এই দুইটির একটিও হইবে না সেই সময়ে বিজিগীষু রাজা নিজের বৃদ্ধির জন্য—কোষ, দণ্ড, দুর্গাদির বন্ধনের জন্য আসন অবলম্বন করিবেন—সন্ধিও করিবেন না বিগ্রহও করিবেন না, কেবল অবসর প্রতীক্ষা করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন। যাহাতে নিজের বৃদ্ধি বা শত্রুর ক্ষয় সম্ভাবিত নহে—তাদৃশ নিস্ফল সন্ধি ও বিগ্রহের প্রয়াস হইতে বিরত থাকিবেন। অবসরানুসন্ধানী বিজিগীষুরাজার নিজের কোষাদি বৃদ্ধিতে উদ্‌যুক্ত থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ না করিয়া অবস্থান করার নাম আসন।

যখন বিজিগীষু রাজা শত্রুর সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধও হইবেন তখনও বিজিগীষু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন না।

সন্ধি করিয়া বিজিগীষু সর্ব্বশক্তিতে নিজের বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করিবেন—অথবা গুপ্তঘাতক বা বিষাদি দ্বারা শত্রুর বধ করাইবেন এবং শত্রুরাজ্যে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ জনগণকে নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া শত্রুরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। বিজিগীষু রাজা শত্রুর সহিত কৃতসন্ধি হইলেও অন্য কোন প্রবল রাজার সহিত শত্রু রাজার যুদ্ধ ঘটাইয়া দিবেন এবং তাহাতে শত্রু দুর্ব্বল হইলে পূর্ব্বসন্ধির উচ্ছেদ করিয়া শত্রুকে আত্মসাৎ করিবেন।

বিজিগীষু রাজা প্রবল শত্রুর সহিত স্বীয় নিরাপত্তার জন্য সন্ধির অভিলাষী হইলেও যদি শত্রু নরপতি সন্ধি করিতে ইচ্ছুক না হয় তবে বিজিগীষু রাজা শত্রুমণ্ডলে ভেদ উৎপাদন করিয়া শত্রুনরপতিকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিবেন। শত্রু রাজার সহিত অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা তাহার প্রীতিভাজন হইয়া শত্রুর অমাত্যাদির মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করিয়া দিবেন—এইরূপে শত্রুমণ্ডলকে ভেদ দ্বারা জর্জ্জরিত করিয়া শত্রুনরপতিকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিবেন। এইরূপ নীতি প্রয়োগ বিজিগীষু রাজার বৃদ্ধির উপায়।

যে কোন রাজা বিগ্রহে উদ্‌যুক্ত হইতে পারেন না—হইলে সেই রাজাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন। বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন বিজিগীষু রাজাই শত্রুর সহিত বিগ্রহে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে বিজিগীষু রাজার অমাত্যবর্গ ও সেনাপতি প্রভৃতি অতিশয় সহিষ্ণু অর্থাৎ কোন রূপ দুঃখ ক্লেশ উপস্থিত হইলে স্বামিপক্ষ পরিত্যাগ করে না এবং যে বিজিগীষু রাজার অমাত্যবর্গের মধ্যে লোভ ভয়াদি দ্বারা শত্রুপক্ষ ভেদ উৎপাদন করিতে পারে না এবং যে বিজিগীষু রাজার অরণ্যে পর্ব্বতে অথবা দুর্লঙ্ঘ্য জলময় প্রদেশে সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত আছে, তাদৃশ বিজিগীষু রাজাই শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। যে রাজার অমাত্যবর্গ কেবলমাত্র সুখলিপ্সু ক্লেশাসহিষ্ণু এবং শত্রুপ্রযুক্ত ভেদে জর্জ্জরিত এবং সুদৃঢ় দুর্গ প্রভৃতি আশ্রয় স্থান বিবর্জ্জিত, তাদৃশ বিজিগীষু

নরপতি শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিজিগীষু রাজা পূর্ব্বোক্ত গুণ সমন্বিত হইলেও শত্রুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, যদি শত্রু রাজাও বিজিগীষু রাজার মতই গুণ সম্পন্ন হয়। বিজিগীষু ও শত্রু উভয়েই তুল্য বল সম্পন্ন বলিয়া একজন আর একজনকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইলে রাজা আসন অবলম্বন করিবেন। এই সময় বিজিগীষু রাজা, শত্রুরাজার শত্রুমণ্ডলকে সহায়তা দ্বারা উৎসাহিত করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করইবেন, ইহাকে "শ্বাবরাহ" কলহ বলে। ব্যাধ যখন বরাহকে বধ করিতে অসমর্থ হয় তখন বরাহের বধের জন্য ব্যাধ কুকুরকে শুকরবধের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া থাকে। শুকরের সহিত কুকুরের যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। তখন ব্যাধ মনে করে—এই যুদ্ধে যদি শূকর নিহত হয়—অথবা যদি কুকুর নিহত হয়, উভয় পক্ষেই আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে অর্থাৎ বরাহ ও কুকুর উভয়ই ব্যাধগণের ভক্ষ্য। এইরূপ বিজিগীষু রাজাও স্বয়ং শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইলে শত্রুর শত্রুমণ্ডলকে উদ্দীপ্ত করাইয়া "শ্বাবরাহ" কলহের ব্যবস্থা করাইবেন—আর এই সময় আসনাবলম্বী বিজিগীষু রাজা নিজের দুর্গ, সেতু, বণিক্ পথ, সৈন্যসংগ্রহ, দ্রব্যসংগ্রহ, হস্তিবন হইতে হস্তিসংগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা নিজের বর্দ্ধন করিবেন।

মনু ৭ম অধ্যায়ে ১৫৪ শ্লোকে রাজার স্বশক্তি বর্দ্ধনের জন্য যে অষ্টবিধ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন—আসনাবলম্বী রাজা শত্রুর সহিত "শ্বাবরাহ" কলহের ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য সেই অষ্টবিধ কর্ম্মের বিশেষভাবে ব্যবস্থা করিবেন।

বিজিগীষু রাজা স্বকীয় সম্পৎ ও বলাদির বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত থাকিলে বিজিগীষু রাজার প্রচেষ্টা দ্বারাই যদি শত্রু আনত হইয়া পড়ে, তবে আর সেই শত্রুর প্রতি বিগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন না। যে রাজার মন্ত্রণাসাধ্য প্রজ্ঞাবল, ধনবল ও সেনাবল নাই, এই ত্রিবিধবল শূন্য নরপতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ শত্রুরাজগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ বল বিবর্দ্ধনে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত নরপতির নিকটে শত্রুরাজা স্বভাবতঃই আনত হইয়া থাকেন এবং এই ত্রিবিধ বলবর্দ্ধনে উদাসীন নরপতি স্বভাবতঃই শত্রুদ্বারা কবলিত হইয়া থাকেন। এইজন্য বিজিগীষু নরপতি স্বীয় ত্রিবিধ বলবর্দ্ধনে উদ্যুক্ত থাকিয়া শত্রুগণকে আনত রাখিবেন।

যে বিজিগীষু রাজা শত্রুর উচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিবেন—এইরূপ বিজিগীষু রাজার কার্য্যগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—শত্রুর দুর্গাদি কর্ম্মের উপঘাত এবং শত্রু কর্ত্তৃক উপঘাতের নিবারণের জন্য স্বকীয় দুর্গাদি কর্ম্মের রক্ষা। বিজিগীষু রাজা যখন স্বকীয় বলবর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকিবেন কখন শত্রু কর্ত্তৃক স্বকীয় দুর্গাদির উপঘাতের নিবারণের জন্যও সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা রাখিবেন—আর যখন বিজিগীষু রাজা দেখিবেন যে স্বীয় সামর্থ্য দ্বারা স্বীয় রাষ্ট্র দুর্গাদির রক্ষাও করিতে পারিতেছেন না এবং শত্রুরাষ্ট্রে দুর্গাদির উপঘাতেরও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, তখন বিজিগীষু রাজা অন্য প্রবল নরপতিকে আশ্রয় করিবেন। অন্য নরপতিকে আশ্রয় করিতে হইলে বিজিগীষু রাজা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে যাহাকে আশ্রয় করিলে বিজিগীষু রাজা ক্ষয় হইতে স্থান ও স্থান হইতে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারেন। বিজিগীষু রাজা যাহাকে আশ্রয় করিবেন তিনিও বিজিগীষু রাজার শত্রুই বটেন—কিন্তু সাক্ষাৎ অভিযোক্তা শত্রু হইতে অর্থাৎ আক্রমণকারী শত্রু হইতে এই আশ্রয়ণীয় শত্রু ভিন্নরূপ। এই আশ্রয়ণীয় শত্রু সাক্ষাৎ আক্রমণকারী নহে অথচ বিশিষ্ট বলশালী। এই বিশিষ্ট বলশালী শত্রুও আক্রমণকারী শত্রু-হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কখনও আশ্রয়ণীয় হইয়া থাকে। যাহার আশ্রয় লাভ করিয়া বিজিগীষু ক্ষয় হইতে স্থান হইতে স্থান, স্থান হইতে বৃদ্ধিলাভে সমর্থ হইবেন এমন বিশিষ্ট বলসম্পন্ন অথচ অনাক্রমণকারী শত্রুকে আশ্রয় করিবেন।

বিজিগীষু রাজা যুগপৎ বহুশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে বিজিগীষু রাজা স্বীয় বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কোন শত্রুর সহিত সন্ধি এবং কোন শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহার সহিত সন্ধি করিলে বা যাহার সহিত বিগ্রহ করিলে বিজিগীষু রাজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তদনুসারে সন্ধি করিলে বা যাহার সহিত বিগ্রহ করিলে বিজিগীষু রাজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তদনুসারে সন্ধি ও বিগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। কাহারও সহিত সন্ধি করিয়া কাহারও সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়াকে দ্বৈধীভাব বলা হয়।

বিভীষণ সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি বর্ণনা করিয়া বিজিগীষু রাজার কর্ত্তব্য কি তাহা অতি সুস্পষ্টভাবে মন্ত্রণা সভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিজিগীষু রাজার কর্ত্তব্য নীতিশাস্ত্রানুসারে নির্দ্দেশ করিয়া বিজিগীষু রাজার যে সমস্ত গুণ থাকিলে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সমর্থ হয় তাহার প্রায় কোন গুণই রাক্ষস রাজের নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য বিভীষণ এই মন্ত্রণা সভাতে রাক্ষসরাজকে বলিয়াছিলেন,—যে রাজার প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ নাই সেই রাজা প্রজাগণের বিদ্বেষের পাত্র বলিয়া দুর্ব্বল। রাক্ষসরাজ প্রজাগণের অতিশয় পীড়ক বলিয়া রাক্ষসরাজ প্রজাগণের বিরাগভাজন হইয়াছেন—রাজমণ্ডলও রাক্ষসরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ। যে বিজিগীষু রাজার প্রতি রাজমণ্ডল ক্রুদ্ধ তাহার কল্যাণ লাভ হইতে পারে না। স্বর্গরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি মণ্ডলাধিপগণ, রাক্ষসরাজের ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

রাক্ষসরাজ যে শত্রু রামের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছেন—সেই রামের প্রতি লোকসমূহ অনুরক্ত এবং রাজমণ্ডলও সন্তুষ্ট সুতরাং বিজিগীষু ও শত্রুর গুণ বিবেচনা করিলে রাক্ষসরাজ দুর্ব্বল ও রাম প্রবল। যদি মনে করা যায় প্রতাপশালী বিজিগীষু নরপতি, স্বীয় প্রতাপ দ্বারাই সর্ব্ববিধ ন্যূনতার সমীকরণে সমর্থ এবং শত্রুকেও আনত করিতে সমর্থ, রাক্ষসরাজের এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই, কারণ রাক্ষসরাজের পরম সুহৃৎ বানররাজ বালী—রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং রাক্ষসরাজের পরমশত্রু সুগ্রীব, কপিরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। বালীর মৃত্যু ও সুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্তি দ্বারা—রাক্ষসরাজের ভাবী কল্যাণসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে।

এক সময়ে রাক্ষসরাজের জগদ্ব্যাপী প্রতাপ ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ তাড়কার বিনাশ, সুবাহু মারীচ প্রভৃতির বিনাশ ও খর, দূষণ প্রভৃতির বিনাশে রাক্ষসরাজের প্রতাপ প্রাকার পরিবেষ্টিত লঙ্কানগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। বলিতে কি এই লঙ্কানগরীতেও রাক্ষসরাজের প্রতাপ অতিমাত্র ক্ষুণ্ন হইয়াছে—লঙ্কাদহন, কুমারঅক্ষের বিনাশ, অশোক বনিকার উচ্ছেদ প্রভৃতিদ্বারা লঙ্কানগরীতেও রাক্ষসরাজের প্রতাপ অব্যাহত নাই। মন্ত্রণা সভাতে আহূত হইয়া বিভীষন স্বপক্ষের দুর্ব্বলতা ও শত্রুপক্ষের প্রবলতা প্রদর্শন করিয়া প্রবলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে অকর্ত্তব্য ইহা বলিয়াছেন। সম্প্রতি রাক্ষসরাজের দুর্ব্বলতার স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া রামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অসঙ্গত ইহাই বলিতেছেন। রাজনীতি শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে মহীপতি অরিষড়্বর্গ ত্যাগদ্বারা ইন্দ্রিয়জয় করিবেন, অজিতেন্দ্রিয় নরপতি কখনও রাজপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষ এই ছয়টিকে অরিষড়্বর্গ বলে। এইরূপ বিদ্যাবৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা ও সহচর্য লাভ করিয়া মহীপতি প্রজ্ঞার বৃদ্ধি করিবেন। চারবর্গ অর্থাৎ গূঢ়পুরুষগণকে রাজা চক্ষুরূপে গ্রহণ করিবেন। গূঢ়পুরুষগণের দ্বারাই রাজা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র অবলোকন করিয়া থাকেন। উত্থানের দ্বারা নরপতি যোগক্ষেম সম্পাদন করিবেন। প্রযত্নের সহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানকেই উত্থান বলা হয়। এবং নানাবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুশাসনের দ্বারা রাষ্ট্রে ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিবেন। এই কার্য্য এইরূপে করিতে হইবে এইরূপ আজ্ঞাপনকেই অনুশাসন বলা হয়। এবং অর্থসংযোগ দ্বারা নরপতি লোকপ্রিয় হইবেন।

কোন স্থান হইতে অর্থের গ্রহণ এবং কোন স্থানের অর্থের অর্পণকেই অর্থসংযোগ বলা হয়। এই সমস্ত কার্য্য রাজার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কিন্তু রাক্ষসরাজ কামাদি অরিষড়্বর্গের বশ্য। রাক্ষসরাজ অরিষড়্বর্গ জয় ত

করেনই নাই প্রত্যুত অরিষড়্বর্গের দ্বারা জিত হইয়াছেন। ইঁহার অমাত্যবর্গ মূঢ়বুদ্ধি রাজনীতিশাস্ত্রে জ্ঞানহীন—ইঁহার মিত্র বলিয়া কেহই নাই। রাক্ষসরাজের দুর্নীতিতে অপর রাজবৃন্দ সকলেই ইঁহার শত্রুস্থানীয় হইয়াছে। এজন্য রাক্ষসরাজ শত্রুপরিবেষ্টিত। পক্ষান্তরে আমাদের শত্রু রাম, অরিষড়্বর্গকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার অমাত্যবর্গ রাজনীতি শাস্ত্রবিৎ এবং মিত্রসমন্বিত এক রাক্ষসরাজ ভিন্ন তাঁহার আর কেহ শত্রু নাই। এজন্য রাম প্রবল—রাক্ষসরাজ দুর্ব্বল। প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিগ্রহ, হস্তীর সহিত পাদিয়া যুদ্ধ করার সমান। যে হস্তীর সহিত পাদযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য আমি মনে করি উপস্থিত ক্ষেত্রে রামের সহিত আমাদের সন্ধি বন্ধনপূর্ব্বক আনত হওয়াই সঙ্গত। রামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

রামের সহিত আমাদের সন্ধি অনায়াসেই হইতে পারে—নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"উত্তপ্তং উত্তপ্তেন সংবধাতে"। দুই খণ্ড লৌহ অতপ্ত অবস্থায় সংবদ্ধ হইতে না পারিলেও অতিউত্তপ্ত লৌহখণ্ডদ্বয়কে অনায়াসেই পরস্পর সংবদ্ধ করিতে পারা যায়। রাম সীতাবিয়োগে সন্তাপযুক্ত হইয়াছেন—আমরাও খর দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি বান্ধবগণের বিনাশে এবং হনূমান্ কর্ত্তৃক কুমার অক্ষের বিনাশে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াছি। আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবর্গ, রাম ও হনূমান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তাহারা সকলেই আমাদের অতিমাত্র অন্তরঙ্গ ছিল। আমরা উভয় পক্ষই সন্তপ্ত বলিয়া উত্তপ্ত লৌহখণ্ডদ্বয়ের মত আমাদের উভয়পক্ষের মিলন অনায়াস সাধ্য। আমি মনে করি সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেই আমাদের উভয়পক্ষের দৃঢ়সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে। সীতা প্রত্যর্পণই সন্ধি স্থাপনের প্রকৃষ্ট পথ।

রামের দুর্ব্বার তেজঃ আমরা সকলেই অবগত হইয়াছি। রামের এই দুর্ব্বারতেজঃ সীতার বিয়োগে অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। আমাদের শত্রুপক্ষীয় ইন্দ্রপ্রভৃতি দেববৃন্দ, রামের এই তেজকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। স্বীয় পরাক্রমে দৃঢ়বিশ্বাস সম্পন্ন রাম, আমাদের সহিত যুদ্ধে কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না।

এই জন্য আমরা যদি সাম প্রয়োগ করিয়া সীতা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করিতে উদ্‌যুক্ত হই, তবে জল সেচনে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয় এইরূপ রামেরও দুর্ব্বারতেজঃ শান্ত হইবে। শত্রু পক্ষের প্রবলতা, ও আমাদের পক্ষের দুর্ব্বলতা, আমি বিশেষভাবে দেখাইয়াছি। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে আমরা উভয় পক্ষই সমান, আমরা শত্রু হইতে দুর্ব্বল নহি, তথাপি সমান বল সম্পন্ন মহীপতির সহিত সন্ধিই সঙ্গত, বিগ্রহ সঙ্গত হইতে পারে না।

সমান বলসম্পন্ন নরপতিদ্বয় যুদ্ধে লিপ্ত হইলে উভয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন দুইটি মৃৎকুম্ভ পরস্পর অভিহত হইলে উভয় কুম্ভই বিনষ্ট হইয়া থাকে—এইরূপ সমানবল নরপতিদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে উভয়েই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের শত্রু রাম অতিশয় বিক্রমযুক্ত এবং তাঁহার অনুযায়িবৃন্দ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবমণ্ডলও তাঁহার সহায়ক। আর রাক্ষসরাজের অগণ্য শত্রু এবং সেই শত্রুমণ্ডল অতিশয় বলবান্। সুতরাং মিত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত প্রভূত শক্তিশালী রামের সহিত বহুশত্রু বেষ্টিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ, কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সমান বল সম্পন্ন বা অধিক বল সম্পন্ন নরপতির সহিত সন্ধিই করিবে কখনও বিগ্রহ করিবেন না।

হীনশক্তি সম্পন্ন নরপতির সহিতই বিগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহাই রাজনীতিবিৎ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রশক্তি প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তি—এই ত্রিবিধশক্তিযুক্ত নরপতিকেই অধিক বলশালী বলা হয় এবং ত্রিবিধশক্তির যে কোন একটি বা দুইটি শক্তি অল্প হইলে সেই নরপতিকে হীনশক্তি বলা হয়। জ্ঞানবলকেই মন্ত্রশক্তি বলা হয়। কোষ এবং দণ্ডবলকেই প্রভুশক্তি বলা হয়। বিক্রমবলকে উৎসাহশক্তি বলা হয়। যদি

রাক্ষসরাজ এরূপ মনে করেন যে—রাক্ষসরাজের কোষ ও দণ্ডবল অর্থাৎ প্রভুশক্তি প্রচুর, অগণিত চতুরঙ্গ সেনা এবং সুবর্ণরজতাদি ধন রাক্ষসরাজের প্রচুর আছে যাহা শত্রুপক্ষের নাই সুতরাং হীনশক্তি শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই ত উচিত। ইহাতেও আমার বক্তব্য এই যে—রামের প্রভূত বিক্রম এবং তাঁহার সুগ্রীব, হনূমান্ প্রভৃতি মিত্রবর্গের পরাক্রম আমরা অবগত হইয়াছি এজন্য যুদ্ধে জয় ও পরাজয় কোন্ পক্ষে ঘটিবে তাহা অনিশ্চিত। যদি বহু প্রয়াসে আমাদের জয়লাভও হয় তাহাতে আমাদের কি লাভ হইবে ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের শত্রু প্রচুর ধন সম্পন্ন নহে এবং কোন বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারীও নহে। সুতরাং আমরা বহুক্ষয় স্বীকার করিয়া জয় লাভ করিলেও সেই জয়দ্বারা আমাদের কোন কল্যাণ হইবেনা। আমাদের ক্ষয়পূরণের কোন সম্ভাবনা থাকিবেনা। আর যদি আমরা পরাজিত হই, তবে আমাদের সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমাদের যে সুপ্রচুর কোষ ও দণ্ডবল, তাহা সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ দারুণ সন্দিগ্ধস্থলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না।

আরও বিশেষ কথা এই যে—যে অভিমানসম্পন্ন নরপতি কোন বিশেষ অভ্যুদয়লাভে সমর্থ হন নাই, কেবলমাত্র ক্লেশ পরম্পরার মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, যাঁহার ভৃত্যবর্গ দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেছে, নিজেও কোন সম্পদের অধিকারী হইতে পারেন নাই—তাদৃশ নরপতি, সংশয়িত অর্থেই যত্নবান্ হইতে পারেন। যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত হইলেও সমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে লিপ্ত পারেন। কিন্তু যে নরপতি রাক্ষসরাজের মত কৃতার্থ, যাহার সম্পৎ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাদৃশ নরপতির কখনও সংশয়িত অর্থে যত্নশীল হওয়া উচিত নহে। রাক্ষসরাজ সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ, তিনি অকারণ এই সন্দিগ্ধ শুষ্কবিগ্রহে লিপ্ত হইবেন কেন? যে নরপতির প্রতি রাজলক্ষ্মী বিমুখ তাদৃশ নরপতিই এতাদৃশ শুষ্ক বিগ্রহে যত্নশীল হইয়া থাকেন। আরও বিশেষ কথা এই যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নরপতিগণের ইহা বিশেষভাবে নিরূপণ করা উচিত যে—যে যুদ্ধে আমি লিপ্ত হইতে যাইতেছি তাহা আমি সুসম্পন্ন করিতে পারি।

এই কার্য্য আমার অসাধ্য নহে এবং এই যুদ্ধে কোন দোষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই যুদ্ধ সংঘটিত হইলে রাজমণ্ডলের মধ্যে কোনরূপ ক্ষোভ উৎপন্ন হইবে না। রাজমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও তাহা ক্ষয়েরই কারণ হইয়া থাকে। আরও বিশেষ কথা এই যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি সেই যুদ্ধ দ্বারা ক্ষয় পূরণ করিয়া নিশ্চিত লাভের সম্ভাবনা থাকে তবেই তাদৃশ যুদ্ধে নরপতিগণের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আরও কথা এই যে—যুদ্ধ সংঘটিত হইলে তাহা সহজে সমাপ্ত হইবে না। যদি দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্য এবং যুদ্ধ চালাইয়াও তাহা পরিসমাপ্ত করিবার মত সামর্থ্য থাকে, তবেই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত। আরও বিশেষ কথা এই যে, যে নরপতির প্রকৃতিমণ্ডল অর্থাৎ অমাত্য রাষ্ট্র প্রভৃতি, যাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত তিনিই শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার প্রকৃতিবর্গ বিরক্ত, যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও তাহা পরিসমাপ্ত করিবার সামর্থ্য নাই এবং যুদ্ধে পরিসমাপ্ত করিলেও যদি যুদ্ধের ক্ষয়পূরণ না হয়, যদি রাজমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়, তবে তাদৃশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে রাজার বিনাশই হইয়া থাকে।

অসাধারণ উৎসাহ শক্তিসম্পন্ন রাজাকে পরাজিত করা সুকঠিন। এই রাম রাজনীতিশাস্ত্রে অত্যন্ত প্রবীণ, এইজন্য ইঁহার সহিত যুদ্ধে আমাদের সহসা জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই এবং এই যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আমাদেরও বহু ক্ষয়, বহু ধন ব্যয় ঘটিবে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আমাদের কোন রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে না। রাম কোন সুসমৃদ্ধ রাজ্যের অধিপতি নহেন। এই যুদ্ধে আমাদের বহু বন্ধুর বিনাশ ঘটিবে। সুতরাং এই যুদ্ধের সমাপ্তি আমাদের পক্ষে শুভ হইবে না। এজন্য রামের সহিত যুদ্ধের অভিলাষ পরিত্যাগ করা উচিত। প্রকৃতিবর্গ রামের অনুকূল এবং আমাদের প্রতিকূল।

আরও কথা রাম কর্ত্তৃক বালিবধ আমরা বিশেষ প্রণিধানের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। একমাত্র বালিবধের দ্বারাই রামের বহু লাভ ও রাক্ষসরাজের মহতী ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। রাজমণ্ডলের মধ্যে একমাত্র বালী রাক্ষসরাজের অসাধারণ মিত্র ছিল। বানররাজ সুগ্রীব রাক্ষসরাজের পরম শত্রু। বালীর মৃত্যুতে রাক্ষসরাজের মিত্র বিনষ্ট হইয়াছে এবং রাক্ষসরাজের পরম শত্রু সুগ্রীবকে রাম মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন।

একমাত্র সুগ্রীবকেই যে মিত্ররূপে লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, বানর রাজ সুগ্রীবের বিশালবাহিনী আজ রামের আজ্ঞাবহ হইয়াছে। সুতরাং এক বালিবধ দ্বারাই রাম প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছেন এবং আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি। যদি রাক্ষসরাজ এরূপ মনে করেন যে শত্রুপক্ষের ভেদ উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিব, তাহাও সম্ভাবিত নহে—কারণ রামের পরম সহায় কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত রামের ভেদ উৎপাদন করা অসম্ভব। কারণ ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত ও অপমানিত এই চারি প্রকার ব্যক্তির প্রতিই ভেদনীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কপিরাজ সুগ্রীব রামের সহায়তার জন্য রামের সহিত মিলিত হইয়াছে। রামের অনুগ্রহেই কপিরাজ সুগ্রীব কপিরাজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছে। সুগ্রীব কোন লোভবশতঃ রামের সহায়তায় প্রবৃত্ত হয় নাই, রামের সহিত সুগ্রীবের দৃঢ়মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় রামের নিকট হইতে সুগ্রীবের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। রামের কার্য্যে সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রামের প্রতি ক্রুদ্ধ নহে। রাম কর্ত্তৃক সুগ্রীব উপকৃত হইয়াছে সুতরাং রাম কর্ত্তৃক সুগ্রীব অপমানিত নহে। এই সুগ্রীবের প্রতি ভেদ প্রয়োগ করিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে। সুগ্রীব যে রামের সহায়তা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ প্রত্যুপকার।

রাম সুগ্রীবের যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকার করিবার জন্যই সুগ্রীব রামের সহিত মিলিত হইয়াছে। উপকারীর প্রত্যুপকার করাই সজ্জনের রীতি। এই সজ্জনরীতি অনুবর্ত্তনের জন্যই সুগ্রীব রামের সহিত মিলিত হইয়াছে। কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ভেদ প্রযুক্ত হইতে না পারিলেও নীল, কুমুদ প্রভৃতি কপিমুখ্যগণের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনাও নাই। কোন্ লোভে নীল, কুমুদ প্রভৃতি কপিমুখ্যগণ রাম ও সুগ্রীবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাবণের পক্ষ সমর্থন করিবে? এই কপিমুখ্যগণ ফলমূলভোজী বলিয়া ইহারা কোন মিষ্টান্নাদির অপেক্ষা রাখে না। অরণ্য নির্ঝরকুঞ্জ প্রভৃতিতে বাস করে। ইহারা রম্য প্রাসাদাদিতে বাস করে না। এজন্য রম্য প্রাসাদাদির অপেক্ষা ইহাদের নাই। ইহারা বানরজাতি এজন্য শ্রেষ্ঠ রমণীগণের ইহারা অপেক্ষা রাখে না, কোন ধন রত্নের অপেক্ষা ইহারা করে না, সুতরাং বহুধন প্রদান করিলেও ইহারা রাম বা সুগ্রীবের পক্ষ ত্যাগ করিবে না।

মহারাজ বালীর পুত্র অঙ্গদের প্রতিও ভেদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদিও বানররাজ বালী রাক্ষসরাজের পরম মিত্র ছিলেন, অঙ্গদ তাঁহারই পুত্র তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাতে অঙ্গদ রাবণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না। কারণ সুগ্রীবও অঙ্গদের মাতা তারার অত্যন্ত অনুগত। এই সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছে এবং অঙ্গদের প্রতি সুগ্রীব পুত্রবৎ স্নেহ রক্ষা করে। সুতরাং এ অবস্থায় অঙ্গদ কখনও সুগ্রীবকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসরাজের সহায়তা করিতে পারে না সুতরাং শত্রুপক্ষে ভেদ প্রয়োগের কোন অবকাশ নাই।

যদি মনে করা যায় কোন প্রবলতর নরপতির সহায়তা লাভ করিয়া আমরা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি তাহাও সম্ভাবিত নহে। কারণ রাম অপেক্ষা প্রবল বা রামের সমান বিক্রম সম্পন্ন কোন নরপতি দেখা যায় না। যদি দেখা যাইত তবে তাহার সহায়তা আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম। যদি মনে করা যায় ভগবান্ ব্রহ্মা, রাবণকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার অনুগ্রহে রাবণের এই অসাধারণ বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে, সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মার সহায়তা অবশ্যই পাইব এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। কারণ ভগবান্ ব্রহ্মা

রাবণকে দুর্লভ বর প্রদান করিয়া নিজেই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মাই মনে করিতেছেন—রাবণের বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আমি কি দুষ্কর্ম্মই না করিয়াছি। সুতরাং ব্রহ্মার সহায়তা লাভ সম্ভাবিত নহে।

ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ যদিও বিক্রমশালী বটে কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের শত্রুতা পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সহায়তাও পাওয়া সম্ভব নহে। যদি মনে করা যায় রাম কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আমরা এই লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘকাল সুখে বাস করিতে পারিব, আমরা দুর্গ আশ্রয় করিলে শত্রু আমাদের কিছু করিতে পারিবে না এইরূপও সম্ভাবিত নহে। কারণ শত্রু আমাদিগকে দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিলেও আমাদের এমন কোন মিত্রপক্ষ নাই যাহারা অবরোধকারী শত্রুর পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিয়া শত্রুকে বিপন্ন করিতে পারে।

আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিলে অবরোধকারী শত্রুর পশ্চাৎভাগ হইতে আমাদের মিত্রপক্ষীয় রাজগণ শত্রুকে আক্রমণ করিলে শত্রু বিপন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু শত্রুর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবার উপযুক্ত কোন মিত্ররাজ আমাদের নাই। এই জন্য আমরা দীর্ঘকাল দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া কেবলই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিব তাহাতে শত্রুর কোন হানি হইবে না।

যে শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতে চাহিতেছে তাহাদের কোন সমর সম্ভারের প্রয়োজন হয় না। এইজন্য দীর্ঘকাল অবরোধ করিলেও তাহাদের সমর সম্ভারের অল্পতা ঘটিবে না এবং অন্য কোনরূপ হানিও হইবে না।

এই বানরবাহিনী বৃক্ষ প্রস্তরাদির সাহায্যেই যুদ্ধ করিয়া থাকে। বৃক্ষ প্রস্তরাদির অভাব কখনও ঘটিবে না। ইহাদের অন্নপানেরও অল্পতা ঘটিবে না। কারণ ইহারা সাধারণ জলমাত্র পান করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মদ্যাদি ইহাদের পেয় নহে। যুদ্ধের জন্য যেমন ইহাদের শস্ত্র যন্ত্রাদি লাগে না, সেইরূপ পানের জন্য শ্রেষ্ঠ মদ্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। ইহারা ফলমূল মাত্র আহার করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পলান্ন প্রভৃতি আহার করে না। মাংস, ঘৃত প্রভৃতি বস্তুর ইহাদের প্রয়োজনীয়তা নাই। ইহারা পাদচারে যুদ্ধ করে, হস্তী অশ্বাদিরও অপেক্ষা নাই।

ইহাদের কোন সুসমৃদ্ধ রাজ্য নাই, আর ইহাদের রাষ্ট্রবাসী জনগণের রক্ষা করিবারও কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং এই শত্রু সুদীর্ঘকাল অবরোধ করিলেও শত্রুর কোন হানি হইবে না, কেবল আমরাই অবরুদ্ধ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইব। সুতরাং শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। আমার মতে অবিলম্বে শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসরাজ অবিলম্বে শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন করুন, অন্য কোন উপায় নাই। যদি রাক্ষসরাজ নীতিবিগর্হিত পথে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন তবে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

যখন মন্ত্রণা সভাতে বিভীষণ নীতিশাস্ত্রানুসারে তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন এবং রাক্ষসরাজের মাতামহ মাল্যবান্‌ও এই সভাতে সন্ধি করিবার জন্যই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন সেই সভাতে উপস্থিত রাক্ষসরাজের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসরাজকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—মন্ত্রণা সভায় আলোচ্যমন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ আছে; পঞ্চাঙ্গযুক্ত মন্ত্রণাই নরপতিগণের কল্যাণ লাভের মূল। এই পাঁচটি অঙ্গ—১। কর্ম্মের আরম্ভের উপায়। ২। পুরুষ দ্রব্যসম্পৎ। ৩। দেশকাল বিভাগ। ৪। বিনিপাত-প্রতিকার ও ৫। কার্য্যসিদ্ধি।

ভট্টিকাব্যে কুম্ভকর্ণের উক্তিতে ভট্টিকবি যে পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রণার কথা বলিয়াছেন এই পাঁচটি অঙ্গ কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের ১ম অধিকরণের একাদশ প্রকরণে অতিবিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভট্টিকবি তাহা

হইতেই মন্ত্রণার এই পাঁচটি অঙ্গ দেখাইয়াছেন। মন্ত্রণার প্রথম অঙ্গ কার্য্যের আরম্ভোপায়। ইহার অর্থ এই যে রাজা স্বকীয় রাষ্ট্রে পরিখা, প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও পূর্ব্বনির্ম্মিতের সংস্কার প্রভৃতির আলোচনা করিবেন। এবং শত্রুরাজ্যে সন্ধি বা বিগ্রহাদির জন্য দূত প্রেরণাদির চিন্তা করিবেন—ইহাই কার্য্যের আরম্ভোপায়। মন্ত্রণার এই প্রথম অঙ্গে আলোচ্য বিষয়গুলি প্রদর্শিত রূপ। দ্বিতীয়অঙ্গ—পুরুষদ্রব্যসম্পৎ — পুরুষসম্পৎ ও দ্রব্যসম্পৎ। রাজা স্বরাষ্ট্রে দুর্গসেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণকুশল শিল্পী প্রভৃতির এবং সেনাপতি সৈন্য প্রভৃতির এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণের উপকরণ কাষ্ঠ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিবেন এবং শত্রুরাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠানে কুশল দূত, সেনাপতি প্রভৃতির এবং স্বর্ণ রত্ন প্রভৃতি দ্রব্যের বিষয় চিন্তা করিবেন। এবং স্বরাষ্ট্রের সহিত শত্রুরাষ্ট্রের পুরুষসম্পৎ ও দ্রব্যসম্পদের তুলনা করিয়া উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিবেন। তৃতীয় অঙ্গ—দেশকালবিভাগ। এই তৃতীয় অঙ্গেও মন্ত্রণার বিষয় এই যে—স্বরাষ্ট্র মধ্যে নূতন দুর্গাদি স্থাপন করিতে হইলে তাহা কি রাষ্ট্রের মধ্যে বা প্রান্তভাগে নির্ম্মাণ করিতে হইবে? এইরূপ সেতুপরিখাদির নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে। যে সমস্ত দুর্গাদির আরম্ভ করিতে হইবে তাহা কি আনূপদেশে অথবা জাঙ্গলদেশে অথবা সাধারণদেশে? এইরূপ কাল সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে যে—ইহা সুভিক্ষকাল অথবা দুর্ভিক্ষকাল। সুভিক্ষকালে কীদৃশ কার্য্য আরম্ভ করা যায় এবং দুর্ভিক্ষকালে কোন্ কোন্ কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এইরূপ শীত বর্ষাদিকালেরও বিবেচনা করিতে হইবে। কোন্ কার্য্য বর্ষা ঋতুতে, কোন্ কার্য্য শীত ঋতুতে আরম্ভ করা সুবিধাজনক। স্বরাষ্ট্র সম্বন্ধে যেরূপ এগুলি চিন্তা করিতে হইবে এইরূপ শত্রুরাষ্ট্র সম্বন্ধেও সন্ধি প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। শত্রুদেশ কিরূপ? তাহা কি প্রচুর শস্যসমন্বিত উর্ব্বরা ভূমি—অথবা মরুপ্রায় অনুর্ব্বরা ভূমি? শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যে কোন্ অংশ সমৃদ্ধ এবং কোন্ অংশ অসমৃদ্ধ।

সন্ধি প্রভৃতির দ্বারা শত্রুর কোন্ রাজ্যাংশ গ্রহণ করিলে আমাদের বৃদ্ধি হইবে এবং কোন্ রাজ্যাংশ গ্রহণ করিলে আমাদের বিশেষ কোন লাভ হইবে না। শত্রুরাষ্ট্র আক্রমণে কোন্ কাল অনুকুল কোন্ কাল প্রতিকূল ইহা আলোচনা করিতে হইবে। মন্ত্রণার এই তৃতীয় অঙ্গে প্রদর্শিত রূপ আলোচ্য বিষয় থাকিবে। মন্ত্রণার চতুর্থ অঙ্গ—বিনিপাত প্রতিকার। বিনিপাতশব্দের অর্থ বিঘ্ন, ক্ষতি প্রভৃতি। তাহার প্রতিকারচিন্তা। স্বরাষ্ট্রে যে সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে, তাহাতে যে সমস্ত বিঘ্ন ও ক্ষতি ঘটিবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থার চিন্তা করিতে হইবে এবং সন্ধি প্রভৃতি বিষয়েও যে সমস্ত বিঘ্ন বা ক্ষতির উৎপত্তি হইবে তাহার প্রশমনের ব্যবস্থা। পঞ্চম অঙ্গ—কার্য্যসিদ্ধি। কার্য্যের সিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মের ফল। আরব্ধ কর্ম্মের ফল তিন প্রকার—ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধি। যে অবস্থায় স্থিত থাকিয়া রাজা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাতে যদি স্থিত অবস্থা হইতেও হীন অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তাহার নাম ক্ষয় এবং যে অবস্থায় স্থিত থাকিয়া কর্ম্মের আরম্ভ করা হইবে আরব্ধ কর্ম্মদ্বারা যদি তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি বা ক্ষয় না হয়, তবে তাহার নাম স্থান। আর যে অবস্থায় কর্ম্ম আরব্ধ হইবে সে অবস্থা অপেক্ষা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বৃদ্ধি বলা যায়। ক্ষয়স্থিত পুরুষ স্থানের জন্য এবং স্থানস্থিত পুরুষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করিবে। ইহার নাম কার্য্যসিদ্ধি। কামন্দকনীতির একাদশ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকে পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি উপলব্ধ কামন্দকের বাক্যটি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দ্বাদশ শ্লোকের টীকাতে মল্লিনাথ এই কামন্দকের বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অতি অসম্পূর্ণ। মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ কি? তাহা আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিলাম। নীতিশাস্ত্রবিদ্ মহীপতি এই পঞ্চাঙ্গমন্ত্রের অবধারণ করিয়া যদি কাল দেশ অতিক্রম না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে তাঁহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী মন্ত্রণা সভায় কুম্ভকর্ণ রাবণকে ইহাই বলিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ বলিয়াছেন যে, বিজিগীষু নরপতি পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র অবধারণ করিয়া যদি তদনুসারে দেশ ও কাল অতিক্রম না করিয়া আরম্ভোপায় এবং মনুষ্যসম্পৎ, দ্রব্যসম্পৎ প্রভৃতি সম্পাদনপূর্ব্বক বিপৎপ্রতিকারে অবহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে অবশ্যই মন্ত্রণার ফল কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু যে নরপতি স্বীয় মূর্খতাপ্রযুক্ত নিজেকেই অসাধারণযোগ্য বলিয়া মনে করেন, অন্য কাহাকেও নিজের মত যোগ্য বলিয়া মনে করেন না তাদৃশ মানী মহীপতি মন্ত্রাঙ্গ দেশ ও কালের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিজের দুরভিমান প্রযুক্ত অদেশে ও অকালে কার্য্য আরম্ভ করিয়া মন্ত্রফল কিছুমাত্র লাভ করিতে পারেন না। রাক্ষসরাজও অতিমাত্র মানী। এই মানই রাক্ষসরাজের বিনাশের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়জয়-প্রকরণে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে—"মানাদ্ রাবণঃ পরদারান্ অপ্রযচ্ছন্ সবন্ধুরাষ্ট্রো বিননাশ"। কুম্ভকর্ণ মন্ত্রণা সভাতে ইহাই বলিয়াছেন যে যদি গগনমধ্যগত সূর্য্য তাহার উষ্ণতাও ত্যাগ করে, যদি চন্দ্রমা তাহার শৈত্যও ত্যাগ করে তথাপি ভুবনাবমানী রাবণ, তাঁহার নিজের মান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমার মত আর কেহ নাই এইরূপ দুরভিমানকেই মান বলা হয়। এই দুরভিমানই সমস্ত অনর্থের মূল। সুতরাং আমরা মন্ত্রণা সভায় সমবেত হইয়া যাহাই আলোচনা করিনা কেন তাহাতে রাক্ষসরাজের কোনই সহায়তা হইবে না। রাক্ষসরাজ আমাদের মন্ত্রণা কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। আমরা রাক্ষসরাজের বান্ধব, রাক্ষসরাজের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা বলিব তাহা সমস্তই রাক্ষসরাজকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইবে। রাক্ষসরাজ সর্ব্বত্রই প্রতিকূল চেষ্টাসম্পন্ন। আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। অনুপযুক্ত স্থানে আমাদের মন্ত্রালোচনাতে আমরাই অন্যের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। তথাপি আমরা রাক্ষসরাজের প্রতি অজ্ঞানপ্রসূত স্নেহপ্রযুক্ত উপযুক্ত পরামর্শদানে বিরত থাকিতে পারি না। এই রাক্ষসরাজ পরহিংসাদি ক্রূরকর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত, পরদার উপভোগ প্রভৃতি গ্রাম্যসুখেই ইঁহার অতিমাত্র আসক্তি। এই সমস্ত কার্য্য অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয়ের একমাত্র হেতু বলিয়া বিদ্বাগণ বলিয়াছেন। আর রাক্ষসরাজ এই সমস্ত অন্যায় কার্য্যেই একান্ত অনুরাগসম্পন্ন। সুতরাং রাক্ষসরাজের পতন যে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ হইবে প্রতিকূল আচরণকারী রাবণের নিকট কোন হিতের উপদেশই কার্য্যকর হইতে পারে না। তথাপি আমরা স্নেহপ্রযুক্ত যাহা অবশ্য করণীয় তাহার উপদেশ প্রদান করিব। রাবণের অনুগ্রহে আমরা যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছি তাহার প্রতিদানে আমরাও রাক্ষসরাজের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হইব। কুম্ভকর্ণ এই সমস্ত কথা বলিয়া আবার বলিয়াছিলেন—রাক্ষসরাজের প্রহস্ত প্রভৃতি সেনাপতিগণ যে সমস্ত মিথ্যা ও দুর্নীতিসম্পন্ন বাক্যের দ্বারা রাক্ষসরাজকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে এবং বিভীষণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সুসঙ্গত হইয়াছে। এই মন্ত্রণাসভাতে বিভীষণ ও রাবণ মাতামহ মাল্যবান্ রামের সহিত সন্ধি করাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রণাসভাতে রাজনীতিবিদ্ বিভীষণ, মাল্যবান্, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রামের সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেই বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন এবং প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসবৃন্দ, রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে অতিমাত্র উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

নীতিবিদ্গণের সৎপরামর্শ উপেক্ষা করিয়া রাবণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং স্বপক্ষের বহু ক্ষয় হওয়ায় ভীত হইয়া নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। জাগ্রত হইয়া কুম্ভকর্ণ রাক্ষসরাজের সভায় উপনীত হইয়া রাক্ষসরাজকে বলিয়াছিলেন হে রাক্ষসরাজ! আমরা পূর্ব্বে মন্ত্রণাসভায় সম্মিলিত হইয়া আপনাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলাম আপনি তাহার কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই, আজ তাহারই এই বিষময় ফল উপস্থিত হইয়াছে। আপনি নীতিবিদ্—প্রাজ্ঞজনের বাক্য অবমাননা করিয়াছেন এবং মূর্খজনের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আপনি রাজনীতি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন বটে কিন্তু নীতিশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আপনার নাই। আপনার মূর্খ মন্ত্রিমণ্ডল আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করিয়াছে। তাহারা স্বীয় মূর্খতা প্রযুক্ত আপনাকে এই দারুণ যুদ্ধে লিপ্ত করাইয়াছে। আমাদের মাতামহ মাল্যবান্ মন্ত্রণাসভাতে অতিসদ্যুক্তিপূর্ণ উপদেশ করিলেও আপনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সমস্ত বিষয়েই আপনার প্রমাদিতা সুস্পষ্ট। আপনি কোন মন্ত্রণা না করিয়াই অতি প্রবলপ্রতাপ রামের পত্নীকে হরণ করিয়াছেন। বিভীষণ, মাল্যবান্ প্রভৃতি নীতিবিৎ আপ্তমন্ত্রিগণ বহু নিষেধ করিলেও আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। আপনি নিজের দোষসমূহ কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। আজ তাহার

বিষময় ফল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে মোহগ্রস্ত হওয়াও বৃথা, ক্রোধ করাও বৃথা। আমরা পূর্ব্বে মন্ত্রণাসভাতে যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম আপনি অতিমাত্র মান প্রযুক্ত তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং আপনি সেই সন্ধির কালও লঙ্ঘন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্ধির আর অবসর নাই। আপনি আমাদের পরমবান্ধব মহাবীর রাক্ষসগণকে বধ করাইয়াছেন এবং সঞ্চিত রাজকোষকে বিনষ্ট করাইয়াছেন। রাক্ষসরাজের প্রচণ্ড তেজস্বিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম হয়ত যুদ্ধের পূর্ব্বে সীতা প্রত্যর্পণ করিলে সন্ধি করিতে সম্মত হইতেন কিন্তু আজ রাক্ষসরাজের সেই প্রচণ্ড তেজঃ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। অকারণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কোষ ও সৈন্যবল বিনাশ করা হইয়াছে। এজন্য রাক্ষসরাজ অতিবিপন্ন, দুর্ব্বলশত্রুর সহিত কেহই সন্ধি করিতে সম্মত হইতে পারে না। যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইয়াছি ইহাতে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। এই সমস্ত কথা বলিয়াও রাবণ-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, রাবণের প্রতি স্নেহাতিশয্যবশতঃ যুদ্ধে যোগদান করিয়া নিহত হইয়াছেন।

আমরা ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ ও পঞ্চদশ সর্গ হইতে যে সমস্ত দণ্ডনীতির আলোচনা প্রদর্শন করিলাম এই সমস্ত আলোচনার মূল রামায়ণে আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। রামায়ণে যে সমস্ত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাই মহাকবি ভট্টি স্বীয়কাব্যে পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করিয়াছেন। রামায়ণের বহু অংশ ভট্টি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কবি কৃপণতা করেন নাই। ভট্টিকাব্যের এই আলোচনা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবি ভট্টির সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণ কেবলমাত্র বিলাসব্যসনে মগ্ন হওয়াকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন না। সাম্রাজ্যরক্ষায় অতিমাত্র উদ্‌যুক্ত আর্য্যগণ কোন অবস্থাতেই দণ্ডনীতির আলোচনাকে উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। আর্য্যজাতির ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে অন্য সমস্ত বিষয়ে যেমন অবসাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে রাজ্যরক্ষা বিষয়েও সেইরূপ উদাসীনতাই ঘটিয়াছে। তাহারই ফলে, পরবর্ত্তী কাব্যসমূহে দণ্ডনীতির আলোচনা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভারতের কবি হইতে গেলেও যে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের পরিজ্ঞান আবশ্যক ইহা আজ আমাদের স্বপ্নেরও অতীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য দর্শন এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রেও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য অতিমাত্র উৎসাহ দেখা যায়। কিন্তু অধঃপতিত ভারতে কাব্য হইতে রাষ্ট্র রক্ষার কথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। জনসাধারণকে রাষ্ট্ররক্ষা বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা কবির কর্ম্মই নয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যে সাহিত্যের আলোচনায় রাষ্ট্রবাসী জনগণ ভীরু, ক্লীব, কাপুরুষরূপে পরিণত হয়, আমরা আজ তাহাকেই শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া মনে করি। রাষ্ট্রীয় জনগণের সংঘটনে দর্শন শাস্ত্রের যে অসাধারণতা আছে ইহা আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব আছে ইহা মনে করিলে তাহাকে আমরা অপণ্ডিত বলিয়া মনে করি। ধর্ম্মশাস্ত্রে জনসংঘটন, রাষ্ট্ররক্ষায় প্রোৎসাহন প্রভৃতি যে থাকিতে পারে তাহা আজ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যজনতার গৌরবমণ্ডিত যুগে রামায়ণ ও মহাভারত রূপ মহাকাব্যে এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনা অতি শ্রদ্ধার সহিত করা হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুসারী ভট্টি ও কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি কাব্যেও তাহার পর্য্যাপ্ত নিদর্শন রহিয়াছে।

মনোযোগ সহকারে ন্যায় বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিলে রাষ্ট্রসংঘটনে দর্শনশাস্ত্রের অতিমাত্র প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদস্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহাতে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অতি উপাদেয়তা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্র আলোচনা করিলেও দেশপ্রীতির অগণিত নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ, মেধাতিথি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীন টীকাভাষ্যকারগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের অবশ্যাপেক্ষণীয়তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভারতের অধঃপতনের যুগে কি সাহিত্য, কি দর্শন, আর কিই বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিবন্ধসমূহ, যাহাই আলোচনা করা যাইবে তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা

যাইবে যে ভারতীয় জনতা রাষ্ট্রতন্ত্র আলোচনায় ক্রমশঃ শিথিলাদর হইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির রক্ষায় ক্রমশঃ উদাসীনতার ফলে আজ আমরা এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উপাদেয়তা সম্বন্ধে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছি। আবারও সেই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজধর্ম্মের উপাদেয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—সমস্ত জীবলোকের রাজধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই রাজধর্ম্মের অধীন। এই রাজধর্ম্মে যদি কিছুমাত্র অনবধানতা ঘটে তবে সমস্ত লোকসংস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে! আজ আমাদের এই রাজধর্ম্মের উপেক্ষার ফলে এই শোচনীয় অবস্থায় আমরা উপনীত হইয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে দণ্ডনীতি

যে সমস্ত কাব্যশাস্ত্রে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির যুগে রচিত হইয়াছিল। ভারতের পতনোন্মুখ অবস্থায় যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাতে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনা সম্ভাবিত নহে। কারণ, তখন ভারতীয় জনবৃন্দ দণ্ডনীতির আলোচনা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। যাহার আলোচনায় জনগণের চিত্তবিনোদন সম্ভাবিত নহে তাদৃশ আলোচনা কাব্যে স্থান পাইতে পারে না। কাব্যের আলোচ্য বস্তু হইতেই তাহার সমসাময়িক জনবৃন্দের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য দণ্ডনীতিযুক্ত শাস্ত্রের আলোচনা যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা ভট্টিকাব্য হইতে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনা দেখাইয়াছি। সম্প্রতি কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য হইতে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রদর্শন করিব। এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বস্তু মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাবলী বনপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং অজ্ঞাতবাসের ঘটনাবলী বিরাটপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এইসময়ে পাণ্ডবেরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যেমন উদ্‌যুক্ত ছিলেন এইরূপ শত্রুপক্ষের কার্য্যাবলীও অতিপ্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের ১৭৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—নীতিজ্ঞ মহীপতি সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তাঁহার মিত্র পক্ষীয় ও শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণ যেন তাঁহা হইতে প্রবল হইতে না পারে। মিত্ররাজাও প্রবল হইলে বিজিগীষু নরপতির সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইবে। প্রবলমহীপতি আর তখন মিত্রতা রক্ষা করিবেন না, তখন তিনিও শত্রু হইয়া পড়িবেন।

মনুসংহিতার এই অধ্যায়ের ১৮০ শ্লোকে রাজনীতিশাস্ত্রের সারসঙ্কলন করিয়া বলা হইয়াছে যে বিজিগীষু নরপতি সর্ব্বদা এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে তাঁহার মিত্র, উদাসীন ও শত্রু নরপতিগণ যেন কোন উপায়েই বিজিগীষু নরপতিকে পীড়িত করিতে না পারে। এজন্য বিজিগীষু রাজা কেবল শত্রু পক্ষ হইতেই শঙ্কিত থাকিবেন না কিন্তু মিত্র ও উদাসীন পক্ষ হইতেও শঙ্কিত থাকিবেন।

প্রজ্ঞাবল, ধনবল প্রভৃতি দ্বারা যিনি আধিক্যলাভ করিবেন তিনি অপর নরপতিগণকে গ্রাস করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য বিজিগীষুরাজা চারপ্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সমস্ত অবস্থা অবগত হইবেন এবং তদনুসারে নিজের ব্যবস্থা করিবেন। শান্তির সময়ও বিজিগীষু রাজা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। সর্ব্ববিধ বলবর্দ্ধনের জন্য শান্তির সময়, বিজিগীষু রাজার পক্ষে ভগবানের বর স্বরূপ। যিনি শান্তির সময় বিলাস ভোগে নিমগ্ন থাকিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ বলবর্দ্ধনে উদ্‌যুক্ত না থাকেন, আপৎকালে উপস্থিত হইলে সেই রাষ্ট্র বিনাশের সম্মুখীন হইবে। এ জন্য আমরা এস্থলে ভারতীয় প্রাচীনকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয় হইতে বিজিগীষুরাজা শান্তির সময়ে কিরূপে স্বীয় বলবর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকিবেন,—রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে সুসংহত করিবেন তাহার আভাস প্রদান করিব।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন ছল পূর্ব্বক পাণ্ডবদের সুসমৃদ্ধ রাজা ও ধনসমূহ আত্মসাৎ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করেন নাই। পাণ্ডবেরা সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বনবাসী হইলে মহারাজ

দুর্য্যোধন অতি উৎসাহের সহিত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র রঞ্জনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ সম্পন্ন হইয়াছিলেন। যে ভাবে দুর্য্যোধন পাণ্ডব রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার রাষ্ট্রবাসী নরপতিগণ এবং পররাষ্ট্রবাসী নরপতিগণ কেহই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন না। ছলপূর্ব্বক পাণ্ডবদের সুসমৃদ্ধ রাজ্য আত্মসাৎ করায় সমস্ত রাজেন্দ্রমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের কার্য্য কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া তাঁহারা দুর্য্যোধনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে দুর্য্যোধনের স্বমণ্ডল ও পরমণ্ডল যে দুর্য্যোধনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন ইহা দুর্য্যোধন ভাল ভাবেই বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে এই দুষ্কর্ম্মের ফল কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে—ইহা সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবিদিত থাকেনা। এজন্য দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রচ্ছাদনের জন্য এবং স্বমণ্ডল ও পরমণ্ডলবাসী নরপতি বর্গের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য অতিশয় নীতিশাস্ত্রবিদের মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিরূপে জনগণকে আকর্ষণ করিতে হয়, রাষ্ট্রনায়কের প্রতি জনগণের অনুরাগই যে রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ তাহা নীতিশাস্ত্রকুশল দুর্য্যোধন বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। এজন্য দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বমণ্ডল ও পরমণ্ডলবাসী নরপতি বর্গের এবং স্বীয় অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভেদ্য করিবার জন্য, যে সমস্ত নীতির প্রয়োগ করিয়াছিলেন মহাকবি ভারবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই তাহা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাকবি ভারবি—তাঁহার কাব্যে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই মহাভারত হইতে সংগৃহীত। মহাভারতে দুর্য্যোধনের নীতি যাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোন স্থলে ভারবি তাহা বিস্তৃত করিয়াছেন আবার মহাভারতে দুর্য্যোধনের নীতি যেস্থলে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ভারবি তাহা অতিসংক্ষেপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফল কথা মহাভারতে কীর্ত্তিত দুর্য্যোধন নীতি, ভারবি তাঁহার কাব্যে কোন স্থলে সংক্ষেপে কোনস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের সংঘটন নীতি কীদৃশ ছিল, তিনি স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে নরপতিবৃন্দের অনুরাগ কিভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে করি। বৃহত্তর ভারতের আর্য্য ম্লেচ্ছনরপতিবৃন্দ এই দুর্য্যোধনের আহ্বানে দুর্য্যোধনের পক্ষে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কেবল সম্মিলিতই হইয়াছিলেন না তাঁহারা পুত্র, ভৃত্য, বল ও বাহন ধন প্রভৃতি লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনের পক্ষের ক্রমশঃ পরাজয় হইতে থাকিলেও কোন একটি নরপতিও দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। যখন কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনের পরাজয় সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছিল তখনও একটি নরপতিও দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। দুর্য্যোধনের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হইয়া বৃহত্তর ভারতের আর্য্য ম্লেচ্ছ নরপতিগণ পুত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া মহাসমরে কুরুক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অগণ্য নরপতিবৃন্দ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একে একে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই অনুতপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন নাই অথবা দুর্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। দুর্য্যোধনের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টাও করেন নাই। দুর্য্যোধনের পক্ষীয় সমস্ত নরপতিবৃন্দ তাঁহাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের জন্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত নরপতিবৃন্দের একটিও অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন নাই। কত সুনির্ম্মল এবং সুদৃঢ় নীতির প্রভাবে এইরূপ বিস্ময়কর সংঘটন সম্ভাবিত হইতে পারে তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা বহুবিধ যুদ্ধের সংবাদ পাই, কিন্তু যুদ্ধে যে পক্ষের ক্রমশঃ পরাজয় হইতে থাকে সেইপক্ষে সম্মিলিত মিত্ররাজগণ স্ব স্ব স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া থাকেন।

আমরা সকলেই মুখে একথা বলিতে শুনিয়া থাকি যে এই যুদ্ধে আমরা শেষরক্তবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিব। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনস্থলেই তাহা দেখা যায় না। ইহা কেবল নিঃসার বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে সম্মিলিত আর্য্য ও ম্লেচ্ছ নরপতিগণ শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে বিনষ্ট করিয়া এই সাড়ম্বর উক্তির পূর্ণসার্থকতা দেখাইয়াছিলেন—পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

মাত্র মৌখিক ধোঁকা দিয়া দুর্য্যোধন কখনও বৃহত্তর ভারতের নরপতিবৃন্দকে এই ভাবে সুসংহত করিতে পারিতেন না। এই জন্য স্বতঃই মনে হয় দুর্য্যোধনের অবলম্বিত নীতির একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

যে নীতির প্রভাবে নরপতিগণ অকাতরে প্রাণ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় রাজনীতির এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা নারদনীতির প্রদর্শন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! তোমার নীতিপ্রভাবে সমস্ত প্রধান নরপতিবৃন্দ তোমার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত আছেন ত? এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তোমার জন্য তাঁহারা প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগেও উদ্‌যুক্ত আছেন ত? নারদের এই উক্তি অনুসারে বুঝিতে পারা যায় ভারতীয় রাজনীতির কি অসাধারণ মহিমা।

প্রত্যেক নরপতি স্বীয় ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোন পক্ষে যোগদান করিয়া অসুবিধা উপস্থিত হইলেই সেই পক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্যপক্ষে যোগদান করা একটা সাধারণ নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যাঁহারা গোকর্ণের মত শৈথিল্য অবলম্বনপূর্ব্বক কোনপক্ষে যোগদান করেন, সেই যোগদানের কোনই মূল্য নাই। গরু ইচ্ছানুসারে তাহার কর্ণকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। আজ যে পক্ষে আছি অসুবিধা দেখিলেই অন্যপক্ষের অবলম্বন অনায়াসেই করিতে পারি, ইহার মত হীনসংঘটন আর কিছুই হইতে পারে না।

যে বিজিগীষু নরপতি বিভিন্নদেশীয় নরপতিবৃন্দকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন তাঁহার মধ্যেই এমন অসাধারণ ন্যূনতা আছে—এমন গুরুতর ত্রুটি আছে, যে জন্য তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়াও নরপতিগণ তাঁহার শত্রুপক্ষে যোগদান করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াই অবস্থান করেন। কাহারও জন্য কেহ স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। ইহা নীতির ন্যূনতা –নীতির প্রয়োক্তার ন্যূনতা। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের শেষ দিনে যখন মহারাজ শল্য সেনাপতি হইয়াছিলেন, মহারাজ শল্যের সেনাপতিত্ব লাভের পরে দুর্য্যোধনের পরমমিত্র ও গুরু কৃপাচার্য্য, মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

যখন কৃপাচার্য্য সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন কুরুপক্ষের কোন মহাবীরই এই আশা পোষণ করিতেন না যে—আমাদের যুদ্ধে জয় হইবে। কুরুপক্ষের জয়ের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে—পরাজয় সুনিশ্চিত হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরবর্গ একে একে রণাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। কুরুরাজের বিশাল সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। যুদ্ধোপকরণও অল্প অবশিষ্ট তখন কৃপাচার্য্য যেভাবে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকটে এই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ছিলেন তাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। সামরিকসভায় হতাবিশিষ্ট নরপতিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছেন এই সময় কৃপাচার্য্য অতিশয় শোকাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন—এই প্রস্তাব যেমন সময়োচিত হইয়াছিল তেমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শল্যপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে এই সন্ধির প্রস্তাব বর্ণিত হইয়াছে। শল্যপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে মহারাজ দুর্য্যোধন এই সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন—তাহা অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বার্হস্পত্য নীতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কৃপাচার্য্য এই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং মহারাজ দুর্য্যোধন অতিনিপুণতার সহিত তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে সন্ধি কেন সঙ্গত হইবে না তাহার প্রতি দুর্য্যোধন বহুকারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধন যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন আমরা এস্থলে তাহার একটিমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিব। আর তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন মহারাজ দুর্য্যোধন কীদৃশ হৃদয় লইয়া, কোন্ নীতির অনুসরণ করিয়া, বৃহত্তর ভারতের নরপতিগণকে স্বপক্ষে আনয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন—"যে মহর্থে হতাঃশূরা স্তেষাং কৃতমনুস্মরন্। ঋণং তৎ

প্রতিযুঞ্জানো ন রাজ্যে মন আদধে॥" ইহার অভিপ্রায়—যে সমস্ত শূর বীর পুরুষগণ নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া আমার জন্য রণাঙ্গন আলিঙ্গন করিয়াছেন তাঁহারা আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের সেই ঋণের পরিশোধের একটি মাত্র উপায় আছে যদি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত গৌরবজনক কর্ম্মের জন্য তাঁহাদের মত আমিও রণাঙ্গন আলিঙ্গন করি। তাঁহাদের অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ না করিয়া আমি রাজ্যাংশ গ্রহণে কিছুতেই উন্মুখ হইতে পারি না। আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের লোভে সেই সমস্ত মহাবীর পুরুষগণের কৃত গৌরবান্বিত কর্ম্মরাশিকে কিছুতেই ধুলিসাৎ করিয়া দিতে পারিব না।

মহারাজ দুর্য্যোধন শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গন আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার জন্য নিহত শূর বীর পুরুষগণের অপরিশোধ্য ঋণের পরিশোধ করিয়াছিলেন। রাজ্য, সমৃদ্ধি, অগণিত ভোগ তৃণীকৃত করিয়া অগণিত বীরপুরুষগণের ঋণ পরিশোধের জন্য মহারাজ দুর্য্যোধন সমরাঙ্গন আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধনের এই ভারতীয় সুনির্ম্মল নীতি যেদিন হইতে ভারতবর্ষে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেইদিন হইতে ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। যাহাহউক আমরা মহাকবি ভারবি প্রদর্শিত দুর্য্যোধন নীতির আশয় এস্থলে দর্শন করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বিজিগীষু নরপতি, তিনি শত্রুর চক্রান্তে অরণ্যবাসী হইলেও রাজ্যলাভের জন্য সর্ব্বদা উদ্যুক্ত। কোন সময়েই তিনি অলস হইয়া বলিয়া থাকেন নাই। মহারাজ দুর্য্যোধন ছলপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া কি ভাবে স্বকীয়রাজ্যে ও পরকীয়রাজ্যে প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া স্বমণ্ডলস্থিত ও পরমণ্ডলস্থিত নরপতিবর্গকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য যুধিষ্ঠির গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গুপ্তচরের ব্যবস্থা একটা অসাধারণ বিষয়। মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করিলে ইহার বিপুল ব্যবস্থার কথা জানিতে পারা যায় এবং ইহার অসাধারণ প্রয়োজনীয়তার কথাও বুঝিতে পারা যায়। এই গুপ্তচরবর্গ নানাবিধ বেশগ্রহণে সুশিক্ষিত, নানাভাষায় সুশিক্ষিত, নানা ব্যবহারে সুদক্ষ এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই চারবর্গ বিজিগীষু রাজার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। মহারাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিয়োজিত চার, দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধন কি কি কাজ করিতেছেন, দুর্য্যোধন স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা অবগত হইবার জন্য দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিযুক্ত চার দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রপরিভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াছিল তাহা নিবেদন করিবার জন্য সরস্বতী নদীর উপকূলে অবস্থিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন দ্বৈতবনে আবস্থান করিতেছিলেন। যাঁহারা ভরবি পড়ান তাঁহারা দ্বৈতবনের নাম জানেন। কিন্তু দ্বৈতবন অরণ্য কি জল তাহা জানেন না। মহাভারতের বনপর্ব্বে দ্বৈতবনকে সরোবর বলা হইয়াছে। বস্তুত দ্বৈতবন কৃত্রিম সরোবর নহে ইহা সরস্বতী নদীরই একটি অংশ। শল্যপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে বলরামের সারস্বত তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বৈতবনের উল্লেখ আছে দ্বৈতবন একটি সারস্বত-তীর্থ। এই স্থানে বহু ঋষির বাস ছিল এবং বলরাম তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে দ্বৈতবনে আসিয়া সেই সারস্বততীর্থে স্নানাদি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। যাহাহউক মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃতরাজ্য হইয়া এই দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন। এইখানেই যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত চার দুর্য্যোধনের রাজ্যের সংবাদ লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল।

বিজিগীষু রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত চারের কর্ত্তব্য কি, বিজিগীষু রাজার সহিত চারের সম্বন্ধ কিরূপ এবং চারের কিরূপ বিদ্যাবুদ্ধি থাকা আবশ্যক তাহা কবি এই কাব্যের প্রারম্ভে বিশদভাবে বলিয়াছেন। আমরা মনে করি

এসমস্ত রাজনীতির জটীল কথার অবকাশ কাব্যে না থাকাই ভাল। কবির রাজনীতির সংবাদ রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই এবং কাব্যে রাজনীতির কোন স্থানও নাই। পরাধীন ভারতের এই অবস্থা হইলেও স্বাধীন ভারতের এই অবস্থা ছিল না। স্বাধীন ভারতের কবির অনেক কিছু জানা আবশ্যক ছিল। সস্তায় স্বাধীন ভারতের কবি হওয়া যাইত না। মহাকবি ভামহ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে—এমন কোন শাস্ত্র, বিদ্যা বা শিল্প জগতে সম্ভাবিতই নহে যাহা কাব্যের অঙ্গ হয় না। এজন্য কবির প্রতি মহাগুরুভার অর্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গ মহো ভারো মহান্ কবেঃ" (ভামহ)। রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলেও লৌকিক মহাকাব্য রঘুবংশ ভারবি মাঘ প্রভৃতি ভারতীয় রাজনীতির আলোচনায় পরিপূর্ণ। যাহা হউক দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সমাগত চার, গুপ্তভাবে যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। একান্ত স্থানে উপবিষ্ট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সংগৃহীত বৃত্তান্ত, চার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে নিবেদন করিয়াছিল। চার যে সমস্ত বৃত্তান্ত নিশ্চিতভাবে অবগত হইয়াছিল তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকটে নিবেদন করিবার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল যে—মহারাজ! আপনার হিত অথচ শ্রুতিমধুর বাক্য বড়ই দুর্লভ। এইজন্য আপনার হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও যথার্থ ঘটনা আপনার নিকটে নিবেদন করিব। রাজকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষ যদি রাজার হিতচিন্তক না হয় এবং হিতচিন্তক রাজপুরুষ দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ, রাজা যদি যত্নের সহিত শ্রবণ না করেন তবে রাজা ও রাজপুরুষ উভয়ই নির্ব্বোধ বুঝিতে হইবে। চারগণ রাজগণের চক্ষুঃ এজন্য বিজিগীষু রাজগণ চারচক্ষুঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিলেই রাষ্ট্রের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। রাজনীতি অতি দুর্ব্বিজ্ঞান। এইজন্য নীতিরহস্যবিৎ ব্যক্তিই রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত রাজনীতির রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমি দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধন প্রবর্ত্তিত নীতির যে সমস্ত গূঢ় রহস্যের সংবাদ অবগত হইয়াছি তাহা আপনার নিকট যথাযথভাবে বর্ণন করিব। মহারাজ-দুর্য্যোধন আপনাদের রাজ্য ছল পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া নাই। দুর্য্যোধন সম্রাট্ হইয়াছেন বটে, এবং আপনারাও সম্প্রতি বনবাসী ইহাও সত্য। তথাপি মহারাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই আপনাদের প্রভাবে ভীত হইয়া তাহার প্রতিকারে উদ্যুক্ত রহিয়াছেন। অতি প্রবল শত্রু আজ দুর্ব্বল হইয়াছে বলিয়া তিনি শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। দুর্য্যোধন ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ছল পূর্ব্বক রাজ্য জয় করাতেই বস্তুত রাজ্য জয় করা হয় নাই। রাজ্য যে পর্য্যন্ত নীতিদ্বারা জিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত রাজ্য জয় করা হইবে না। এইজন্য দুর্য্যোধন নীতিদ্বারা রাজ্য জয় করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন—স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে নরপতিবর্গের প্রতি অবহিত চিত্তে রাজনীতিদ্বারা সুমার্জ্জিত উপায়সমূহ প্রয়োগ করিতেছেন। আপনার যে সমস্ত গুণরাশির জন্য সমস্ত নরপতিবর্গ আপনার প্রতি একান্ত অনুগত ছিল সেই সমস্ত গুণরাশি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আপনার গুণসম্পৎ অতিক্রমণপূর্ব্বক আরো অধিকতর গুণশালী হইতে দুর্য্যোধন নিজে প্রয়াস করিতেছেন। আর তাহাতে দুর্য্যোধনের নির্ম্মল যশঃরাশিও সমস্ত রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। দুর্য্যোধন আপনা অপেক্ষা, অধিক গুণশালী, ইহা প্রখ্যাপন করিবার জন্য রাজনীতি শাস্ত্রে উপদিষ্ট সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষ এই অড়িষড়্বর্গ জয় করিয়া তিনি প্রাচেতস মনু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে দিবা ও রাত্রির এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভাগ পূর্ব্বক স্বীয় পৌরুষ বিস্তার করিতেছেন। তিনি মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপুরুষগণকে নিতান্ত মিত্রের মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। বন্ধুবর্গের প্রতি ভ্রাতার মত সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি ধন বিদ্যা প্রভৃতির গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত সমান ব্যবহার করেন। এইজন্য দুর্য্যোধনের আধিপত্য কাহারও পীড়াদায়ক বা ভয়দায়ক হয় নাই। প্রত্যুত মনে হয় দুর্য্যোধনের আধিপত্য যেন তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রতিই ন্যস্ত রহিয়াছে। দুর্য্যোধন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অনাসক্তভাবে সেবা করিয়া থাকেন। এইজন্য এই ত্রিবর্গ তাঁহার অপক্ষপাত দৃষ্টিতে সেবিত হইয়া পরস্পর যেন মিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অধিক কাম সেবা দ্বারা অর্থ ও ধর্ম্ম পীড়িত হয় না। এইরূপ অধিক অর্থসেবাতেও কাম ও ধর্ম্ম পীড়িত হয় না। এইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থসেবাতেও কাম পীড়িত হয় না। এইরূপে

সমানভাবে ত্রিবর্গ সেবিত হইয়া থাকে। তাঁহার সাম প্রয়োগ দান বর্জিত নহে অর্থাৎ কেবলমাত্র মিষ্টকথার দ্বারাই লোককে তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হন না এবং তাঁহার দানও সাম সাম বর্জিত নহে। তিনি প্রভূত দান করিলেও মধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহা করিয়া থাকেন। তিনি যাহার প্রতি যে সৎকার প্রদর্শন করেন তাহা সৎকৃত পুরুষের গুণানুসারেই করিয়া থাকেন। নির্গুণ পুরুষের প্রতি অকারণ সৎকার প্রযুক্ত হয় না। দুর্য্যোধন কামাদি অরিষড়্বর্গ জয় করিয়া ধর্ম্ম, লোভ ও ক্রোধ বিবর্জিত হইয়া—ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়াই শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক অপরাধ করিলে অপরাধের অনুরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন স্বরাষ্ট্রের এবং পররাষ্ট্রের রক্ষাকার্য্যে সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি মনে অবিশ্বস্ত থাকিয়াও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ইহাই মূল সূত্র। শান্তিপর্ব্বের ৫৮ অধ্যায়ে বৃহস্পতি প্রোক্তনীতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে—রাজা অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ত থাকিয়াও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। আবার শান্তিপর্ব্বের ৮০ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে রাজা অনুজীবিগণের প্রতি একান্ত বিশ্বাসশীল হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে এবং সর্ব্বত্র অবিশ্বাস মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। অনুজীবিগণের প্রতি একান্ত বিশ্বাসই রাজার বিপত্তির কারণ। এজন্য রাজা যেরূপ অনুজীবিগণের প্রতি একান্ত বিশ্বাসই রাজার বিপত্তির কারণ এজন্য রাজা যেরূপ অনুজীবিগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন সেইরূপ শঙ্কিতও থাকিবেন। বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত অধিকারিবর্গদ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাহাদিগকে যে পারিতোষিক প্রদত্ত হয় তাহাতেই দুর্য্যোধন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মাত্র মৌখিক প্রশংসা করিয়াই রাজা নিবৃত্ত হন না। অনুজীবিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সারবত্তা যদি রাজা উপলব্ধি করিতে না পারেন—অথবা উপলব্ধি করিয়াও যদি কর্ম্মানুসারে অনুজীবিগণকে পুরস্কৃত না করেন তবে অনুজীবিগণই রাজার প্রতিকুল হইয়া থাকে। অনুজীবিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের উপলব্ধি এবং তদনুসারে অনুজীবিগণের মর্য্যাদা বৃদ্ধিকারী প্রভুকেই কৃতজ্ঞ বলা হয়—কৃতজ্ঞ প্রভুর প্রতি অনুজীবিগণ অনুরক্ত হইয়া থাকে। অনুরক্ত অনুজীবিগণই রাজার রক্ষক।

দুর্য্যোধন সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে সামাদি উপায়ের প্রয়োগ করিয়া থাকেন—আর এজন্য তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত সামাদি উপায়বর্গ, অর্থসম্পদ্ বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। স্বমণ্ডলে ও পরমণ্ডলে বিহিত সামাদি উপায় দ্বারা রাজমণ্ডল দুর্য্যোধনের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া নানাবিধ ধনদ্বারা দুর্য্যোধনের কোষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। স্বমণ্ডলের ও পরমণ্ডলের নরপতিবর্গ দুর্য্যোধনের প্রীতি সম্পাদন মানসে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া দুর্য্যোধনের রাজধানী হস্তিনা নগরীতে সমবেত হইয়া থাকেন। দুর্য্যোধনের রাষ্ট্রে কর্যকগণের অবস্থাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ তাঁহার রাষ্ট্র দেবমাতৃক নহে।

দেবমাতৃক দেশে বারিবর্ষণের অভাব হইলে অথবা অসময়ে বারিবর্ষণ হইলে শস্য উৎপন্ন না হইয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে। এজন্য দুর্য্যোধন স্বীয় রাষ্ট্রকে অদেবমাতৃক করিয়াছেন—নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে শস্যভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—আর তাহাতে কৃষিজীবিগণ অনায়াসেই শস্য সম্পৎ লাভ করিতেছে। কৃষিকার্য্যের অতি সুব্যবস্থাতে মনে হয় যেন কৃষকগণের কর্ষণ ব্যতীতই সমস্ত ভূভাগ শস্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে। অনবরত লোকহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কুরুরাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উদারকীর্ত্তি দয়ালু দুর্য্যোধনের সমস্ত রক্ষার সুব্যবস্থাতে তাঁহার সমস্ত আপদ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং বসুমতী যেন স্বতঃই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া বহু ধন প্রদান করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য বিভাগও অতি সমুজ্জল। বলিষ্ঠ সদ্বংশসম্ভূত এবং বংশোচিত অভিমান সম্পন্ন—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রখ্যাত কীর্ত্তি পরস্পর অনুরাগসম্পন্ন

বীরবর্গ, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রচুরধনে পুরস্কৃত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দুর্য্যোধনের কল্যাণ সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দুর্য্যোধন যে কেবলমাত্র স্বরাষ্ট্র রক্ষাতে ব্যাপৃত তাহা নহে—তিনি পরমণ্ডলের সমস্ত বৃত্তান্ত অতি অবহিতচিত্তে অবগত হইয়া থাকেন। অত্যন্তদক্ষ ও অনুরক্ত চারবর্গকে সমস্ত রাজমণ্ডলে নিযুক্ত করিয়া শত্রু-মিত্র-উদাসীন সমস্ত রাজমণ্ডলের সংবাদ সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া থাকেন। কোন্ রাজা কোন্ কর্ম্মে উদ্‌যুক্ত আছেন—তাহা তিনি চারগণের সাহায্যে অবগত হইয়া থাকেন। অন্য রাষ্ট্রের অভিলষিত কর্ম্মসমূহ অবগত হইয়াও নিজের অভিলষিত কর্ম্ম যাহাতে কেহই জানিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম দ্বারাই তাঁহার অভিলাষ পরে অবগত হওয়া যায়।

রাজা দুর্য্যোধন বিদেশী নরপতিদিগের সহিত বিরোধে বা যুদ্ধে লিপ্ত নহেন—অপর নরপতিগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ। দুর্য্যোধনের অশেষ সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়াই অপর নরপতিবর্গ দুর্য্যোধনের শাসন অবগত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাষ্ট্রের মঙ্গল সম্পাদন করিতেছেন।

আজ সসাগরা পৃথিবীতে দুর্য্যোধনের কেহ শত্রু নাই—অপ্রতিহত ভাবে তাঁহার শাসন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তথাপি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে ছলে নির্ব্বাসিত করিয়া ভবিষ্যৎ কালে আপনাদের নিকট হইতে বিপদ আসিতে পারে এইরূপ চিন্তায় শঙ্কিতচিত্তে অবস্থান করেন। কথাপ্রসঙ্গে কেহ অর্জ্জুনের বিক্রমের কথা প্রকাশ করিলে অথবা রাজা যুধিষ্ঠিরের নাম উচ্চারণ করিলেও দুর্য্যোধন বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়া থাকেন।

পাণ্ডবগণকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধন যাদৃশ নীতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত রাজমণ্ডলের ও সহায়কবর্গের অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছিলেন—তাহা আমরা মহাকবি ভারবির উক্তি হইতে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। অতি অল্পতর কার্য্যও একজন অসহায় ব্যক্তি নিষ্পন্ন করিতে পারে না। রাজ্য পরিপালনের মত গুরুতর কার্য্য যে একজন অসহায় নরপতি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না ইহাতে আর বক্তব্য কিছুই নাই। এজন্য রাজা সহায় সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকিবেন। রাজার সহায় অর্থাৎ মিত্র চারিপ্রকার। ১। সহার্থ, ২। ভজমান, ৩। সহজ, ৪। কৃত্রিম। যে বিষয়ে যে দুইজনের সম্পৎ ও বিপৎ তুল্য সেই বিষয়ে সেই দুইজন সহার্থ মিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের ভয়ে ভীত হইয়া আশ্রয়লাভের জন্য অন্যকে ভজনা করে তাহাকে ভজমান মিত্র বলা হয়। মাতুলপুত্র পিতৃষ্বসৃপুত্র মাতৃষ্বসৃপুত্র প্রভৃতি সহজমিত্র। ধনদানাদি দ্বারা যাহাদিগকে সহায়করূপে সংগ্রহ করা যায় তাহাদিগকে কৃত্রিম মিত্র বলে।

মহারাজ দুর্য্যোধন এই চতুর্ব্বিধ মিত্র সংগ্রহের জন্য ভারতীয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রে উক্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন ইহা স্পষ্টই ইহা বুঝিয়াছিলেন যে পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রবল শত্রু। তাহারা নির্ব্বাসিত হইলেও কোনসময়ে তাহারা প্রবল হইয়া উঠিবেই। আর তাহাতেই পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের সংঘর্ষ অনিবার্য্যই ঘটিবে। প্রবল পরাক্রম পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা—অসহায় নরপতির পক্ষে অসম্ভব। এজন্য তিনি সমস্ত রাজমণ্ডলকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ নীতিই প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে দুর্য্যোধনের নীতি বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি ভারবি মহাভারত প্রদর্শিত নীতিরই সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বনপর্ব্বের ৩৬ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের এই নীতি প্রদর্শন

করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে—যে সমস্ত নরপতিগণকে পূর্ব্বে আমরা পরাজিত করিয়া করদীকৃত করিয়াছিলাম আজ তাহারা সকলে মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং মহারাজ দুর্য্যোধনের নীতিজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই সমস্ত নরপতি, মহারাজ দুর্য্যোধনের নীতিজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই সমস্ত নরপতি, মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রতি অতিশয় অনুরাগসম্পন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত নরপতিগণ দুর্য্যোধনের হিতের জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌যুক্ত থাকিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু ইহারা আমাদের কখনও কল্যাণ কামনা করিবে না। আমাদের দ্বারা উৎপীড়িত রাজবৃন্দ যাহারা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই প্রচুর ধনসম্পন্ন এবং বুদ্ধিবল ও সৈন্যবলও ইহাদের প্রচুর। দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে ইহারা সকলেই আমাদের পরাজয়ের জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষে বিশেষভাবে যোগদান করিবে। দুর্য্যোধন কৌরব সৈন্যগণকে নানাবিধ ধনমানাদি দ্বারা বিশেষভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছে।

দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে সেনাপতি প্রভৃতি বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত রাজন্যবৃন্দের পুত্র—অমাত্য ও সৈনিকগণকেও দুর্য্যোধন ধনমানাদি দ্বারা বিশেষভাবে পরিতুষ্ট করিয়া নিজের অত্যন্ত অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সম্মানিত এই সব বীরবৃন্দ যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দুর্য্যোধনের জন্য প্রাণও ত্যাগ করিবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথগণের সম্বন্ধ, আমাদের সহিত ও দুর্য্যোধনের সহিত সমান হইলেও ইঁহারা দুর্য্যোধন প্রদত্ত প্রচুর ধন ও প্রচুর সম্মান ভোগ করিতেছেন বলিয়া এই ধন ও সম্মানের বিনিময়ে তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষেই যোগদান করিবেন এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে প্রাণত্যাগও করিবেন। আমাদের সহিত ও দুর্য্যোধনের সহিত সম্বন্ধ তুল্য হইলেও মহারাজ বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি কুরুবংশীয় মহারথগণ, ভীষ্ম, দ্রোণাদির মতই দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিবেন। আরও বিশেষ কথা—দুর্য্যোধনের পরম মিত্র ও আমাদের ভীষণ শত্রু মহারাজ কর্ণ সর্ব্বশস্ত্রবিৎ ও অপ্রধৃষ্য। দুর্য্যোধন পক্ষীয় এইসব মহারাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত না করিয়া আমাদের জয়লাভ হইতে পারে না। আজ আমরা অসহায়। কর্ণের বীরত্ব পৃথিবীর সমস্ত বীরগণ হইতেও অধিক। কর্ণের বীরত্বের কথা চিন্তা করিয়া আমি রাত্রে নিদ্রিত হইতে পারি না। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমকে এই সমস্ত কথা বলিয়া বনপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণ এই পাঁচজন অসাধারণ মহাবীর, ইঁহারা চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে ইঁহারা কুশল। দুর্য্যোধন ইঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদিগকে বহু সম্মান ত করিয়াই থাকে—প্রত্যুত ইঁহাদের প্রতি গুরুবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ইঁহারাই দুর্য্যোধনের অসাধারণ হিতকামী হইয়াছেন। দুর্য্যোধন তাহার যোদ্ধৃবৃন্দের প্রতি সর্ব্বদাই অসাধারণ প্রীতিরক্ষা করিয়া থাকে। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন। দুর্য্যোধনের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে ইঁহারাই তাহার শান্তির ব্যবস্থা করিবেন। দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজেদের পূর্ণশক্তির প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইবেন না। আজ সমগ্র পৃথিবী দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী। গ্রাম-নগর-সাগর-বন-আকর প্রভৃতি যাহা কিছু ধনোৎপত্তির স্থান, তাহা সমস্তই দুর্য্যোধনের করায়ত্ত সুতরাং এই প্রবল দুর্য্যোধনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইলে আমাদেরও উপযুক্ত সামর্থ্য সংগ্রহ আবশ্যক।

উদ্যোগ পর্ব্বের ৫৫ অধ্যায়ে মহারাজ দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে নিজের সাফল্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বলিয়াছেন পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তিনী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর তাহা নাই। আজ সমগ্র পৃথিবী আমার বশবর্ত্তিনী। আজ আমাদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি বিরোধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। আর যে কেবল পৃথিবীই আমাদের বশবর্ত্তিনী তাহা নহে, পৃথিবীর সমস্ত নরপতিবৃন্দ আমাদের অভ্যুদয় এবং আমাদের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন। যাহা আমার অভিপ্রেত পৃথিবীর সমস্ত নরপতিরও তাহাই অভিপ্রেত।

এই সমস্ত নরপতিবৃন্দ আমার প্রতি এত গাঢ় অনুরাগ সম্পন্ন যে আমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমস্ত নরপতি অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত, সমুদ্রেও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত।

যুধিষ্ঠিরাদি রাজ্যভ্রষ্ট, সহায়হীন, ছিন্নপক্ষ, নিবীর্য্য। সুতরাং পাণ্ডব পক্ষ হইতে আমাদের কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই (২৪—২৬ শ্লোক)।

মহাভারতের এই কথাগুলির প্রতি বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দুর্য্যোধনের নীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারবি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহাতে নূতনতা বিশেষ কিছুই নাই—বরং মহাভারতের কথাগুলির গাম্ভীর্য্য অধিক ও দূরপ্রসারিতা অনেক।

ভারবির ১ম সর্গে দুর্য্যোধনের নীতি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে আমরা তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের নিকটে যে সকল বর্ণনা করিয়াছিল যুধিষ্ঠির তাহা ভীমাদির সহিত পরিবৃত দ্রৌপদীর নিকট বলিয়াছিলেন।

চার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাণী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত বহুকথা বলিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর এই সমস্ত উক্তির মধ্যে দুই একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিব। দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! কপটাচারী মায়াবী শত্রুর সহিত যিনি সরল ব্যবহার করেন—তাঁহার পরাজয় সুনিশ্চিত। অতি কূটনীতি সম্পন্ন শত্রুর সহিত যে কূটনীতি প্রয়োগ করে না—তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি পুরুষের পরাজয় সুনিশ্চিত। এজন্য কপটাচারী শত্রুর সহিত কপট ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে যোদ্ধা বর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় শানিত শর তাহার দেহকে অনায়াসে বিদীর্ণ করিয়া থাকে। এইরূপ কূটনীতি সম্পন্ন শত্রুও সাধুস্বভাব ব্যক্তিকে অনায়াসে বিনাশ করিয়া থাকে। এজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও কূটনীতিসম্পন্ন দুর্য্যোধনের সহিত কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাহার বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ক্রোধশূন্য ব্যক্তির মিত্রও তাহাকে আদর করেনা—যাহার ক্রোধ নিষ্ফল নহে—যিনি বিপদ বিনাশে সমর্থ, সমস্ত লোক তাহারই বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা শান্তহৃদয় মুনিজনেরই সিদ্ধিকারক। কিন্তু নরপতিগণ এই নীতি অবলম্বন করিয়া কোনদিনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। যুধিষ্ঠির মনে করিতে পারেন—আমি দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস করিব ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিব ইহাও আমি প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লঙ্ঘন করিব কিরূপে? যুধিষ্ঠিরের এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

বিজিগীষু নরপতিগণ শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াও প্রয়োজন বশতঃ কোন ছলের উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কোনওনা কোনও ছল উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বীকৃত সন্ধির বিচ্ছেদ, প্রয়োজন হইলে বিজিগীষু রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

দ্রৌপদীর উক্তির পরে ভীম, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। ইহা কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য় সর্গে বলা হইয়াছে। ভীম বলিয়াছিলেন—আমাদের শত্রু দুর্য্যোধন যে নীতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, দুর্য্যোধনের এই অভ্যুদয় যদি পরিণামে বিনাশশীল হইত তবে তাহা

উপেক্ষারই বিষয় হইত। বিজিগীষু নরপতি শত্রুর অভ্যুদয়েও উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন যদি সেই অভ্যুদয় পরে শত্রুর বিনাশের কারণ হয় এবং শত্রুর ক্ষয়ও উপেক্ষণীয় নহে যদি সেই ক্ষয় হইতে শত্রুর পরম অভ্যুদয় সম্ভাবিত হয়।

শত্রুর ক্ষয় যদি অভ্যুদয়াবসান হয় তবে সেই ক্ষয় কখনও উপেক্ষণীয় নহে। আর অভ্যুদয়ও ক্ষয়াবসান হইলে সেই অভ্যুদয় বিজিগীষু রাজর উপেক্ষণীয়ই বটে। কিন্তু দুর্য্যোধনের অভ্যুদয় উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না—দুর্য্যোধনের অভ্যুদয় ক্ষয়াবসান নহে। বিজিগীষু রাজা শত্রুর আশুক্ষয়জনক বৃদ্ধির যেমন উপেক্ষা করিবেন এইরূপ বিজিগীষু রাজা নিজের তাদৃশ বৃদ্ধির অবশ্য প্রতিকার করিবেন। শত্রুর যে অভ্যুদয়ে তাহার ক্ষয় আশু সম্ভাবিত নহে বিজিগীষু শত্রুর তাদৃশ অভ্যুদয় কখনও উপেক্ষা করিবেন না। যে বিজিগীষু রাজা নিরুৎসাহিতা প্রযুক্ত শত্রুর ক্রয় বিবর্দ্ধমান প্রভুশক্তির উপেক্ষা করেন—সেই বিজিগীষু রাজা অচিরেই রাজ্যশ্রী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

ক্রম বিবর্দ্ধমান শত্রুই তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। বিজিগীষু রাজা ক্ষীণশক্তি হইলেও যদি তিনি স্বাভাবিক উৎসাহশক্তি যুক্ত ও তেজঃসমন্বিত হন তবে অচিরকাল মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মসমূহের আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশ কালবিভাগ, বিনিপাত প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি, এই পাঁচটি মন্ত্রণার অঙ্গ হইয়া থাকে। পঞ্চাঙ্গযুক্ত মন্ত্রণাই প্রভুশক্তির উৎপত্তিস্থান। কোষদণ্ডই প্রভুশক্তি। এই প্রভুশক্তির জনক মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তি হইতে প্রভুশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু এই মন্ত্রশক্তি উৎসাহশক্তি বিহীন—বিজিগীষু রাজার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। উৎসাহহীণ বিজিগীষু নরপতি মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন হইলেও তাহাতে তাঁহার কোন বৃদ্ধি হইবে না—কোন কার্য্যেরই সিদ্ধি হইবে না। এজন্য বিজিগীষু রাজা উৎসাহশক্তি সম্পন্ন হইবেন। উৎসাহশক্তি সম্পন্ন বিজিগীষু রাজা মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন হইবেন। মন্ত্রশক্তি হইতে প্রভুশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ কোষদণ্ড পূর্ণ হইয়া থাকে। উৎসাহশক্তি মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তি এই ত্রিবিধশক্তির মধ্যে উৎসাহশক্তি প্রধান। এই উৎসাহশক্তিকেই লোকে পুরুষাকার বলে। ভীম যুধিষ্ঠিরকে তিনটি শক্তির কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে উৎসাহশক্তিই প্রধান বলিয়াছেন। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে কোন্ শক্তি প্রধান তাহার বিস্তৃত আলোচনা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে আছে। কৌটিল্য ৬ষ্ঠ অধিকরণ ৯৭ প্রকরণ ও ৭ম অধিকরণ ১১৮ প্রকরণ। ভীম আরও বলিয়াছিলেন উৎসাহশক্তিহীনতাই বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। পরাক্রমলব্ধ সমৃদ্ধি বিষাদের সহিত বাস করেন না অর্থাৎ নিরুৎসাহ পুরুষের বৃদ্ধিলাভ হয় না। আরও কথা এই যে দুর্য্যোধনকে যদি ত্রয়োদশ বৎসর নির্ব্বাধে পৃথিবীভোগ করিতে দেওয়া হয় তবে অতি কূটনীতিসম্পন্ন দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগের পরে কখনও রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না—এবং বলপূর্ব্বকও তাহার নিকট হইতে রাজা পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং আর কালপ্রতীক্ষা না করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ করা উচিত।

আরও কথা এই যে দুর্য্যোধন যদি ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবীভোগ করিয়া আপনাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানও করে আপনি দুর্য্যোধনদত্ত রাজ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন কি? পরের অনুগ্রহে রাজ্য লাভ করিলে আপনার বিক্রমের অবকাশ থাকিবে কোথায়? আর আমাদেরও দুর্ব্বার বাহুবীর্য্যের প্রয়োজনই বা কি থাকিবে? বস্তুতঃ মনস্বী ব্যক্তি অন্যের নিকট সমৃদ্ধি কামনা করেন না—অন্যের প্রদত্ত সমৃদ্ধিভোগ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না নিজের বিক্রমোপার্জিত সম্পদই মহান্ পুরুষেরা ভোগ করিয়া থাকেন।

পশুরাজ সিংহ স্বীয় বিক্রমের দ্বারা হস্তীকে নিহত করিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যের প্রদত্ত মাংস গ্রহণ করে না। যে মহান্ বিজিগীষু নরপতি, তাহার নিকটে ক্ষণভঙ্গুর জীবনের বিনিময়ে স্থির

যশঃই অভীষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষণবিনাশী জীবনের বিনিময়ে যিনি শত্রু নির্য্যাতনপূর্ব্বক স্থিরযশের ইচ্ছুক, লক্ষ্মী তাঁহার নিকট অবশ্যই আগমন করিয়া থাকেন। মনস্বী বিজিগীষু নরপতি পরাজিত হইয়া জীবন ধারণ কাম্য মনে করেন না তাঁহারা অনায়াসে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন – কিন্তু স্বীয় তেজঃ বিক্রম কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। তেজস্বী ব্যক্তি কখনও অন্যের দ্বারা অভিভূত হন না, যেমন প্রজ্বলিত বহ্নিতে কেহ পদার্পণ করে না। নিস্তেজ পুরুষ সকলের নিকটই অবজ্ঞাত হয়, যেমন ভস্মরাশি সকলেই পদদলিত করিয়া থাকে। তেজস্বী পুরুষ স্বভাবতঃই বিজিগীষু হইয়া থাকে। তেজস্বী সিংহ কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই গর্জ্জনশীল মেঘবৃন্দের প্রতি আক্রমণ করিয়া থাকে। মহান্ পুরুষ স্বীয় স্বভাববশতঃই শত্রুর বৃদ্ধি সহন করিতে পারেন না।

অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি উৎসাহ শক্তিসম্পন্ন হইয়া শত্রুর উচ্ছেদে যত্নশীল হও। তোমার অনুৎসাহই শত্রুগণকে নির্ব্বিঘ্নে স্থিত রাখিয়াছে।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমের উক্তির বহু প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—তুমি, রাজ্যলাভের জন্য এখনই পরাক্রম প্রকাশ করা উচিত বলিয়া যে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছ তাহা আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। এখনই পরাক্রম প্রকাশ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যই সহসা করা উচিত নহে। অবিবেকই সমস্ত বিপদের মূল। বিবেক সম্পন্ন পুরুষই সম্পদের আস্পদ হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া সেই কর্ত্তব্য বিষয়ের রক্ষণ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন কর্ষক উপযুক্তকালে বীজবপন করিয়া বারি বর্ষণে শস্য লাভ করিয়া থাকে। শৌর্য্য নীতিসম্পাদিত সম্পদেরই ভূষণ। উপযুক্ত কালে শৌর্য্য প্রকাশই শক্তিমানের অলঙ্কার।

যুধিষ্ঠির আরও বলিয়াছিলেন দুরূহ কার্য্যে অনুষ্ঠাতৃগণের মতবৈষম্য স্বাভাবিক। কোনও পুরুষ যাহাকে কর্ত্তব্য মনে করেন অন্যে তাহাকে অকর্ত্তব্য মনে করেন। অনুষ্ঠাতৃগণের বুদ্ধিভেদ প্রযুক্ত কর্ত্তব্যের অবধারণ অত্যন্ত সুকঠিন, এইরূপ স্থলে কর্ত্তব্য অবধারণের একমাত্র উপায় নীতিশাস্ত্র। প্রদীপ যেমন অন্ধকারাবৃত বস্তুকে প্রকাশ করে এইরূপ শাস্ত্রও অনুষ্ঠাতৃগণের মতিভেদে আবৃত কর্ত্তব্যের প্রকাশ করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে সাধ্য ও অসাধ্য কার্য্যের নিরূপণ করিয়া তদনুসারে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিকূল দৈব বশতঃ কার্য্যের অসিদ্ধি হইলেও তাহাতে কোনও খেদের অবসর থাকে না। বিজিগীষু রাজগণ স্বীয় ক্রোধবেগ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষয়হীন প্রভূত ফলসিদ্ধি নিরূপণ করিয়া স্বীয় পুরুষকারকে উপায়ের সহিত মিলিত করিয়া থাকেন, প্রভূত ফলের নিরূপণ না করিয়া তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অভ্যুদয়কামী পুরুষ রোষপ্রযুক্ত কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। বিজিগীষু নরপতি পরাক্রমশালী হইলেও যদি তিনি স্বীয় ক্রোধবেগ নিবারণ না করেন তবে তাঁহার ক্ষয় অনিবার্য্য। বিজিগীষু নরপতি কখনও তীক্ষ্ণ ও কখনও মৃদু হইবেন। কিন্তু সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ বা সর্ব্বদা মৃদু হইবেন না। সূর্য্য যেমন সময়ভেদে তীক্ষ্ণ ও মৃদু হইয়া থাকেন, বিজিগীষু নরপতিও তদ্রূপ হইবেন। ক্রোধাদির বেগ ধারণে অসমর্থ পুরুষ বহু সম্পদ্‌যুক্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যে ব্যক্তি কামাদি অরিষড়্‌বর্গের জয় না করে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ক্রোধবশতঃ কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল কাল ও সহায়ের প্রতীক্ষা না করিয়া যাহারা সহসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগকেই প্রাকৃত পুরুষ বলা হয়।

তুমি যে মনে করিতেছ আমাদের সহায়ক নরপতিগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহা সত্য নহে। আমাদের অকৃত্রিম সহায় যদুবংশীয় নরপতিগণ কখনও আমাদের প্রতিকূল আচরণ করিবেন না। যদুবংশীয় নরপতিগণ ও তাঁহাদের মিত্র নরপতিগণ স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্যই সম্প্রতি দুর্য্যোধনের অনুবর্ত্তন

করিতেছেন। কিন্তু আমাদের কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা আমাদের পক্ষই অবলম্বন করিবেন। আমরা বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি অকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবে ঐ সমস্ত নরপতিগণের সহায়তা আমরা লাভ করিতে পারিব না।

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে এপর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের নীতি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতেও তাহাই বলা হইয়াছে কিন্তু কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে ইতঃপর যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ দুর্য্যোধনের নীতির দোষ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কবিরই মনঃকল্পিত, ইহা মহাভারতের বস্তু নহে। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন অভিমানী দুর্য্যোধন স্বীয় মত্ততা বশতঃ তাহার অনুযায়ি নৃপতিবর্গকে অপমানিত করিবে এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়াই তাহার অনুযায়ি নরপতিগণ, দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন। অপমান সকলেরই অসহনীয় বিশেষতঃ পরাক্রমশালি নরপতিগণ কখনও অন্যকৃত অপমান সহন করিতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি মহাভারতীয় কথাবস্তুর বিপরীত। দুর্য্যোধন পক্ষীয় নরপতিগণ কখনও অপমানিতও হন নাই এবং দুর্য্যোধনের পক্ষও পরিত্যাগ করেন নাই। যুধিষ্ঠির আরও বলিতেছেন যে অহঙ্কারমত্ত নরপতিগণ, স্বীয় কার্য্যানুরোধে সাধারণ বিনয়দ্বারা অন্য নরপতিগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেও মত্ত পুরুষের সম্পদই তাহার মত্ততাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে তাহার অনুযায়িগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। দর্প ও অভিমানে উদ্ধত নরপতি কখনও তাহার মূঢ়তা ত্যাগ করিতে পারে না। এবং মোহাভিভূত ব্যক্তি কখনও নীতিপথে আরূঢ় থাকিতে পারে না, এবং নীতিহীন ব্যক্তি সকলেরই বিরাগের পাত্র হইয়া থাকে। সকলের বিরাগভাজন নরপতি অতি সহজেই শত্রু নরপতি কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়া থাকে।

বিজিগীষু রাজার অমাত্যাদি প্রকৃতি বর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাদের অমাত্যগণের বিরাগই রাজার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষশাখার পরস্পর ঘর্ষণজাত অগ্নির দ্বারা বৃক্ষই বিনষ্ট হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্রকুশল নরপতি দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুর বৃদ্ধিতেও উপেক্ষাই প্রদর্শন করিবেন। নীতিপরায়ণ শত্রুর বৃদ্ধিই বিজিগীষু রাজার ক্ষয়াবহ হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্নীতিসম্পন্ন শত্রুর বৃদ্ধি সেই দুর্নীতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুর রাষ্ট্র স্বভাবতঃই বহুছিদ্রযুক্ত হইয়া থাকে। দুর্নীতিই রাষ্ট্রে বহুবিধ দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। বিজিগীষু নরপতি শত্রুর দুর্ব্বল স্থান গুলিতে আঘাত করিয়া অনায়াসে তাহার উচ্ছেদ করিতে পারেন। বিপদই দুর্নীতির পরিণাম। বিপন্ন শত্রু অনায়াসে উচ্ছেদ্য হইয়া থাকে। যেমন নদীর বেগে শিথিলীকৃত নদীর সুউচ্চ তটভূমি ক্রমশঃ নানাখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া নদীগর্ভতেই পতিত হয় এইরূপ দুর্নীতি রাষ্ট্রের অভ্যন্তর ভাগে ও বহির্ভাগে নানাবিধ ভেদ উৎপাদন করিয়া রাষ্ট্রকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে।

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য় সর্গে মহারাজ যুধিষ্ঠির দণ্ডনীতিশাস্ত্রের এই যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নীতিশাস্ত্রানুসারী বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে তাহা সঙ্গত হয় নাই। মহারাজ দুর্য্যোধন যুধিষ্টিরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেও মিত্র মধ্যম ও উদাসীন রাজমণ্ডলের সহিত তাঁহার ব্যবহারের কোন ছিদ্র ছিল না এজন্য বৃহত্তর ভারতের আর্য্য ম্লেচ্ছ নরপতিবৃন্দ দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন এবং মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রকৃতিবর্গও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন তখন রাষ্ট্রের আন্তরক্ষোভ ও বাহ্যক্ষোভ পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধনের নীতিপরিজ্ঞান ও নীতি প্রয়োগের কুশলতায় সেই ক্ষোভ প্রশমিত হইয়াছিল। দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি কতিপয় নরপতি যাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন তাঁহারাই যুধিষ্ঠিরের পক্ষেই যোগদান করিয়াছিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহজমিত্র কেকয়রাজ এবং যদুবংশীয়গণ আংশিকভাবে যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কেকয়রাজ্যের বহু অংশ এবং

যদুবংশীয়গণের মধ্যেও ভোজগণের সহিত ভোজ নরপতি কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধনের পক্ষেই যোগদান করিয়াছিলেন। যে সমস্ত নরপতিগণ দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন নরপতিই দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে দুর্নীতিসম্পন্ন নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দুর্ব্বিনীত শত্রুর স্বীয় দুর্নীতিবশতঃই নাশ হইয়া থাকে ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহা মহাভারতের ঘটনার অনুরূপ নহে। মহাভারতের ঘটনা আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে দুর্য্যোধনের দুর্নীতিবশতঃ তাঁহার রাষ্ট্রে অন্তঃক্ষোভ বা বহিঃক্ষোভ কিছুই উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে যুধিষ্ঠির দুর্নীতিসম্পন্ন, শত্রুর বৃদ্ধিও উপেক্ষার বিষয় ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই।

কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম ভাগে মহারাজ দুর্য্যোধনের যে নীতি বর্ণিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিযুক্ত চার কুরুরাজ্য পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া দুর্য্যোধনের যে নীতির বর্ণনা করিয়াছিল তাহাতে দুর্য্যোধনের নীতিজ্ঞতাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে দুর্য্যোধনকে নীতিপ্রয়োগ কুশলরূপে বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় সর্গে যুধিষ্ঠিরের মুখে দুর্য্যোধনের দুর্নীতি প্রকাশ করায় কবি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে যুধিষ্ঠির যে সমস্ত কথা বলিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩৬ অধ্যায়ে ভীমের উক্তি শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আমি রাজধর্ম্ম সমস্তই অবগত আছি। ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিন্তা করিয়া যে কার্য্য করে সেই যথার্থ নীতিবিৎ। দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি বলপূর্ব্বক বিচ্ছেদ করিয়া এখনই আক্রমণ করা নীতিবিগর্হিত ও ধর্ম্মবিগর্হিত। সুবিচারিত মন্ত্রণা অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে অন্যথা কার্য্যসিদ্ধি হয় না। কেবলমাত্র বল, দর্প ও চাপল্যপ্রযুক্ত এখনই কুরুরাজ্য আক্রমণের কথা যাহা তুমি বলিয়াছ তাহার পরিণাম অতি ভয়াবহ। আজ দুর্য্যোধনের পক্ষে মহারাজ ভুরিশ্রবা ও তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ শল, মহারাজ জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং দুরাধর্ষ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ। ইঁহারা সকলেই মহারাজ দুর্য্যোধনের একান্ত অনুগামী। যে সমস্ত নরপতিগণ পূর্ব্বে আমাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আজ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন এবং দুর্য্যোধনের হিতচিন্তক। ইঁহারা কেহই আমাদের হিতচিন্তা করিবেন না। ঐ সমস্ত নরপতিবর্গ সকলেই পূর্ণ কোষসম্পন্ন ও বহু সৈন্যসমন্বিত। ইঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে আমাদের প্রতিকূল আচরণ করিবেন। কৌরব সৈন্যের মধ্যে যে সমস্ত উত্তম মধ্যমাদি পুরুষগণ রহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পুত্র ও অমাত্যাদি পরিবারবর্গের সহিত সকলকে বহু ধনদ্বারা দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট করিয়াছে; দুর্য্যোধন তাহাদের প্রত্যেকেরই পর্য্যাপ্ত ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। দুর্য্যোধন কেবল তাহাদের ভোগেরই ব্যবস্থা করিয়া দেয় নাই কিন্তু প্রভূত সম্মানদ্বারা ইহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছে। এই বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে সেই সমস্ত নরপতিবৃন্দ ও তাহাদের সৈনিকবৃন্দ দুর্য্যোধনের হিতের জন্য যুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যদিও আমাদের প্রতি ও দুর্য্যোধনের প্রতি সমবৃত্তিসম্পন্নই বটেন তথাপি তাঁহারা যে দুর্য্যোধনের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন—ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ তাঁহারা অবশ্যই করিবেন। আর তাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধনের হিতের জন্য তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। ইঁহারা সকলেই দিব্যাস্ত্রযুক্ত, ধার্ম্মিক ও দেবগণেরও অজেয়। বিশেষতঃ মহারথ কর্ণ দিব্যাস্ত্রবিৎ, অভেদ্য বর্ম্মাবৃত, অপ্রধৃষ্য, অতি অসহিষ্ণু ও আমাদের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। এই সমস্ত মহারথগণকে জয়

না করিয়া যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে পরাজিত করা অত্যন্ত অসম্ভব। হে ভীম! আমি কর্ণের অসাধারণ বীরত্ব এবং সমস্ত বীরগণের মধ্যে কর্ণের অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে অবগত আছি। কর্ণের দুর্ব্বার বিক্রমের কথা চিন্তা করিয়া রাত্রে আমার নিদ্রা হয় না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই সমস্ত বাক্যশ্রবণ করিয়া অতি ক্রুদ্ধ ভীমসেন অত্যন্ত বিমনা ও ত্রস্ত হইয়াছিলেন এবং ততঃপর যুধিষ্ঠিরকে আর কিছুই বলেন নাই।

নবম অধ্যায়

শিশুপাল বধকাব্যে দণ্ডনীতি

আমরা কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের উপযোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি শিশুপাল বধকাব্যে মহাকবি মাঘ দণ্ডনীতি শাস্ত্রের কীদৃশ আলোচনা করিয়াছেন তাহার আভাস প্রদান করিব। এস্থলে শিশুপাল বধকাব্যের কাব্য সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ না করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রে যাহা অপেক্ষিত তাহারই আলোচনা করা হইবে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যশাস্ত্র পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে সর্ব্বত্রই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে আমাদের অরুচি বশতঃ কাব্যেও যে যে স্থলে দণ্ডনীতি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে সেইস্থলগুলিকে আমরা বিরস নিঃসার বলিয়া মনে করি। ইহা সুনিশ্চিত যে প্রাচীন ভারতের মহা কবিগণ রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচনাকে বিরস নিঃসার মনে করেন নাই। মনে করিলে তাঁহাদের মহাকাব্যাদিতে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনাকে স্থান দিতেন না। মহাকবি মাঘ, ভারবির পরবর্ত্তী হইলেও মাঘের সময়েও ভারতীয় জনতা রাজনীতি শাস্ত্রে নিতান্ত বিমুখ হয় নাই। নীতি শাস্ত্রের আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিত সমাজকে যদি বিমূখ দেখিতেন তবে মহাকবি মাঘ কখনই স্বীয় মহাকাব্যে দণ্ডনীতির আলোচনা করিতেন না। ভারতের যত অধিক অধঃপতন হইয়াছে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের আলোচনাও তত অধিক উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

শিশুপাল বধ মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি মাঘ দণ্ডনীতি শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। মহাকবি মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে তাঁহার কাব্যের কথাবস্তু সৎকলন করিয়াছিলেন। সভাপর্ব্বের অন্তর্গত শিশুপালবধ পর্ব্বে শিশুপাল বধ বর্ণিত হইয়াছে এবং শিশুপাল বধপর্ব্বের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রিত শিশুপালের বিক্ষোভের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তখন যদুবংশীয়গণ, মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে মধুরাপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্বারকানগরী যে প্রদেশে অবস্থিত তৎকালে ঐ প্রদেশের নাম আনর্ত্ত ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার সুসমাপ্তি করিতে পারিবেন কিনা ইহাতে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া দ্বারকানগরীতে দূত প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজসূয়যজ্ঞ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিয়াছিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনিই করিতে পারেন যিনি সম্রাট্। সম্রাট্ না হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যায় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন খাণ্ডবপ্রস্থের রাজা তখন তিনি রাজা হইলেও সম্রাট্ নহেন, সমস্ত মহীপতিগণকে পরাজিত করিয়া করদীকৃত করিতে না পরিলে সম্রাট্ হওয়া যায় না। সমস্ত মহীপতিগণকে জয় করিয়া সম্রাট্পদ লাভের জন্য যুধিষ্ঠির উৎসুক হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সম্রাট্ পদলাভ করিতে পারিবেন কিনা এবং সম্রাট্ হইলেও মহীপতিগণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে করপ্রদানপূর্ব্বক আনত হইয়া সম্মিলিত হইবেন কিনা ইহাতে যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত সংশয় ছিল। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

সভাপর্ব্বের ১৫ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির নিজেই বলিয়াছেন যে 'সম্রাট্শব্দোহি কৃচ্ছ্রভাক্'--সম্রাট্পদ লাভ সাধারণ কার্য্য নহে। সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে মহীপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞসভায় আগমন করিতেন এবং প্রকাশ্যভাবে করপ্রদান পূর্ব্বক সম্রাটের নিকট আনতি স্বীকার করিতেন। সম্রাটের নিকট সমস্ত মহীপতিগণের আনতি প্রদর্শন রাজসূয় যজ্ঞের একটি অসাধারণ ব্যাপার। যাঁহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নাম শুনিয়া

নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন রাজসূয় ও অশ্বমেধ এই দুইটি মহাযজ্ঞ বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি হইয়া সমস্ত মহিপতিগণকে করপ্রদানে বাধ্য করিয়া সম্রাটের নিকটে আনত সমস্ত মহীপালগণের সহিত সম্রাট্ এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সমস্ত পৃথিবী অধীশ্বর হইয়া সমস্ত রাজগণকে আনত করিয়া সম্রাট্পদ লাভ করিব এই যে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ইহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম উদ্ঘোষিত হইয়াছে। রাজসূয়ের এই আদর্শ বর্ত্তমান ভারতবাসিগণের নিকট উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। অনেক ভারতবাসী হয়ত মনে করেন ভারতবর্ষের সকলেই যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বারে দ্বারে উদরান্নের জন্য প্রার্থী হইয়া বিচরণ করে, তাহাই বোধ হয় ভারতবর্ষের উচ্চতম আদর্শ। আমরা মনে করি এই উচ্চতম আদর্শ প্রায় আরূঢ়ই হইয়াছি। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতেই ভারতবাসী এই উচ্চতম আদর্শে আরূঢ় হইতে পারিবে। আজ ভারতবর্ষের হিন্দু জীবিত নাই। বেদের উচ্চতম আদর্শ আজ ভারতবাসীর হৃদয়স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রানুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উৎসাহী হইয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান বিরোধী মহারাজ জরাসন্ধকে যুদ্ধে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রানুসারেই ভীম ও অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পঞ্চপর্ব্বত পরিবেষ্টিত মগধের রাজধানী গিরিব্রজে পাঠাইয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধেই মগধরাজ ভীমের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নানাদেশীয় বহুসংখ্যক রাজগণকে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন আর এজন্য বন্ধনমুক্ত মহীপতিগণ পাণ্ডবগণের বিশেষ মিত্ররূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার পর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হন ও পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ততঃপর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভূতসৈন্য ও রণসম্ভার লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। দিগ্বিজয়ে পরাজিত নরপতিগণ বহু ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ করা হয়। মহাযজ্ঞের সুনির্ব্বাহের জন্য যদুবংশীয়গণ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যদুবংশীয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়া বহুধনরাশি ও সৈন্যগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞের সহায়তার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তখন দ্বারকানগরীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং যদুবংশীয়গণের প্রধান মন্ত্রী উদ্ধব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহায়তার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম ও তাঁহার পক্ষানুযায়ী অপর যদুবংশীয়গণ, যুধিষ্ঠিরের সহায়তার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন সঙ্গত মনে করেন নাই। যদিও কৃষ্ণ আপাততঃ বলরামের যাহা মত তাহার অনুরূপই বলিয়াছিলেন তথাপি কৃষ্ণের যথার্থ অভিমত উদ্ধব প্রকাশ করিয়াছিলেন। চেদিরাজ শিশুপালের সহিত যদুবংশীয়গণের বিশেষ কারণবশতঃ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া চেদিরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বলরাম পরামর্শ দিয়াছিলেন। চেদিরাজ্য আক্রমণ করা হইবে কি যুধিষ্ঠিরের সহায়তার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থেই যাইতে হইবে ইহার একতর পক্ষ নির্দ্ধারণের জন্য দ্বারকাতে যে নিভৃত মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইয়াছিল যে সভাতে মাত্র বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব উপস্থিত ছিলেন সেই মন্ত্রণা সভার আলোচ্য বিষয় লইয়া শিশুপালবধকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ আরব্ধ হইয়াছে। এই মন্ত্রণা সভার যে বিবরণ মহাকবি মাঘ প্রদান করিয়াছেন তাহা মহাভারতে বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। ইহা মহাকবি মাঘেরই কল্পনা।

এই রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে কেবল যদুবংশীয়গণই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত রাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ, ভূমিপতিগণ, বৈশ্যগণ এবং মান্য শূদ্রগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্

ভূমিপানথ। বিশশ্চ মান্যান্শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানান যতেতিচ॥ সভাপর্ব্ব, ৩৩|৪১॥ যাহা হউক শিশুপালবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ৮ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে উদ্ধব ও বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন নিভৃতমন্ত্রণা সভায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রণাসভার কার্য্যপ্রারম্ভের জন্য প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় বিক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে করদ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ দিগ্বিজয়ী মহাবীর। এজন্য আমরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সহায়তার জন্য উপস্থিত না হইলেও যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—আমরা সকলে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সম্মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপ্তির পরে চেদিরাজ্য আক্রমণ করিতে পারিব, এরূপও মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ আমাদের শত্রু শিশুপাল ক্রমশঃ অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নীতিবিৎ কোন বিজিগীষু রাজারই শত্রুর বৃদ্ধি উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। বিবর্দ্ধমান শত্রু ও রোগ উভয়ই তুল্য; ইহাদের কোনওটিই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। নীতিবিৎগণ ইহাই বলিয়াছেন।

যদি মনে করা যায় আমরা আমাদের পরম সুহৃৎ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের সহায়তার জন্য গমন না করিয়া আমাদের শত্রুকে শাসন করিতে গেলে লোকে আমাদিগকে স্বার্থপর বলিয়া মনে করিবে। আমাদের মিত্রবৎসলতা থাকিবে না। এরূপও মনে করা উচিত নহে। কারণ আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেদিরাজকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি না। চেদিরাজ আমার প্রতি অত্যন্ত দ্রোহ সম্পন্ন এজন্য আমার কোনও পরিতাপ নাই, কিন্তু চেদিরাজ দুর্নীতি সম্পন্ন হইয়া বহুলোকের দুঃখের কারণ হইয়াছে। শিশুপালের অত্যাচারে উৎপীড়িত জনগণের দুঃখ আমাকে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছে। তাহাদের দুঃখ নিবারণের জন্য অতি সত্বর শিশুপালকে শাসন করা আবশ্যক। আমরা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সম্মিলিত হই নাই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের যে সন্তাপ হইবে তাহা শিশুপালের শাসনের পরে যুধিষ্ঠিরকে প্রার্থনা দ্বারাও প্রসন্ন করা যাইতে পারিবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া বলরাম ও উদ্ধবের মত শ্রবণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে প্রস্তুত বিষয়ে আমি আপনাদের মত শ্রবণ করি নাই, শ্রবণ করিলে হয়ত আমার মত পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আপনাদের মত শ্রবণ না করিতেছি সেই পর্য্যন্ত আমার এই মত বুঝিবেন। এক্ষণে আপনাদের মত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞব্যক্তিও একাকী কর্ত্তব্যার্থের নির্ণয় করিতে পারে না তাহার সংশয়ই হইয়া থাকে। চেদিরাজের শাসন ও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন ইহার কোন্টি কর্ত্তব্য তাহা আমি এখন পর্য্যন্তও নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। আপনাদের মত শুনিলে পরে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। কিন্তু আপনাদের মত শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আমার যাহা মত তাহা প্রকাশ করিলাম। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অল্পকথায় স্বীয় বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়া বিরত হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ স্বভাবতঃই অল্প ভাষী হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের মত প্রকাশের পরেই মন্ত্রী উদ্ধবেরই মত প্রকাশ করা উচিত ছিল। মন্ত্রী উদ্ধব রাজনীতিশাস্ত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৬৪ অধ্যায়ে উদ্ধবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে উদ্ধব যদুবংশীয়গণের প্রধানমন্ত্রী এবং বৃহস্পতির সাক্ষাৎশিষ্য, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও কৃষ্ণের অতিপ্রিয়সখা। উদ্ধব বৃহস্পতির সাক্ষাৎশিষ্য বলিয়া রাজনীতিশাস্ত্রে অত্যন্ত নিষ্ণাত। এই উদ্ধবই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাতব্যাধি নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং মহাকবি মাঘও শিশুপাল বধের দ্বিতীয় সর্গের ১৫ শ্লোকে উদ্ধবকে পবনব্যাধি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদ্ধব প্রণীত রাজনীতিশাস্ত্র বর্ত্তমান সময়ে উপলব্ধ নাই। কিন্তু প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকারগণ উদ্ধবের সিদ্ধান্ত নানাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌটিল্যও তাঁহার অর্থশাস্ত্রে উদ্ধবের মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

মন্ত্রণাসভায় উদ্ধব উপস্থিত থাকিলেও উদ্ধবের মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই অসহিষ্ণু হইয়া বলরাম স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলরাম বলিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে নির্দ্দোষ ও তেজস্বিতাপূর্ণ বাক্য বলিয়াছেন তাহাতে

তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা গিয়াছে। আমি মনে করি বাক্যদ্বারা তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার মতানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই কৃষ্ণের কথার যথার্থ উত্তর প্রদান করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অল্প কথায় যাহা বলিয়াছেন বহুকথা বলিলেও তদপেক্ষা অধিক কিছু বলা সম্ভব নয়। শব্দের বাহুল্যই অর্থবাহুল্যের কারণ নহে। প্রচণ্ড দারুদহণের জ্যোতিঃ সূর্য্যের জ্যোতিকে অতিক্রম করিতে পারে না। সূর্য্যদ্বারা যাদৃশ প্রকাশ হয়, বহুতর অগ্নিদ্বারাও তাদৃশ প্রকাশ হয় না। সুতরাং কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক বস্তু প্রকাশ করা অসম্ভব হইলেও আমি যাহা বলিব তাহা কৃষ্ণের উক্তিরই ভাষ্যস্বরূপ হইবে।

এইরূপে বলরাম কৃষ্ণের মতানুসারে চেদিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা সমর্থন করিয়া মনে করিয়াছিলেন—নীতিশাস্ত্রবিৎ উদ্ধব স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য দ্বারা আমাদের মতের নিঃসারতা প্রদর্শন করিতে পারেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা আমাদের মত হইলেও রাজনীতিবিৎ-উদ্ধব রাজনীতিশাস্ত্রের নানারূপ বাক্য দ্বারা আমাদের মতের বিরোধ করিতে পারেন। তিনি রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞ; আমি রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞ নহি। তিনি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে পারেন। আমাকে কেন, অনেক পণ্ডিতকেও পারেন। সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্তরূপে এবং অপসিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্তরূপে, করণীয়কে অকরণীয়রূপে এবং অকরণীয়কে করণীয়রূপে রাজনীতি শাস্ত্রবিৎ উদ্ধব প্রতিপাদন করিতে পারেন। উদ্ধব নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। কিন্তু নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়াই তিনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে বলিলে তাঁহার বাক্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। মন্দবুদ্ধি পুরুষও রাজনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নানাকথার অবতারণা করিতে পারে। রাজনীতিশাস্ত্রে বাগ্মী হইলেই যে তাহার মত গ্রহণযোগ্য হইবে এরূপ বলা যায় না। উপস্থিত কার্য্যতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া রাজনীতিশাস্ত্রের বহু কথার অবতারণাপূর্ব্বক মতান্তর প্রদর্শন করিলেও তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—নীতিশাস্ত্রোক্ত এই ছয়টি গুণ ও প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তিরূপ ত্রিবিধশক্তি এবং এই ত্রিবিধ শক্তি হইতে প্রভুসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি ও উৎসাহসিদ্ধিরূপ ত্রিবিধ সিদ্ধি—ষাড়্গুণ্য প্রয়োগের ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধিরূপ ত্রিবিধ ফল, ঔশনসতন্ত্রে ও বার্হস্পত্য প্রভৃতি তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা যাড়্গুণ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিতে পারেন, মন্দবুদ্ধিও ঐ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যামাত্র দ্বারাই কর্ত্তব্যাবধারণ হয় না। মন্ত্রণা সভায় পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রই আলোচিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র নির্ণয়ে অসমর্থ, তাঁহাদের কেবল সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি গুণের সংখ্যা নির্দ্দেশ, শক্তির সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রভৃতি দ্বারাই কর্ত্তব্যাবধারণে সামর্থ্য জন্মে না। যাঁহারা মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ নির্ণয়ে শক্তিসম্পন্ন তাঁহারাই কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ। মহীপতিগণের সন্ধি বিগ্রহাদিই কার্য্যশরীর। মন্ত্রণা তাহার আত্মস্থানীয়। এই মন্ত্রণা পঞ্চাঙ্গ। যেমন বৌদ্ধসিদ্ধান্তে রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত আর আত্মা বলিয়া কিছু নাই এইরূপ মহীপতিগণেরও মন্ত্রণার পাঁচটি অঙ্গ ব্যতীত অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই। (১) কর্ম্মের আরম্ভোপায়, (২) পুরুষদ্রব্য সম্পৎ, (৩) দেশকাল বিভাগ (৪) বিনিপাত প্রতিকার, (৫) কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচটি মন্ত্রণার অঙ্গ। এই পাঁচটি অঙ্গের বিশেষ পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধের সপ্তম পরিচ্ছেদে—কুম্ভকর্ণের রাজনীতির উপদেশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি। বলরাম বলিয়াছেন মহীপতিগণের সন্ধি বিগ্রহাদিরূপ কার্য্যশরীরের মন্ত্রণাই আত্মা। এই মন্ত্রণা পঞ্চাঙ্গ। এই পাঁচটি অঙ্গ ভিন্ন আর মন্ত্রণা বলিয়া কিছু নাই। কেবল ষাড়্গুণ্যাদির পাঠমাত্রই মন্ত্রণা নহে।

মন্ত্রণা পঞ্চাঙ্গ বলা হইয়াছে। মহীপতিগণের মন্ত্রণা, মহীপতিগণেরই সন্নদ্ধ সৈনিকের মত অধীর—চঞ্চল। সর্ব্বাঙ্গ সংবৃত সৈনিক যেমন বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না, সন্নদ্ধসৈনিকের কার্য্যবিলম্বে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। শত্রুপক্ষ উপজাপ দ্বারা সৈন্যগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বীয় প্রভুর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া থাকে এইরূপ সংবৃত মন্ত্রও—রক্ষিত মন্ত্রও মন্ত্রণানুসারে কার্য্যারম্ভে বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না। মন্ত্রণানুসারে কার্য্যারম্ভে বিলম্ব ঘটিলে মন্ত্রভেদ ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ অন্যেও তাহা অবগত হইয়া থাকে। মন্ত্র শত্রুর কর্ণগোচর

হইলে সমস্ত কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই সভায় আলোচ্য বিষয় আর অধিক নাই। কৃষ্ণের কথাতেই মন্ত্র নিশ্চিত হইয়াছে। আর আমাদের কার্য্যারম্ভে বিলম্ব করা উচিত নহে। রাজনীতি শাস্ত্রের বহু কথার অবতারণা করা বৃথা। বহু রাজনীতিশাস্ত্র মন্থন করিলেও ইহাই তাহার সারনির্য্যাস যে নিজের বৃদ্ধি ও শত্রুর হানি সম্পাদন করা। ইহাই নীতিশাস্ত্রের সারকথা। এই দুইটি সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়াই সুবিশাল নীতিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে।

যদি মনে করা যায় যদুবংশীয়গণের যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ হইয়াছে—তাহার যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। আর শত্রুর হানি সম্পাদনের আবশ্যকতা কি—এইরূপ শঙ্কা করিয়া বলরাম বলিয়াছেন যে—শ্রেষ্ঠ মহীপতিগণ প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তৃপ্ত হন না, মহীপতিগণ লব্ধ ঐশ্বর্য্যে পরিতৃপ্ত থাকেন না। সন্তোষ ব্রাহ্মণগণেরই ভুষণ। কিন্তু মহীপতিগণের ইহাই দোষ। নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "অসন্তুষ্ট দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ মহীভৃতঃ।" মহাত্মগণ প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভেও যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চন্দ্রোদয়াকাঙ্ক্ষী মহাসমুদ্র। অপার জলরাশিদ্বারা পূর্ণ থাকিয়াও সমুদ্র, স্বীয় জলের বৃদ্ধির জন্য চন্দ্রোদয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মহীপতিগণের লব্ধ সম্পদে সন্তোষ মহাদোষ। যে মহীপতি স্বল্প সম্পদ লাভ করিয়াই কৃতার্থম্মন্য হন তাহাতে ভগবান্ও তাহার কোনও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন না। যাহার বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই ভগবান্ও তাহার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক নন। শ্রেষ্ঠ মহীপতিগণ পরাক্রমলব্ধ বৃদ্ধিকেই বৃদ্ধি বলিয়া মনে করেন। অন্যের দ্বারা প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যকে তাঁহারা ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। শত্রুকে সমূলে বিনাশ না করিয়া মানী মহীপতিগণ কখনও কৃতকৃত্য হইতে পারেন না। সূর্য্য ঘোর অন্ধকাররাশিকে সমূলে না বিনাশ করিয়া কখনও উদিত হন না। মহীপতিগণের উদয়ও সূর্য্যের উদয়ের মত।

আরও কথা এই যে শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে মহীপতির প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব। যেমন জল, ধূলিরাশিকে পঙ্করূপে পরিণত করিয়াই ধূলিরাশির উপরিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, ধূলিরাশি জলদ্বারা উচ্ছিন্ন হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ধূলিরাশির উপর জল অবস্থান করিতে পারে না। যদি মনে করা যায় একমাত্র শিশুপালই আমাদের শত্রু, আর কেহ শত্রু নাই, অপর মহীপতিগণ সকলেই আমাদের মিত্র; সুতরাং একাকী শিশুপাল আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে যতকাল পর্য্যন্ত একটি শত্রুও অবস্থান করে ততকাল পর্য্যন্ত বিজিগীষু নরপতি কোনরূপেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হন না। সমস্ত দেবগণ ও গ্রহগণ চন্দ্রমার মিত্র। এই মিত্রগণের সমক্ষেই একাকী রাহু চন্দ্রমাকে পীড়িত করিয়া থাকে। সুতরাং শত্রু একাকী হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। অতি সত্বরই তাহার উচ্ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

যদি মনে করা যায় শিশুপাল ক্ষুদ্র শত্রু; সে আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শিশুপাল যে দুরুচ্ছেদ্য শত্রু বলরাম তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—শত্রু ও মিত্র প্রত্যেকেই ত্রিবিধ হইয়া থাকে। (১) কৃত্রিম শত্রু, কৃত্রিম মিত্র (২) সহজ শত্রু, সহজ মিত্র, এবং (৩) প্রাকৃত শত্রু, প্রাকৃত মিত্র। যে যাহার উপকার করিয়া থাকে উপকার দ্বারা সে তাহার কৃত্রিম মিত্র হইয়া থাকে। এইরূপ যে যাহার অপকার করে সে তাহার কৃত্রিম শত্রু। কার্য্য দ্বারাই কৃত্রিম শত্রু ও কৃত্রিম মিত্র হইয়া থাকে। হিতাচরণকারী স্থিরমিত্র এবং অহিতাচরণকারী স্থিরশত্রু। এই মিত্রতা ও শত্রুতার কখনও অপায় ঘটে না। এজন্য কৃত্রিম শত্রু ও কৃত্রিম মিত্রই গরীয়ান্। সহজ শত্রু ও সহজ মিত্র এবং প্রাকৃত শত্রু ও প্রাকৃত মিত্র এরূপ নহে। তাহারা কোনও উপকার করিয়া মিত্র হয় নাই এবং অপকার করিয়া শত্রু হয় নাই। মাতৃষ্বসার পুত্র ও পিতৃষ্বসার পুত্র প্রভৃতি সহজ মিত্র। এইরূপ পিতৃব্য ও তাহার পুত্র সহজ শত্রু। স্বরাষ্ট্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাষ্ট্রের রাজা প্রাকৃত শত্রু এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দেশের রাজা প্রাকৃত মিত্র হইয়া থাকে। সহজ শত্রু ও সহজ মিত্র এবং প্রাকৃত শত্রু ও প্রাকৃত মিত্র স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে কখনও মিত্রও শত্রু কখনও শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু কৃত্রিম শত্রু ও

কৃত্রিম মিত্র অনিয়তরূপ নহে। কৃত্রিমশত্রু শত্রুই বটে এবং কৃত্রিমমিত্র মিত্রই বটে। এজন্যই কৃত্রিম শত্রু ও কৃত্রিম মিত্রকে গুরুতর বলা হইয়াছে। শিশুপাল আমাদের কৃত্রিম শত্রু। এজন্য শিশুপাল গুরুতর শত্রু।

যদি বলা যায় শিশুপাল কৃত্রিম শত্রু হইলেও ত আমাদের পিতৃষ্বসারই পুত্র। এজন্য শিশুপাল আমাদের সহজ মিত্রও বটে। সহজ মিত্রের সহিত সন্ধি করাই সঙ্গত। কিন্তু তাহার উচ্ছেদের জন্য তাহার রাজ্য আক্রমণ করা উচিত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে উপকারী শত্রুর সহিতও সন্ধি করা উচিত। কিন্তু অপকারী মিত্রের সহিত কখনও সন্ধি করা উচিত নহে। বস্তুতঃ কথা এই, যে উপকারী সেই মিত্র, যে অপকারী সেই শত্রু। উপকারই মিত্রের লক্ষণ; অপকারই শত্রুর লক্ষণ। সুতরাং সহজ মিত্র বা প্রাকৃত মিত্র উভয়ই অপকার করিলে শত্রুই হইবে। শিশুপাল কিরূপে কৃত্রিম শত্রু হইয়াছে এবং কি কি অপকার করিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলরাম বলিয়াছেন যে—কৃষ্ণ যখন রুক্মিণী হরণ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল আমাদের সহিত অত্যন্ত বিরোধ করিয়াছিল। যদিও শিশুপাল পরাজিতই হইয়াছিল তথাপি শিশুপাল এই বৈর কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। রুক্মিণীকে লাভ করিবার জন্য শিশুপালও অত্যন্ত উদ্‌যুক্ত ছিল। স্ত্রীও গুরুতর শত্রুতার মূল হইয়া থাকে। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করায় শিশুপালের সহিত আমাদের শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছে।

আরও কথা এই যে—কৃষ্ণ যখন প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি নরকাসুরকে জয় করিবার জন্য প্রাগ্জ্যোতিষে গমন করিয়াছিলেন তখন এই শিশুপাল আমাদের দ্বারকানগরী অবরোধ করিয়াছিল। শিশুপাল মনে করিয়াছিল যে কৃষ্ণ দ্বারকানগরীতে উপস্থিত নাই এই সময়ে দ্বারকানগরীর অবরোধ করিলে আমি অনায়াসে দ্বারকানগরী বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিব। দুরাচার শিশুপাল যদুবংশীয় বভ্রুর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছিল। এমন জুগুপ্সিত কার্য্যের উচ্চারণেও পাপ হয়। এইরূপে আমাদের দ্বারা শিশুপাল উৎপীড়িত হইয়াছে এবং শিশুপালের দ্বারাও আমরা উৎপীড়িত হইয়াছি। আর তাহাতে শিশুপাল আমাদের সহজ মিত্র হইলেও কৃত্রিমশত্রুরূপে পরিণত হইয়াছে। অপকারীকেই কৃত্রিম শত্রু বলা হয়। এই কৃত্রিম শত্রু শিশুপালকে আমরা যদি উপেক্ষা করি তবে আমাদেরই গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবে। যে ব্যক্তি—দ্বেষযুক্ত ও বিক্রমশালি শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করে—তাদৃশ শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করে সে ব্যক্তি অরণ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়া যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে সেইদিকে শয়ন করিয়া থাকে। তাদৃশ শয়নকারীর মৃত্যু যেমন সুনিশ্চিত এইরূপ শত্রুর প্রতি উপেক্ষাকারীর বিনাশও সুনিশ্চিত।

যদি মনে করা যায় শিশুপাল যেমন আমাদের কৃত্রিম শত্রু এইরূপ সহজ মিত্রও ত বটে। ইহাতে বক্তব্য এই যে—ক্ষমাশীলব্যক্তি একবার অপকারকারীর অপকার যদি ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন তবে ক্ষমা করুন। কিন্তু যে পুনঃ পুনঃ অপকার করে তাহাকে ত ক্ষমাশীলও ক্ষমা করিতে পারে না। শিশুপালও আমাদের পুনঃ পুনঃ অপকার করিতেছে। যদি মনে করা যায় সর্ব্বদা ক্ষমাই ত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের ভূষণ। সুতরাং শিশুপাল পুনঃ পুনঃ অপকার করিলেও তাহাকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যে কখনও অপরাধ করে এবং সেই অপরাধও কাহারও উচ্ছেদ কামনা করিয়া করে না এইরূপ অল্প অপরাধ ক্ষমা করা যাইতে পারে, এইরূপ স্থলে ক্ষমা পুরুষের ভূষণই বটে। কিন্তু উচ্ছেদকারী শত্রুর প্রতি পরাক্রমই ভূষণ হইয়া থাকে। যে শত্রুদ্বারা গুরুতরভাবে অপকৃত হইয়াও—শত্রুকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াও দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে জীবন ধারণ করে তাদৃশ পুরুষের জন্ম, কেবল জননীর ক্লেশপ্রদই বটে। শত্রুদ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াও যে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না তাদৃশ পুরুষ ভূমিতলস্থিত ধূলিরাশি হইতেও নিকৃষ্ট। ধূলিরাশিও পাদদ্বারা আহত হইলে আঘাতকর্ত্তার শিরোদেশে আরোহণ করিয়া থাকে। পৌরুষশূন্য পুরুষের জীবনই বৃথা। পর্ব্বত ও সমুদ্র উভয়ই অলঙ্ঘ্য, পর্ব্বতের অলঙ্ঘ্যতার কারণ তাহার উত্তুঙ্গতা এবং সমুদ্রের অলঙ্ঘ্যতার কারণ তাহার অগাধতা। পর্ব্বতে অগাধতা নাই

সমুদ্রেও উত্তুঙ্গতা নাই। কিন্তু মনস্বি পুরুষে অলঙ্ঘতার কারণ এই দুইটি ধর্ম্মই আছে। এজন্য মনস্বি পুরুষ সর্ব্বদা অলঙ্ঘ্য। মনস্বিপুরুষকেও যদি শত্রু লঙ্ঘন করিতে পারে তবে তাহার মনস্বিতাই বৃথা। এজন্য আমাদের শিশুপালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া পৌরুষ প্রদর্শন করাই উচিত।

কেবল মৃদুতা ঘোর অনর্থের মূল। চন্দ্র ও সূর্য্যের অপরাধ তুল্য হইলেও রাহু পুনঃ পুনঃ চন্দ্রকেই গ্রাস করে কদাচিৎ সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার কারণ চন্দ্রের মৃদুতা। সূর্য্য তেজস্বী বলিয়া রাহু পুনঃ পুনঃ তাহাকে গ্রাস করিতে সাহস করে না। পৌরুষ অবলম্বনের গুণ অসাধারণ। মৃদুতা অবলম্বন করিলে মহীপতি অবজ্ঞাতই হইয়া থাকেন। পৌরুষ অবলম্বন করিলে সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়া থাকেন। যেমন চন্দ্রমা মৃগকে সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া মৃগলাঞ্ছন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সিংহ মৃগযূথকে বিধ্বংস করিয়া মৃগাধিপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দণ্ডরূপ চতুর্থ উপায় দ্বারা যে শত্রুকে প্রশমিত করিতে হইবে, সেই শত্রুর প্রতি সামরূপ প্রথম উপায়ের প্রয়োগ অত্যন্ত বিরুদ্ধ কার্য্য। যে আমজ্বরে স্বেদ প্রয়োগ বিধেয় কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি তাদৃশ জ্বরে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে? ক্রুদ্ধ শত্রুর প্রতি সামরূপ প্রথম উপায়ের প্রয়োগ সেই শত্রুকে শান্ত না করিয়া তাহাকে উদ্দীপ্তই করিয়া থাকে। অতি উত্তপ্ত ঘৃতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে ঘৃতের তাপ শান্ত না হইয়া উদ্দীপ্তই হইয়া থাকে। যে সমস্ত মন্ত্রিগণ সন্ধি বিগ্রহাদি ছয়টি গুণের বিপরীত প্রয়োগের উপদেশ প্রদান করিয়া মহীপতির অভীপ্সিত বস্তুর বিপ্লব ঘটাইয়া থাকেন তাঁহারা যথার্থ অমাত্য নহেন। তাঁহারা অমাত্যের চিহ্নধারী হইলেও তাঁহারা শত্রু—তাঁহারা নিন্দনীয়। কৃষ্ণ যাহাতে মন্ত্রী উদ্ধবের পরামর্শ গ্রহণ না করেন তাহার জন্যই বলরাম এইরূপ বলিয়াছিলেন।

বলরাম আরও বলিয়াছিলেন যে—নীতিশাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন অমাত্য, কোষ, বল প্রভৃতির পূর্ণতালাভ হইলে বিজিগীষু, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। আবার কোনও কোনও নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে শত্রুরাষ্ট্র যখন দুর্ভিক্ষাদি উৎপাতে উৎপীড়িত থাকিবে, শত্রু বিপন্ন হইলে অবশ্যই তাহাকে আক্রমণ করিবে। শত্রুর বিরোধে যুদ্ধযাত্রার যে দুইটি বৈকল্পিক কারণ নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন সেই দুইটি কারণ সমুচ্চিতভাবে আমাদিগকে শত্রুর বিরোধে যুদ্ধ যাত্রায় উত্থাপিত করিতেছে। আমরা শত্রুকৃত অপকারের প্রতিকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও ঐ দুইটি কারণই আমাদিগকে যুদ্ধ যাত্রায় প্রবৃত্ত করাইতেছে। আমাদের কোষদণ্ডাদি পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদুবংশীয়গণের সৈন্যসমুদ্র সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে পারে। যেমন সমুদ্রের জলরাশি পৃথিবী প্লাবনে সমর্থ হইয়াও বেলাভূমি দ্বারা সঙ্কুচিত অবস্থায় অবস্থান করে, এইরূপ আমাদেরও সৈন্যসমুদ্র কেবল তোমার (কৃষ্ণের) ক্ষমারূপ বেলাভূমি দ্বারাই সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কেবল তোমার ক্ষমার জন্যই আমরা আমাদের সামর্থ্যের অনুরূপ কোনও কার্য্যই করিতে পারি নাই।

আরও কথা এই যে শিশুপালের পরাজয়ের জন্য আমরা উদ্‌যুক্ত হইলে অতি অনায়াসেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমাদের সৈন্যগণই এই কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিবে। তুমি কেবল শত্রুবিজয়রূপ ফলের ভোক্তাই হইবে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না। যেমন সাংখ্যসিদ্ধান্তে বলা হয় যে—পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ভোগ বুদ্ধিই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে পুরুষের কিছুই করিতে হয় না। এইরূপ তোমারও কিছুই করিতে হইবে না। আমাদের শক্তিই যে কেবল উপচিত হইয়াছে তাহা নহে, শত্রুও বিপন্ন। প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ, ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মগধরাজ জরাসন্ধই শিশুপালের অসাধারণ মিত্র ছিল। জরাসন্ধের মৃত্যুতে শিশুপাল মিত্রব্যসনে মগ্ন হইয়াছে। আর যে নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শত্রু আপদ্‌গত হইলেই তাহার বিরোধে যুদ্ধযাত্রা করিবে, ইহা মানী বিজিগীষু রাজার পক্ষে অত্যন্তই লজ্জার কথা। প্রবল শত্রুকে আক্রমণ করিয়া উচ্ছেদ করাই মানী

বিজিগীষুর কাম্য হওয়া উচিত। দেখা যায় পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমাকেই রাহু আক্রমণ করে। চন্দ্রমা যতক্ষণ অপূর্ণ মণ্ডল থাকে ততক্ষণ রাহু তাহাকে গ্রাস করিতে অভিলাষী হয় না।

এইরূপ বলায় আপত্তি এই যে নীতিশাস্ত্রকারগণ তবে আপদ্‌মগ্ন শত্রুকেই আক্রমণ করিবার কথা বলিলেন কেন? পূর্ণবিক্রম শত্রুও যদি বিজিগীষুর আক্রমণ যোগ্য হয় তবে নীতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিবে। শত্রু বিপন্ন হইলে বিজিগীষু তাহাকে আক্রমণ করিবে এই কথা মনুই বলিয়াছেন। "তদা যায়াদ্বিগৃহ্যৈব ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ"—মনু ৭ম্ অধ্যায়. ১৮৩। এতদুত্তরে বলরাম বলিয়াছেন যে অসাধারণ সামর্থ্যশালী বিজিগীষুর জন্য নীতিশাস্ত্রকারগণ এরূপ বলেন নাই। শত্রুর ব্যসনকালে তাহাকে যাঁহারা আক্রমণ করেন তাদৃশ বিজিগীষুর পরাক্রম অন্যপ্রকার। অতি বিক্রমশালী বিজিগীষু নরপতিগণের জন্য নীতিশাস্ত্রকারগণ এরূপ বলেন নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমরা চেদিরাজকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিব, আমরা অবিলম্বে চেদিরাজ্যের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর অবরোধ করিব। গোষ্ঠে অবরুদ্ধ গোসমূহ যেমন তৃণ জল প্রভৃতির অভাবে অত্যন্ত নিপীড়িত হয় এইরূপ মাহিষ্মতী নগরীর অবরোধেও চেদিরাজ সর্ব্ব সহায়তা বঞ্চিত হইয়া আমাদের নিকট আনত হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার যজ্ঞ নির্ব্বাহ করুন, ইন্দ্র স্বর্গ পালন করুন, সূর্য্য প্রকাশ প্রদান করুন, আমরা আমাদের শত্রু বিনাশ করি। সকলেই নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে। আমরা আমাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যেমন ইন্দ্রের বা সূর্য্যের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইতেছি না এইরূপ যুধিষ্ঠিরকেও সহায়তা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অবিলম্বে চেদিরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

বলরামের উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধবকে তাঁহার মত বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে মন্ত্রী উদ্ধব স্বীয় মত বলিতে উদ্যত হইয়া স্বীয় ঔদ্ধত্য পরিহারপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন যে—বিজিগীষু রাজা নিজের মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করিবেন। যেহেতু ঐ দুইটি শক্তি বিজিগীষু রাজার প্রভুশক্তির মূল। যে বিজিগীষু নরপতিগণ মন্ত্রশক্তির অর্থাৎ প্রজ্ঞাশক্তির সমাশ্রয় করেন তাঁহারা কখনও খেদযুক্ত হন না। যাঁহারা যুক্তিযুক্ত প্রজ্ঞাকেই পর্য্যঙ্করূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সর্ব্বদা নিষণ্ন থাকেন তাঁহারা কখনও খেদ অনুভব করেন না। সূক্ষ্মাগ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে অল্প আয়াসে বহুকার্য্য সাধন করা যাইতে পারে—যাহা স্থূল বুদ্ধির দ্বারা সম্ভাবিত নহে। যেমন তীক্ষ্ণাগ্র শর লক্ষ্যবস্তুর অল্পস্থান স্পর্শ করিয়াও বেধ্য প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু স্থূল প্রস্তরখণ্ড বহুস্থানস্পর্শী হইলেও অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য প্রজ্ঞাবল সর্ব্বাগ্রে সম্পাদনীয়। প্রজ্ঞাবলবর্জ্জিত পুরুষ অল্প কার্য্যের জন্য বহু আড়ম্বর করে এবং তাহাতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং কার্য্যও সমাপ্ত করিতে পারে না। কিন্তু প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বহুকার্য্য অল্পায়াসে অব্যগ্র থাকিয়া সম্পাদন করেন এবং কার্য্যের সমাপ্তিও করিয়া থাকেন। কার্য্যসিদ্ধির জন্য উপায়ানুষ্ঠান করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না। উপায়ানুষ্ঠানের সহিত অপ্রমাদ থাকা আবশ্যক। প্রমাদগ্রস্ত হইলে প্রজ্ঞাবানেরও সাধনানুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া থাকে। যেমন মৃগবধ করিবার জন্য ব্যাধ মৃগের গমনপথস্থিত গর্ত্তে লুক্কায়িত থাকিয়া মৃগকে বধ করিতে পারে কিন্তু গর্ত্তস্থিত ব্যাধ যদি নিদ্রিত হইয়া পড়ে তবে মৃগবধ করিতে পারে না। বিজিগীষুর যেমন প্রজ্ঞাশক্তির আবশ্যকতা আছে এইরূপ অপ্রমাদেরও আবশ্যকতা আছে। এইরূপ উৎসাহ শক্তিরও আবশ্যকতা আছে। উৎসাহহীন নরপতি কখনও প্রভুশক্তিলাভে সমর্থ হয় না। এজন্য তাহার উদয়ও কখনও সম্ভাবিত হয় না। উদয়াকাঙ্ক্ষী বিজিগীষু সর্ব্বদা উৎসাহশক্তিসম্পন্ন হইয়া দ্বাদশরাজমণ্ডলে বিরাজমান থাকিবেন। উৎসাহশক্তির প্রভাবেই অর্য্যমাদি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে দিনকর উদিত হইয়া থাকেন।

বিজিগীষু রাজা সর্ব্বলোক বিলক্ষণ পুরুষ। বুদ্ধিই তাঁহার শস্ত্র, অমাত্যাদি প্রকৃতিই তাঁহার অঙ্গ এবং মন্ত্রগুপ্তিই তাঁহার বর্ম্ম, চার তাঁহার চক্ষুঃ এবং দূতই তাঁহার মুখ। বলরাম যে বলিয়াছেন দণ্ডসাধ্য শত্রুর নিকটে সাম প্রয়োগ ব্যর্থ, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বিজিগীষু রাজা সর্ব্বদাই ক্ষাত্রতেজঃ বা সর্ব্বদাই ক্ষমা কখনও অবলম্বন করিবেন না। কালবিৎ মহীপতি কখনও তেজঃ ও কখনও ক্ষমা অবলম্বন করিবেন। যেমন রসবিৎ-কবি রসের অনুগুণরূপে কখনও ওজঃগুণের কখনও প্রসাদগুণের অবলম্বন করিয়া থাকেন।

আর যে বলরাম বলিয়াছেন পুনঃ পুনঃ অপকারীর প্রতি কেহই ক্ষমা প্রকাশ করে না তাহার উত্তর এই যে—বিজিগীষু রাজা শত্রুকৃত অপকার দ্বারা বাহ্যতঃ কোনও বিক্রিয়াসম্পন্ন হইবেন না। কিন্তু শত্রুকৃত অপকার স্মরণ রাখিয়া শত্রুর দুর্ব্বলতা দশাতে শত্রুর প্রতি অসমাধেয় কোপ অবলম্বন করিবেন যাহাতে শত্রুর উচ্ছেদ হইয়া যায়। যেমন মিথ্যা আহারবিহারকারীর দোষ সঞ্চিত হইয়া বাহ্যতঃ কোনও বিকার প্রকাশ না করিয়াই অবস্থান করে, কিন্তু পুরুষের দুর্ব্বলতা দশাতে সেই সঞ্চিতদোষ অসমাধেয় রোগরূপে প্রকাশমান হয়। শত্রু অপকার করিতেছে বলিয়াই অকালে শত্রুর উচ্ছেদে কখনও প্রবৃত্ত হইবে না।

যে বিজিগীষু রাজা স্বমণ্ডলের ও পরমণ্ডলের চিন্তাতে নিবিষ্ট থাকেন এবং এই চিন্তায় যিনি অতিনিষ্ণাত হইয়া ইতর রাজমণ্ডলকে অতিক্রম করেন, তাদৃশ বিজিগীষুদ্বারা শত্রু অনায়াসে উচ্ছেদ্য হইয়া থাকে। উৎসাহরূপ বৃক্ষের প্রজ্ঞাবলই মূল এবং প্রভুশক্তি তাহার ফল। বিমৃষ্যকারী বিজিগীষু রাজার ইতর নৃপতিবর্গ পরিবারস্থানীয় হইয়া থাকে। এক প্রয়োজনরূপ সূত্রে গ্রথিত দ্বাদশ রাজমণ্ডলরূপ মালার মধ্যে প্রজ্ঞাশক্তি ও উৎসাহশক্তি সম্পন্ন বিজিগীষু রাজা মধ্যমণির মত বিরাজমান থাকেন। যিনি স্বীয় শক্তিত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ষাড়্গুণ্যরূপ রসায়ণের প্রয়োগ করেন তাঁহার অমাত্যাদি অঙ্গ দৃঢ় এবং বলবান্ হইয়া থাকে। অসাধ্য বিষয়ে যিনি শান্ত থাকেন এবং স্বশক্ত্যনুসারে নিজের বলপ্রয়োগ করেন তাঁহার অঙ্গ সমূহের বৃদ্ধি হয়। আর যিনি অসাধ্য বিষয়ে বলপ্রয়োগে উৎসাহী হন তাঁহার ক্ষয় অনিবার্য্য। আমি মনে করি চেদিরাজ শিশুপালকে ক্ষুদ্র শত্রু বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। শিশুপাল একাকী এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। রাজযক্ষ্মারোগ যেমন বহুরোগের সহিত সম্বদ্ধ, এইরূপ আমাদের বহু শত্রু নৃপতিগণের সহিত চেদিরাজ সম্বদ্ধ। কালযবন, রুক্মী, শাল্ব, দ্রুম প্রভৃতি আমাদের শত্রুরাজবর্গ সকলেই শিশুপালের অনুযায়ী যেমন অন্ধকার প্রদোষের অনুযায়ী হইয়া থাকে। এরূপ মনে করাও উচিত হইবে না যে এই সমস্ত শত্রু নরপতিগণের সহিত আমরা কৃতসন্ধি—সুতরাং তাহারা শিশুপালের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—এইরূপ বলা উচিত নহে। কারণ শিশুপাল এই সমস্ত শত্রুরাজগণের প্রতি ভেদনীতি প্রয়োগ করিলেই তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে। যেমন ইন্ধনযুক্ত অগ্নি বায়ুর সহায়তায় প্রজ্জলিত হয়। এজন্য শিশুপাল বৃহৎ সহায়সম্পন্ন। বৃহৎ সহায়সম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কার্য্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদীসমূহ মহানদীর সহায়তায় মহাসমূদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। বৃহৎ সহায় ক্ষুদ্র যাহা পারে, বৃহৎ সহায় এবং নিজে বৃহৎ শিশুপাল তাহা অনায়াসেই পারিবে। শিশুপালের মিত্র নরপতিবৃন্দ এবং আমাদের শত্রু নরপতিসমূহ, শিশুপালকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিরোধে প্রবৃত্ত হইবে। আজ যদি আমরাই সমস্ত নরপতিবৃন্দকে আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যুক্ত করিয়া তুলি তবে আমাদের মিত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ পণ্ড হইবে এবং আমরাই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞধ্বংসকারিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইব। যদি বলা যায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড হইলেই বা দোষ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদের বান্ধব এবং এই গুরুকার্য্যের ভার আমাদের সহায়তাতেই বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যিনি আমাদের সহায়তায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন আমাদের দ্বারাই সেই কার্য্যের বিঘ্ন হইলে মহান্ অনর্থ হইবে। মহাত্মগণ আনত শত্রুর প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন মহানদী স্বীয় সপত্নীগণকেও অর্থাৎ আশ্রিত ক্ষুদ্র নদীসমূহকেও সমুদ্রের সহিত মিলিত

করিয়া দেয়। আমরা আজ যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাচরণ করিলে আর ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে পারিব না।

আরও বিশেষ কথা এই যে কৃষ্ণ তাঁহার পিতৃষ্বসা শ্রুতশ্রবার নিকটে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য ও পিতৃষ্বসার গৌরব রক্ষার জন্য আমাদের শিশুপালের অপরাধ সহন করা উচিত। শিশুপালের বধকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিনাশ হইতে পারে না অর্থাৎ শিশুপালের শত অপরাধ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিনাশ পূর্ণ হইতে পারে না। আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করিব বলিয়া শিশুপালকে কখনও উপেক্ষা করিব না। শত্রু রাজ্যসমূহে যে অষ্টাদশ তীর্থ বিদ্যমান আছে তাহাতে কর্ম্মকুশল গূঢ়চারবর্গকে নিযুক্ত করিয়া শত্রুরূপ জলরাশির তলদেশ নিরীক্ষণ করিব। এই অষ্টাদশ তীর্থের বিশেষ পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধের ৩৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করিয়াছি। যে বিজিগীষু রাজা চারের সাহায্য গ্রহণ করেন না, তাঁহার নীতি কখনও সফল হইতে পারে না। আমরা শত্রুরাজ্যে গূঢ় পুরুষগণের এরূপ ব্যবস্থা করিব যে যাহারা শত্রু দেশবাসী যাহাদের কার্য্যকলাপে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না, যাহারা শত্রুগণের বিশ্বাসাস্পদ এইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণকে আমরা উভয়বেতনরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারাই শত্রুরাজগণের স্বীয়সচিবাদির প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদক কূটলেখ প্রদর্শন করিয়া শত্রুসঙ্ঘের মুখ্যসচিবাদি প্রকৃতিবর্গকে শত্রুরাজা হইতে ভেদযুক্ত করিব। আর তাহাতে শত্রু নরপতিগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। গূঢ় পুরুষগণ দ্বারা উৎসাহিত করিয়া আমাদের মিত্রপক্ষীয় সমস্ত নরপতিগণকে সন্নদ্ধভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সম্মিলিত হইবার জন্য সম্মত করাইব। গূঢ়পুরুষগণ দ্বারা আমাদের মিত্রপক্ষীয় নরপতিগণকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিব যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞ দর্শনের ছলে তাঁহারা যেন চতুরঙ্গসেনা যুক্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। যজ্ঞদর্শনের জন্য আগমন করিলে কাহারও সন্দেহ উৎপন্ন হইবে না। আমাদের মিত্রপক্ষীয় নরপতিগণকে গুপ্তচরদ্বারা ইহাও জানাইয়া দিব যে সন্নদ্ধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সম্মিলিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে আমাদের বিশেষ কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যজ্ঞদর্শন প্রসঙ্গে আমাদের মিত্রপক্ষীয় নরপতিগণ চতুরঙ্গসেনা সমন্বিত হইয়া আসিলেও শত্রুপক্ষের মনে কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইবে না, অথচ আমাদের মিত্রপক্ষীয় সমস্ত মহীপতিগণের সহিত আমরা ইন্দ্রপ্রস্থে মিলিত হইতে পারিব।

যদি বলা যায় যজ্ঞভূমিতে মিলিত হইলেই বা সে স্থলে যুদ্ধের অবকাশ হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় ভক্তিসম্পন্ন। যজ্ঞভূমিতে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রদর্শিত হইলে আমাদের শত্রুপক্ষীয় নৃপতিবর্গ কৃষ্ণের পূজাতে অসহিষ্ণু হইয়া তাহারাই প্রথমে কলহের সৃষ্টি করিবে। শত্রুপক্ষের মধ্যে যাহারা আত্মবিৎ তাহারা শত্রুপক্ষ দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেও তাহারা আমাদের পক্ষেই যোগ দিবে যেমন কাকপ্রতিপালিত কোকিল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কাকসঙ্ঘকে পরিত্যাগ করে। এইরূপে শত্রুপক্ষ ভেদিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণের দুর্ব্বার ক্রোধাগ্নিতে শলভের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মন্ত্রী উদ্ধবের নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য সম্মত হইয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ

প্রাচীন ভারতে আদর্শরাষ্ট্রের স্বরূপ যাহা মনে করা হইত তাহার একটি বিশেষ চিত্র ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।[2] ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে বিদ্যাপ্রার্থী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। কেকয়রাজ সমাগত ব্রাহ্মণগণের নিকটে নিজের নিষ্পাপতা প্রতিপাদনের জন্য স্বীয় রাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন। কেকয়রাজ বলিয়াছিলেন হে ব্রাহ্মণগণ! আমর রাষ্ট্রে কোনও চোর নাই এবং কোনও কদর্য্য নাই। ধনবান্ হইয়াও যে ব্যক্তি দান ও ভোগাদির জন্য অর্থব্যয় করে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ কৃপণ তাহাকেই কদর্য্য বলা হয়। যে অর্থের সঞ্চয়ই করে ব্যয় করে না তাদৃশ পুরুষকে নীতিশাস্ত্রে রাষ্ট্রকণ্টক বলা হইয়াছে। কেকয়রাজ বলিয়াছিলেন আমার রাষ্ট্রে কোনও কদর্য্যলোক বাস করে না। এইরূপ আমার রাজ্যে মদ্যপায়ী ব্যক্তি নাই আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক সকলেই আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক। আমার রাজ্যে মূর্খ নাই। এইরূপ আমার রাজ্যে পরস্ত্রীগামী স্বৈরচারী পুরুষ নাই। আমার রাজ্যে স্বৈরচারী পুরুষ নাই বলিয়া স্বৈরচারিণী স্ত্রীও সম্ভাবিত নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে কেকয়রাজের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে এই উপাখ্যানই মহাভাতের শান্তিপর্ব্বের ৭৭ অধ্যায়ে ভঙ্গ্যন্তরে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে—ন মে স্তেনো জনপদে এই যে শ্লোকটি বর্ণিত হইয়াছে এই শ্লোকটিই শান্তিপর্ব্বে ৭৭ অধ্যায়ে কেকয়রাজেরই উক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষৎ ও মহাভারতের এই উক্তি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের আদর্শরাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারে। মহাভারতের এই অধ্যায়ে কেকয়রাজ স্বীয় রাষ্ট্রের চতুর্ব্বর্ণ প্রজাগণের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। কেকয়রাজ বলিয়াছেন আমার রাজ্যে অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নাই, ব্রতাচরণসম্পন্ন নয় এরূপ ব্রাহ্মণ নাই। আমার রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণই সোমযাজী এবং সকলেই অহিতাগ্নি এবং বহুদক্ষিণাসম্পন্ন নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সকলেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল এবং যজন ও যাজন কর্ম্মনিষ্ঠ এবং দান ও প্রতিগ্রহের অনুষ্ঠাতা। সমস্ত ব্রাহ্মণগণই সত্যবাদী, মৃদুপ্রকৃতি এবং আশ্রিত ও পোষ্যবর্গের পরিপালক। আমার রাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়গণ অন্যের নিকট প্রার্থী নহেন, কিন্তু প্রার্থিগণের প্রার্থিত বস্তুর দাতা এবং সত্যনিষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অধ্যাপন করেন না। বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু যাজন করেন না। আমার রাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষক এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ।

আমার রাষ্ট্রের বৈশ্যগণ ছলরহিত হইয়া কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্যকর্ম্মে তৎপর, আলস্যহীন ও সত্যবাদী। ইহারা আশ্রিত পোষ্যবর্গের প্রতিপালক এবং সকলের প্রতি সৌহার্দ্যসম্পন্ন, দান্ত এবং শুচি। আমার রাষ্ট্রের শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপকারক নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ও অসূয়া বিবর্জ্জিত। আমিও নির্ধন অনাথ বৃদ্ধ দুর্ব্বল পীড়িত ও স্ত্রীগণের পোষণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি। এইরূপ পুরুষগণেরও আমি পোষণ করিয়া থাকি। আমার রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের যাহাদের যাহা কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম প্রভৃতি আছে আমি তাহার পরিপালন করিয়া থাকি। কিন্তু আমি তাহার উচ্ছেদ ঘটাই না। আমার রাষ্ট্রে যে সমস্ত তপস্বিগণ বাস করেন আমি তাহাদের সৎকারপূর্ব্বক পরিপালন করিয়া থাকি। আমি আমার আশ্রিত পোষ্যবর্গের মধ্যে আমার ভোগ্যবস্তু সমূহ সমানভাবে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকি। আমি কখনও পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইনা। আমার রাজ্যে ব্রহ্মচারী ভিন্ন

[2] ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৫।১১।৫

ভিক্ষুক নাই। অবেদজ্ঞ ব্যক্তি ঋত্বিক্ কর্ম্ম করেনা। বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে আমি অপমানিত করিনা। রাষ্ট্র যখন নিদ্রিত থাকে আমি তখনও জাগ্রত থাকি। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তপস্বী, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধীমান্ আমার পুরোহিতই আমার সমস্ত রাষ্ট্রের স্বামী।

আমি দান দ্বারা বিদ্যা সংগ্রহে উৎসুক থাকি। সত্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করি। শুশ্রূষাপূর্ব্বক গুরুর অনুগমন করি। আমার রাষ্ট্রে অকাল মৃত্যু নাই; এজন্য কোন বিধবা রমণী নাই। আমি যুদ্ধে কখনও ভীত নই। আমার শরীরের দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থানও শস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বিবর্জ্জিত নহে।

শান্তিপর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে—যে রাজার রাষ্ট্রে প্রজাসমূহ পিতৃগৃহে পুত্রের মত নির্ভয়ে বিচরণ করে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। যে রাজার রাজ্যে পৌরজানপদবর্গ, স্বীয় ধনরত্নাদির গোপনে অভিলাষী নয় সেই রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। সাধারণতঃ লোক দস্যু তস্করাদির ভয়ে স্বকীয় ধনরাশিকে গুপ্তভাবে রক্ষা করে। এইরূপ প্রতিবেশিগণের ও রাজার ভয়েও লোকে ধনের গোপন করিয়া থাকে। যে স্থানে এইরূপ ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই সে স্থানের অধিবাসিবৃন্দও ধনের গোপনে প্রয়াসী হয় না। যে রাজার পৌরজানপদবর্গ নয়বিৎ ও অপনয়বিৎ সেই রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। নয় ও অপনয় দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাষ্ট্রের কল্যাণ ও অকল্যাণ দণ্ডনীতির প্রতিপাদ্য। যে রাজা স্বরাষ্ট্রের প্রাজাবৃন্দকে রাষ্ট্রের কল্যাণে ও অকল্যাণে সুশিক্ষিত রাখেন; কিসে রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, কিসে রাষ্ট্রের অকল্যাণ হয় ইহা যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি লোকই জানে; রাজনীতি শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি যে রাষ্ট্রের প্রজাগণ সকলেই জানে, সেই রাষ্ট্রের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। রাজা রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাই এইরূপ রাখিবেন যাহাতে রাষ্ট্রীয় প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের কল্যাণ ও অকল্যাণে বুঝিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত থাকে।

যে রাজার রাষ্ট্রবাসি জনগণ সর্ব্বদা স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকে; অলস হইয়া অবস্থান করে না এবং রাজার বিরোধের জন্য দল গঠনের প্রয়াস করে না এবং হীন জুগুপ্সিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না তাহাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। রাজ্যবাসিজনগণ রাজকর্ত্তৃক যথাবিধি পরিপালিত হয় না বলিয়াই রাজবিরোধিসঙ্ঘ গঠনে ও হীন জুগুপ্সিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রজাপালনের সুব্যবস্থা থাকিলে রাষ্ট্রবাসিজনগণ কখনও রাজবিরোধিসঙ্ঘ গঠনে উদ্যুক্ত হইতে পারে না এবং হীন কর্ম্মে প্রবৃত্তও হইতে পারে না। যে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ রাজার অনুগত এবং রাজার আদেশের বিরোধ করে না, রাজার ইঙ্গিত অনুসারে নানাকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং যে রাজার রাজ্যবাসিজনগণ পরস্পর সঙ্ঘর্ষশীল নহে সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। যে রাজার রাজ্যবাসিজনগণ সকলেই দান অর্থাৎ বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণের জন্য অর্থব্যয়ে উৎসাহশীল; যে রাজ্যের রাজা জ্ঞানিজনের সৎকারে নিরত ও প্রজাহিতে উদ্যুক্ত এবং সজ্জনাচরিতপথের অনুগামী তাহাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

যে রাজা সজ্জনসংগ্রহে যত্নশীল এবং প্রজাগণের শৌর্য্য, কর্ম্মকুশলতা ও সত্যনিষ্ঠার বর্দ্ধনে যত্নশীল তাহাকে শ্রেষ্ঠ নরপতি বলা হয়। যে রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না, যে রাজ্যের প্রজাগণ যদৃচ্ছাক্রমে গৃহদ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রিত থাকে, যে রাজ্যের প্রজাগণ মানুষ উৎপাতে বা দৈব উৎপাতে উৎপীড়িত হয় না, যে রাজ্যে রমণীগণও সহায়ক পুরুষ সঙ্গে না লইয়াই সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। যে রাজ্যের প্রজাবৃন্দ পরস্পর হিংসা বিদ্বেষরত নহে এবং পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধি সম্পন্ন সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ট রাজা বলা হয়। যে রাজ্যের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণই মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অতি যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। যে গ্রামের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল হয় না অথচ গ্রামবাসিগণের সহায়তাতেই উক্ত তিন বর্ণের বালকগণ অন্নসংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে, রাজা সেই

গ্রামবাসিজনগণকে সাধারণভাবে দণ্ডিত করিবেন। "অব্রতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ। তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্‌রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ॥" অত্রিসংহিতা ২২ শ্লোক এবং পরাশর সংহিতা ৩|৪৬ শ্লোক।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রভৃতি লোকরক্ষক বার্ত্তাকর্ম্মসমূহ যে রাজ্যে সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। নরপতি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যে চৌরাদি দ্বারা প্রজাগণের অপহৃত ধনের প্রত্যাহরণ করিয়া প্রজাগণকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কোনওস্থলে তাহা সম্ভাবিত না হইলে রাজা রাজকোষ হইতে অপহৃত ধনের পরিমিত ধন অবশ্য প্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন। বিষ্ণু সং ৩|৪৬ ও শান্তিপর্ব্ব—৭৫ অধ্যায় ১০ শ্লোক। যে রাজ্যের অন্তর্গত গ্রামসমূহ সর্ব্বদা বহুশস্য সমন্বিত থাকে এবং গো মহিষাদি বহু পশু সমন্বিত থাকে; যে গ্রামের প্রজাসমূহ ধার্ম্মিক, যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দ সর্ব্বদা হৃষ্ট ও পরিপুষ্ট, উদ্বেগ বিবর্জ্জিত এবং পররাষ্ট্রের আক্রমণজনিত দুঃখের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মরক প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন দুঃখের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, এতাদৃশ গ্রামসমূহ সমন্বিত রাষ্ট্র, শ্রেষ্ঠরাষ্ট্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৪ অধ্যায়। যে রাষ্ট্রের দীন, অনাথ, বৃদ্ধ ও বিধবাগণ রাজার সহায়তায় সুখে জীবনযাপন করে সেই রাজা শ্রেষ্ঠ। যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবাসি শিল্পিগণ নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে নিষ্ণাত ও বহুকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে সেই রাষ্ট্রের রাজা শ্রেষ্ঠ।

যে রাষ্ট্রের কর্ষকগণ রাজ্যের মেরুদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয় এবং কর্ষকগণের অতিরিক্ত করপীড়া প্রভৃতি না থাকে এবং যে রাষ্ট্রে বণিক্‌গণ রাজশুল্কের অতিভারে উদ্বিগ্ন ও পীড়িত হয় না সেই রাজ্যের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

যে রাষ্ট্রের শূদ্রবর্ণ নানাবিধ কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কারক হইয়া থাকে সেই রাষ্ট্রের রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

রাষ্ট্রবাসিগণের পরস্পর সহায়তা

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রবাসিজনগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়া রাজার একটি প্রধানতম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মৌখিকভাবে পরস্পরের ঐক্য স্থাপনের আড়ম্বর করিয়া কার্য্যতঃ সহস্রভেদে জর্জ্জরিত করিবার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিতে নাই। রাষ্ট্রবাসি জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য বোধের জন্য কোনওরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমরা বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই না। বহুবিধ নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইলেও রাষ্ট্রবাসিজনগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহায়তার প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিবার মত কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস হয় নাই।

মনু সংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ২৭৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—যখন দুর্বৃত্ত দস্যুগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন, নরহত্যা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম দ্বারা গ্রমাদির উপঘাতে প্রবৃত্ত হয়, তকন তাহা দেখিয়াও যদি পার্শ্ববর্ত্তি জনগণ তাহার প্রতিরোধের জন্য মিলিত হইয়া দস্যুগণের প্রতিরোধে উদ্‌যুক্ত না হয় তবে সেই উপহত গ্রামাদির পার্শ্ববর্ত্তি জনসমূহকে রাজা রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। কোনও রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে সেই রাষ্ট্রে বাস করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা প্রত্যেক লোকের কর্ত্তব্য। এই যোগ্যতা যাহাদের নাই তাহাদের কোনও রাষ্ট্রে বাসেরও অধিকার নাই। এইরূপ গ্রামের বা দেশের কল্যাণার্থ স্নান, পান ও কৃষিকর্ম্মের সুব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত জলাধার রক্ষিত থাকে দুর্বৃত্তগণ যদি সেই জলাধার ধ্বংস করিতে উদ্যত হয় আর তাহর

প্রতিরোধের জন্য যদি সমীপবর্ত্তি জনগণ উদ্‌যুক্ত না হয়; এইরূপ সেতুভঙ্গদ্বারা জলপ্লাবনে শস্যাদির নাশ হইতেছে ইহা দেখিয়া বা শুনিয়া যাহারা তাহার প্রতিবিধানের জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, তবে তাহাদিগকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ পথিমধ্যে তস্করাদি যদি অপরের দ্রব্য অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দেখিয়াও যাহারা প্রতিরোধের জন্য শক্তি-অনুসারে ধাবিত না হয় তবে তাহাদিগকেও রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে।

এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যবহার প্রকরণের ২৩৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কোন স্থলে লোক বিপন্ন হইয়া যদি আর্ত্তনাদ করে এবং সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াও এবং সমর্থ হইয়াও যাহারা আর্ত্ত ব্যক্তির সহায়তার জন্য ধাবিত না হয়, তবে তাহাদিগকে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। বিষ্ণুস্মৃতির ৫ম অধ্যায়ের ৬৪ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, দস্যু-তস্কর প্রভৃতির উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া মানুষ আর্ত্তনাদ করিলে সেই আর্ত্তনাদকারীর সহচর বা সমীপবর্ত্তি জনগণ যদি তাহার সহায়তার জন্য ধাবিত না হয়, তবে তাহাদিগকে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।

এই সমস্ত কথাগুলির আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে জনপদবাসিগণের মধ্যে পরস্পরের সহায়তা বৃত্তির উদ্বোধ করিয়া জনপদ মধ্যে জনগণের নিরুদ্বেগে বাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা মনে করি এই সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া নিতান্তই গর্হিত কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্যে যাহা কর্ত্তব্য তাহা রাজাই করিবেন। আমরা ইহাতে উদ্‌যুক্ত হইয়া অকারণ ক্লেশ ভোগ করিব কেন? এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াও দেখিব না, শুনিয়াও শুনিব না। অন্ধ বা বধির হইয়া থাকাই আমরা সঙ্গত মনে করি। আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও তাহাতে আমাদের তাৎকালিক কোনও ব্যক্তিগত অনিষ্ট হইবে না আর ইহা আমরা বিদেশীয় শাসনে দীর্ঘকাল থাকিয়া বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। আজ যদি এই প্রদর্শিত নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত করিয়া জনগণকে পরস্পরের প্রতি সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং যাহারা সহায়তা প্রদানে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহাদের সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা যায়, তবে রাষ্ট্রবাসিজনগণের কিঞ্চিৎ কল্যাণ হইতে পারে। অন্য কল্যাণ না হইলেও অন্ততঃ সহায়তা প্রদানে যাহারা প্রবৃত্ত হইবে তাহাদের কথঞ্চিৎ মনুষ্যত্ব রক্ষিত হইবে। রাষ্ট্রবাসি জনগণ অমানুষ থাকুক্ ইহা যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে কখনও আকৃষ্ট হইবে না।

দুর্ব্বলরক্ষা

শান্তিপর্ব্বের ৯১ অধ্যায়ে ভগবান্ উতথ্য রাজর্ষি মান্ধাতাকে যে দণ্ডনীতির উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে—রাজা দুর্নীতি পরায়ণ হইলে হস্তী অশ্ব গো মহিষাদি সমস্ত প্রাণিপুঞ্জই অবসাদ গ্রস্ত হইয়া থাকে, এমন কি বৃক্ষ গুল্ম তৃণাদিও উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। দুর্নীতি পরায়ণ রাজার রাজ্যে প্রজাপুঞ্জ যে বিপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। হে মান্ধাতঃ! দুর্ব্বলের রক্ষার জন্যই বলের সৃষ্টি হইয়াছে, দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করিবার জন্য বলের সৃষ্টি হয় নাই। দুর্ব্বলের রক্ষণে রক্ষকই মহাবলশালী হইয়া থাকে। দুর্ব্বলের রক্ষণের মত বলবর্দ্ধক কর্ম্ম আর কিছুই নাই। এজন্য দুর্ব্বলকে মহদ্‌ভূত বলা হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মকেই মহদ্‌ভূত বলা হইয়া থাকে। ভগবান্ উতথ্য দুর্ব্বলকেও মহদ্‌ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উতথ্য বলিয়াছেন—সমস্ত বিশ্ব দুর্ব্বলেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ব্রহ্মের মত দুর্ব্বলও বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। কত দূরপ্রসারি দৃষ্টি থাকিলে এই কথা বলা যায়—তাহা চিন্তা করিলেও চিত্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়।

যাঁহারাও দুর্ব্বলের প্রতিপালক, স্বভাবতঃ যাঁহারা দুর্ব্বলের রক্ষায় উদ্‌যুক্ত, তাঁহারাও দুর্নীতিপরায়ণ রাজার রাজ্যে বাস করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার অনুগামিবর্গের সহিত অবসাদগ্রস্ত—শোকগ্রস্ত হইয়া থাকেন। হে মান্ধাতঃ! দুর্ব্বলের চক্ষুঃ তপস্বিজনের চক্ষুঃ ও তীব্র বিষধর সর্পের চক্ষুঃ এই ত্রিবিধ চক্ষুই অতি দুর্ব্বিষহ। দুর্ব্বলকে পীড়িত করিবার জন্য যে প্রবৃত্ত হইবে সে দুর্ব্বলের চক্ষু দ্বারাই দগ্ধ হইয়া যাইবে। তুমি দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করিতে কখনও প্রবৃত্ত হইবে না। হে মান্ধাতঃ! দুর্ব্বল বহুবিধ—কেহ ধন দুর্ব্বল, কেহ জ্ঞান দুর্ব্বল, কেহবা শক্তি দুর্ব্বল, কেহবা মান দুর্ব্বল। সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলদিগকে তুমি বিশেষভাবে অবগত হইবে। সমস্ত দুর্ব্বলগণই যেন তোমার নিকটে বিমানিত না হয়। দুর্ব্বল বলিয়া কাহাকেও বিমানিত করিও না। তুমি বলবান্—বলবান্ বলিয়াই দুর্ব্বল রক্ষা তোমার কর্ত্তব্য, কিন্তু দুর্ব্বলকে অবমানিত করা তোমার কার্য্য হইতে পারে না। তুমি দুর্ব্বলের মানবর্দ্ধক হইবে। দুর্ব্বলের পীড়নে প্রবৃত্ত হইলে দুর্ব্বলের চক্ষুই তোমাকে সবান্ধবে দগ্ধ করিবে। দুর্ব্বলের চক্ষুতে প্রলয়ের অগ্নি বাস করে, দুর্ব্বলের উৎপীড়নে এই প্রলয়াগ্নি প্রজ্জলিত হইলে রাষ্ট্রের সহিত তোমাকে ভস্মীভূত করিবে। যে রাজা দুর্ব্বলদ্বারা দগ্ধ হয় তাহার বংশেরও পুনরুত্থান হয় না। দুর্ব্বলের চক্ষুতে যে ঘোর অগ্নি বাস করে এই অগ্নি দুর্ব্বলপীড়কের মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে। হে মান্ধাতঃ! তুমি কখনও দুর্ব্বলের পীড়নে প্রবৃত্ত হইও না। যে দুর্ব্বলের উৎপীড়ন করে, অমানুষ দণ্ড তাহার প্রতি নিপতিত হইয়া সমূলে তাহার সংহার করে।

করগ্রহণ রীতি

রাজা রাষ্ট্রবাসি জনগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। রাজা এমনভাবে কর গ্রহণ করিবেন যাহাতে রাষ্ট্রের কর্ষক, বণিক্ প্রভৃতি স্বীয় কর্ম্মদ্বারা লাভবান্ হইতে পারে। কর গ্রহণের রীতি—কোন্ দ্রব্যে কিরূপ কর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে ইহার বিস্তৃত আলোচনা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, মহাভারত, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। কর নির্দ্ধারণের মূল নীতি এই যে—যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তাচ কর্ম্মণাম্। তথাপেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ মনু—৭|১২৮ শ্লোক। কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি কর্ম্মের কর্ত্তা ও রাষ্ট্রের রক্ষক নরপতি যাহাতে উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের কর্ত্তা কর্ষক প্রভৃতি ও কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের পরিপালক নরপতি, কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের ফলভোগী। সুতরাং কর্ম্মের কর্ত্তা ও কর্ম্মের পরিপালক উভয়েই যাহাতে লাভবান্ হইতে পারে তদনুসারে করের নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

করনির্দ্ধারণের নীতি সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে—যে প্রকারে জলৌকা রুধির পান করে, বৎস দুগ্ধ পান করে ও ভ্রমর মধু পান করে, সেই প্রকারে রাজা অল্প অল্প করিয়া বার্ষিকাদি কর গ্রহণ করিবেন। মনু ৭|১২৯ শ্লোক।

শান্তি পর্ব্বের ৮৮ অধ্যায় ৪—৭ শ্লোকে, উদ্ধৃত মনু শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে—ভ্রমরসমূহ পুষ্প হইতে যেরূপে মধু দোহন করিয়া থাকে, ভ্রমর পুষ্প হইতে মধু দোহন করে, তাহাতে পুষ্পগুলি বিনষ্ট বা ছিন্ন হয় না, পুষ্পের ফলপ্রসব সামর্থ্যও বিনষ্ট হয় না। ভ্রমরও মধু দোহনে তৃপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ রাজাও করপ্রদ পুরুষের পীড়া উৎপাদন না করিয়া কর গ্রহণ করিবেন। গোপ যেমন ধেনুর দোহন করে যাহাতে বৎসও পরিপুষ্ট থাকে, ধেনুর স্তনেও কোন পীড়া হয় না, গোপ ও ধেনুর পালনপোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকে। বৎসের বিনাশ ও ধেনুর স্তনের পীড়া উৎপাদন করিয়া গোপ যদি ধেনুর দোহন করে তবে গোবংশের বিনাশ ও গোপের জীবিকার উচ্ছেদ ঘটিবে। জলৌকা যেমন মৃদু

উপায়ে রক্তপান করে, রাজাও সেইরূপ মৃদু উপায়ে রাষ্ট্র হইতে কর গ্রহণ করিবেন। ব্যাঘ্রী যেমন তাহার শিশুসন্তানগুলিকে মুখে করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায় শিশুসন্তানগুলিকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময় ব্যাঘ্রী সন্তানগুলিকে দন্তাদিদ্বারাই গ্রহণ করে, কিন্তু পীড়িত করে না। ব্যাঘ্রী অন্য প্রাণীকে যখন দন্তাদিদ্বারা গ্রহণ করে তকন ব্যাঘ্রীর কবলে পতিত হইয়া অন্য প্রাণীর মৃত্যুই ঘটে, কিন্তু ব্যাঘ্রীর শিশুসন্তানগুলি নিদ্রিত অবস্থাতেই থাকে অথচ ব্যাঘ্রী মুখে করিয়া সন্তানগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া থাকে।

রাজাও এইরূপ ব্যাঘ্রীর সন্তান হরণের মত রাষ্ট্রের প্রজাগণকে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু কখনও পীড়ন করিবেন না। তীক্ষ্নদন্ত মূষিকবিশেষ নিদ্রিত মনুষ্যের পাদতলস্থ চর্ম্ম অতীক্ষ্ণ উপায়ে কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করে; নিদ্রিত পুরুষ ঈষৎ বেদনা প্রযুক্ত পদ কিঞ্চিৎ কম্পিত করিতে থাকে, কিন্তু তীব্র বেদনা প্রযুক্ত জাগ্রত হইয়া মুষিককে নিবারণ করে না, এইরূপ রাজাও অতীক্ষ্ণ উপায় দ্বারা রাষ্ট্র হইতে কর সংগ্রহ করিবেন।

পণ্য দ্রব্যাদির জন্য বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন। এই পণ্যদ্রব্যের কর নির্দ্ধারণে ইহাই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পণ্যদ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, পণ্যদ্রব্য কতদূর হইতে আনীত, আনয়ন সময়ে পণ্যদ্রব্যের পাথেয় ব্যয় এবং পণ্যদ্রব্যাদি চোর তস্করাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় এই সকল অনুসন্ধান করিয়া বণিকের ব্যয় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ব্যয়ের অতিরিক্ত যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্ধ ধনের অনুসারে পণ্য দ্রব্যাদির উপর রাজা কর গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ের আলোচনা মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকে ও মহাভারতের রাজধর্ম্মের ২৭ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে করা হইয়াছে।

শস্ত্রগ্রহণ

রাষ্ট্রবাসিজনগণের শস্ত্র গ্রহণনীতি—প্রাচীন ভারতের অধিবাসিবৃন্দ সাধারণভাবে সমস্ত সময় সশস্ত্র থাকিতেন কি নিরস্ত্র থাকিতেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আপৎকালে শস্ত্রগ্রহণ সর্ব্ববর্ণেরই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। বিষ্ণু ৩|২৯। কিন্তু স্বস্থ অবস্থাতেও আর্য্যগণ সশস্ত্র কি নিরস্ত্র থাকিতেন ইহার আলোচনা মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। "শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং" এই কথা মনু বলিয়াছেন। ইহার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন যে যাঁহারা শাস্ত্রগ্রহণে সমর্থ তাঁহারা সাধারণভাবে সর্ব্বদা শস্ত্রগ্রহণ করিবেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে স্বস্থ অবস্থাতেও যদি পুরুষ নিরস্ত্র থাকে ও অকস্মাৎ আততায়ীর হস্তে পতিত হয়, তবে সশস্ত্র পুরুষ নিস্তার পাইলেও নিরস্ত্র পুরুষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্ররক্ষণে রাজা উদ্‌যুক্ত থাকিলেও কোনও রাজার পক্ষেই ইহা সম্ভাবিত নহে যে—প্রত্যেকটি প্রজার রক্ষণের জন্য রাজা সুব্যবস্থা করিতে পারেন। দুরাত্মা আততায়িগণ রাজপুরুষগণকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু সশস্ত্র পুরুষ দর্শন করিলে ভীত হয়। এজন্য সর্ব্বকালেই শস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য। সর্ব্ব অবস্থায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেও সেই শস্ত্র কোষে আবৃত রাখিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ভয়কাল উপস্থিত হইলে সেই শস্ত্রকে কোষ হইতে উন্মুক্ত করিবে এবং শত্রু আক্রমণ করিলে সেই শস্ত্রদ্বারা তাহার বধও করিবে। ইহাতে কোনও অপরাধ হইবে না। এইরূপে মেধাতিথি স্বস্থকালে শস্ত্রধারণ ও বিপৎকালে সেই শস্ত্রের উপযোগ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী টীকাকারগণ ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই।

যাহা হউক ভাষ্যকার মেধাতিথি আরও বলিয়াছেন—আত্ম পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যেমন শস্ত্রের উপযোগ আছে, এইরূপ দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলজনতার ভয় উৎপন্ন হইলে যিনি শস্ত্রগ্রহণে সমর্থ এবং দুর্ব্বলের রক্ষণে উৎসাহযুক্ত, তিনি শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত আততায়িগণের প্রতিরোধ করিবেন। গৌতম ধর্ম্মশাস্ত্র

হইতে একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার মেধাতিথি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। "দুর্ব্বল হিংসায়াঞ্চ বিমোচনে শক্তশ্চেৎ।" গৌ. সূ.।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৭৮ অধ্যায়ে ধর্ম্মরক্ষণের জন্য সর্ব্ববর্ণের শস্ত্রগ্রহণের কথা বলিয়াছেন এবং ধর্ম্মরক্ষণের জন্য শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন ইহাও বলিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে—"তেভ্যো নমশ্চ ভদ্রঞ্চ যে শরীরাণি জুহ্বতে। ব্রহ্মদ্বিষো নিষচ্ছন্ত স্তেষাং নোঽস্তু সলোকতা।" শা. প. ৭৮,৩০—ইহার অর্থ—যাঁহারা ধর্ম্মদ্রোহিগণকে বিনাশ করিতে যাইয়া নিজের শরীরকে আহুতি প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার; তাঁহাদিগের কল্যাণ হউক। এতাদৃশ পুরুষগণ যে লোকে গমন করিয়াছেন আমাদেরও যেন সেই লোক লাভ হয়। ভগবান্ মনু এই সমস্ত বীরপুরুষগণকে স্বর্গগামী ও ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোনও স্থলে ধর্ম্মই অধর্ম্ম কোনওস্থলে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া থাকে। দেশ ও কালের বৈচিত্র্য প্রযুক্তই এইরূপ হইয়া থাকে।

ধনিক-নির্ধন সমস্যা

বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিব্যবস্থা বিদেশীগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলেও ধনী ও নির্ধন এই দ্বিবিধ জাতি বা বর্ণ, সকলেই নির্ব্বিচার বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া থাকেন। ধনীরা প্রভুজাতি নির্ধনেরা দাসজাতি। ধনীরা শোষক জাতি নির্ধনেরা শোষণীয় জাতি। ধনীরা ভক্ষক জাতি নির্ধনেরা ভক্ষ্য জাতি। ধনীরা মানী জাতি নির্ধনেরা হতমান জাতি ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু ভাষার কঠোরতা পরিহারের জন্য কোমল শব্দ দ্বারা ইহার নির্দ্দেশ করেন। ফলকথা ধনী জাতি ও নির্ধন জাতি বর্ত্তমান সময়ে ভক্ষক ও ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। ভক্ষক ও ভক্ষ্য একত্র বাস করিলে যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয় তাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়াছে। নির্ধন জাতি ধনবানের অন্ন। ধনবান্ জাতি মনে করেন আমরা সকলেই ভোক্তা। আমরা কাহারও ভোগ্য নহি। নির্ধন জাতিরা স্বেচ্ছায় ধনবানের ভোগ্য হইতে না চাহিলেও কার্য্যতঃ নির্ধনজাতি ধনবানের অন্নই বটে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বহুবিধ দুর্ব্বলের উল্লেখ করিয়াছি। ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রে নির্ধন ভক্ষ্য ও ধনবান্ ভক্ষক ইহা সম্ভাবিত হইত না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধনের উপযোগের জন্য ধার্ম্মিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাগরূক ছিল। সংবিভাগ না করিয়া কেহই ধন সঞ্চয়ের অধিকারী হইত না। সংবিভাগ না করিয়া যে ধন সঞ্চয় করে তাহাকে কদর্য্য বলে। এই কদর্য্য রাষ্ট্রের কণ্টক বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি কেহ স্বেচ্ছায় ধনের সংবিভাগে অসম্মত হয় তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে ধনিকের ধনের সংবিভাগ করান হইত অথবা সৎকার্য্যের জন্য রাজশাসনানুসারে নরপতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইত।

মহাভারতের আপদ্ধর্ম্মের ১৬৫ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—"অদাতৃভ্যো হরেদ্ বিত্তং বিখ্যাপ্য নৃপতিঃ সদা। তথৈবাচরতো ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্যাদ্ যথাখিলঃ॥" যে ধনবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ধনের সংবিভাগ না করিয়া ধনসঞ্চয়ে উদ্‌যুক্ত থাকে এইরূপ অদাতৃ ধনিকগণের নিকট হইতে নরপতি সৎকর্ম্মের জন্য ধন গ্রহণ করিবেন। অদাতৃগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া নরপতি সেই ধন প্রজার কল্যাণের জন্য ব্যয় করিলে সেই নরপতি ধার্ম্মিক বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন।

যে ব্যক্তি অনশনক্লিষ্ট তাহার কোনও স্থান হইতে অন্নগ্রহণে কোনও অপরাধ হইবে না, অধর্ম্মও হইবে না, রাজদণ্ডও হইবে না। মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অবশ্যপোষ্যবর্গের প্রতিপালনের উপযোগী অন্নের অভাব ঘটিলে অথবা অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্মকার্য্যের জন্য, দানাদি ধর্ম্মবিহীন ধনবান্

কৃপণব্যক্তির গৃহ হইতে, তাহার ক্ষেত্র হইতে, অথবা তাহার খল হইতে, অথবা যে কোনও স্থান হইতে ধান্যাদি গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষেত্রস্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে তুমি কি নিমিত্ত অপহরণ করিতেছ তবে তাহাকে নিমিত্ত বলিবে। জিজ্ঞাসা না করিলে নিমিত্তও বলিবে না। এই কথা মহাভারতেরও শান্তিপর্ব্বের ১৬৫ অধ্যায়ে ১২ ও ১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু নির্ধন বা দাতার নিকট হইতে এরূপে গ্রহণ করিবে না।

মনুসংহিতার এই স্থানে আবার বলা হইয়াছে—অসদুপায়ে ধনার্জ্জনকারী অথচ কৃপণ অসাধু ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সাধুজনকে ঐ অর্থ প্রদান করে, সে—ঐ অসাধুব্যক্তি ও সাধু ব্যক্তি উভয়েরই রক্ষক। যেমন তড়াগাদি হইতে কুল্যাদি দ্বারা জল নিঃসারিত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়, এইরূপ অসাধু ধনীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুজনকে প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে ধনের প্রদান করেন তিনি নিজের ধন প্রদান না করিলেও একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধনের গমনে সেতুরূপ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এইরূপে সেতুস্থানাপন্ন হন তাঁহাকে পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ বলা হয়। এই কথা শান্তিপর্ব্বের ১৩৬ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকেও বলা হইয়াছে। মানুষের অবশ্য অপেক্ষিত প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্যই অন্নাদি বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার যে বস্তুতে প্রয়োজন নাই তাহার তাহাতে অধিকারও নাই।

ভাগবতের ৭|১৪|৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌। অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ যে পরিমাণ অন্নের দ্বারা জঠরের পূর্ত্তি হয়, সেই পরিমাণ অন্নেই মনুষ্যের স্বত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। জঠরপূর্ত্তিতে অনপেক্ষিত অধিক অন্ন যে নিজের বলিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে সে ব্যক্তি চোর। চোরের মত তাহারও দণ্ড হইবে।

নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—যিনি শতধেনুরও অধিপতি তিনিও একটি ধেনুর দুগ্ধই পান করিতে সমর্থ। বহুধেনু আছে বলিয়াই তিনি প্রতিদিন ২|৪ মণ দুগ্ধ পান করিতে পারেন না—পান করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। ধান্যাদি অন্ন যাঁহার প্রচুর আছে—যিনি প্রতিবর্ষে ২|৪ সহস্র মণ ধান্যাদি অন্নের অধিপতি হইয়া থাকেন তিনিও প্রতিদিন প্রস্থ পরিমিত অন্নই ভোজন করিতে সমর্থ। বহু অন্ন আছে বলিয়াই তিনি প্রতিদিন ২|৪ মণ অন্ন ভোজন করিতে পারেন না—ভোজন করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। যে ধনবানের বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিশাল প্রাসাদ রহিয়াছে—যিনি সুবৃহৎ প্রাসাদের অধিকারী তিনিও সমস্ত প্রাসাদ ব্যাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারেন না। সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে বলিয়াই তিনি সমস্ত প্রাসাদে শরীর ছড়াইয়া শয়ন করিতে পারেন না। কিন্তু সেই প্রাসাদের অন্তর্গত যে কোনও একটি প্রকোষ্ঠের একদেশে অবস্থিত খট্টার অর্দ্ধাংশেই শয়ন করেন। অপর অর্দ্ধাংশে তাঁহার পত্নী শয়ন করেন সুতরাং দেখা যাইতেছে বহুধেনুর অধিপতি, বহু অন্নের অধিপতি, বৃহৎ প্রাসাদের অধিপতি যে বিভূতিকে নিজের বলিয়া মনে করেন কার্য্যতঃ তিনি সেই বিভূতির অতি সামান্য অংশের ভোক্তা। যে বিভূতির যিনি ভোক্তা নহেন বস্তুতঃ সেই বিভূতির তিনি অধিপতিও নহেন। তাঁহার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি অন্যের বিভূতিকে—অন্যের ঐশ্বর্য্যকেই নিজের বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ভোগযোগ্য ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক ঐশ্বর্য্য যে অন্যের ভোগ্য—অন্যেই তাহা ভোগ করিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুত স্বভাব বশতঃই যাহা ব্যবস্থিত রহিয়াছে—নীতিশাস্ত্রকারগণও স্পষ্টভাবে তাহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা একজনের ভোগযোগ্য নহে তাহা অন্যকেও ভোগ করিতে দিব না, ইহা কেবল দুরাগ্রহ মাত্র। "দানভোগফলং ধনম্‌" দানে ও ভোগে ধনের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। দান ও ভোগ বর্জ্জিত ধনে কাহারও অধিকার হইতে পারে না। দান ও ভোগ বর্জ্জিত ধনের অধিকারীকে নীতিশাস্ত্রকারগণ এইজন্যই রাষ্ট্রকণ্টক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ" ঋক্‌সং ৮|৬|২৩ এই ঋক্‌মন্ত্রেও একই কথাই বলা হইয়াছে। "অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ" বৃহদারণ্যক ১|৪|১৬ এই শ্রুতি ভারতীয় হিন্দুগৃহস্থ মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—

দেহাভিমানী গৃহস্থ মাত্রই যেন সুদৃঢ় নিশ্চয় রাখেন যে তিনি সমস্ত জীবেরই—দেবতা হইতে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্তের ভোগ্য হইয়া ভারত ভূমিতে আগমন করিয়াছেন, সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের মধ্যে নিজেকে আহুতি প্রদানের জন্য, সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের মধ্যে নিজেকে বিসর্জ্জন করিয়া সমস্ত অভিমান উচ্ছিন্ন ও বিলীন করিয়া সুনির্ম্মল হইবার জন্য ভারতের গৃহস্থ হইয়াছেন। গৃহস্থের এই ত্যাগব্রত সন্ন্যাসে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে নিজের যাহা কিছু সমস্তই প্রাণিপুঞ্জের মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া জীব শিবত্ব—ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে।

সমাপ্ত

এই প্রবন্ধের আধারভূত-গ্রন্থসমূহের সূচী

বেদ—ঋক্‌সংহিতা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

রামায়ণ

মহাভারত

ভাগবত

স্মৃতি—

মনুসংহিতা

মেধাতিথিভাষ্য

কুল্লূককৃত টীকা

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

বালক্রীড়া

মিতাক্ষরা

অত্রিস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি

গৌতমধর্ম্মসূত্র, পরাশর স্মৃতি—

শুক্রনীতিসার

কামন্দকীয় নীতিসার

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র

কাব্য—

দশকুমারচরিত

কাদম্বরী

ভাট্ট

কিরাতার্জ্জুনীয়

শিশুপালবধ

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতিস্থ

মাতৃকাবর্ণানুক্রমে সাধারণ সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

অত্রিসংহিতা
অরিষড়্‌বর্গ
অর্থশাস্ত্রের অনাদরের কারণ
উদ্ধবের উক্তি
উপজাপ
উপপ্লব্য নগরী
উশনা
ঔশনস তন্ত্র
কণিকনীতি
করগ্রহণ
কশ্যপ
কাত্যায়ন
কামজব্যসন
কামন্দক নীতিসার
কালকবৃক্ষীয় নীতি
কিমদ্যক
কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে দণ্ডনীতি
কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র
কৌণপ দন্ত
ক্রোধজব্যসন
গান্ধারীর অনুশাসন
গিরি দুর্গ
গৌতম
চর
চতুর্ব্বর্গ
চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি
চতুর্ব্বিধ উপধা
চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মূল
চতুর্ব্বিধ শত্রু
চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ
চন্দ্রগুপ্ত

চারিটি মহাদোষ
চৌদ্দটি রাজদোষ
ছয়প্রকার রাজগুণ
ছান্দোগ্য উপনিষৎ
জয়ন্তভট্ট
জাবালি
দক্ষস্মৃতি
দণ্ডী
দুর্ব্বল রক্ষা
দ্রোণ পর্ব্ব
দ্বাদশ রাজমণ্ডল
দ্বিবিধ নীতি
দ্বৈতসত্যত্ববাদী
ধনিক নির্ধন সমস্যা
ধর্ম্মশাস্ত্র
ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসন
নারদস্মৃতি
পঞ্চম বেদ
পঞ্চবর্গ পরিজ্ঞান
পঞ্চবিধ চারবর্গ
পঞ্চবিধ দুর্গ
পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রণা
পঞ্চোপধাতীত মন্ত্রী
পরাশর সংহিতা
পাঁচপ্রকার বল
পিশুন
পূর্ব্ব মীমাংসা
পৈতামহতন্ত্র
প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাষ্ট্রের স্বরূপ
প্রাচেতস মনু
প্রাচেতস মনুর নীতি
ভট্টিকাব্যের দণ্ডনীতি
ভরদ্বাজ
ভরদ্বাজনীতি
মনু
মনুসংহিতা
মন্ত্রগুপ্তি
মহাভারতে দণ্ডনীতি

মাতঙ্গ নীতি
মানব ধর্ম্মশাস্ত্র
মান্ধাতা
মার্কণ্ডেয়
মিতাক্ষরা
মিত্র চার প্রকার
মিত্র দুই প্রকার
মৃদুতা অনর্থের মূল
মেধাতিথি
মৌদ্‌গল্য
যন্ত্র ব্যবহার
যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি
রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব
রাজধর্ম্ম পর্ব্ব
রাজার অষ্টবিধ কর্ম্ম
রামগীতা
রামায়ণে দণ্ডনীতি
রামায়ণে রাজনীতি
রাষ্ট্রবাসিগণের পরস্পর সহায়তা
রাষ্ট্রের ১৮টি তীর্থ
বসুমনা
বসুরক্ষিত
বসুহোম
বাতব্যাধি
বাৎস্যায়ন
বামদেব
বার্হস্পত্য
বিংশতিবর্গ
বিদুলানুশাসন
বিশ্বরূপাচার্য্য
বিষ্ণুগুপ্ত
বিষ্ণুস্মৃতি
বিশালাক্ষ
বিহার ভদ্র
বৈশালাক্ষ তন্ত্র
শত্রু ও মিত্র ত্রিবিধ
শত্রুঞ্জয়
শম্বর নীতি

শস্ত্রগ্রহণ
শাম্বর সিদ্ধান্ত
শিশুপাল বধকাব্যে দণ্ডনীতি
শুকনাশ
শুক্র নীতিসার
শুক্রাচার্য্য
শ্রুতশ্রবা
শ্বেতকাকীয় বৃত্তি
ষাড়্গুণ্য
সদ্যঃ শৌচ
সপ্তাঙ্গ রাজ্য
সহজ শত্রু
সাতটি রাজ্য প্রকৃতি
সুধ্বন্বা
সূত্রাধ্যায়
স্পর্শ দোষ
স্বায়ম্ভুব মনু
হর্ষবর্দ্ধন